আজাদ হিন্দ সরকার

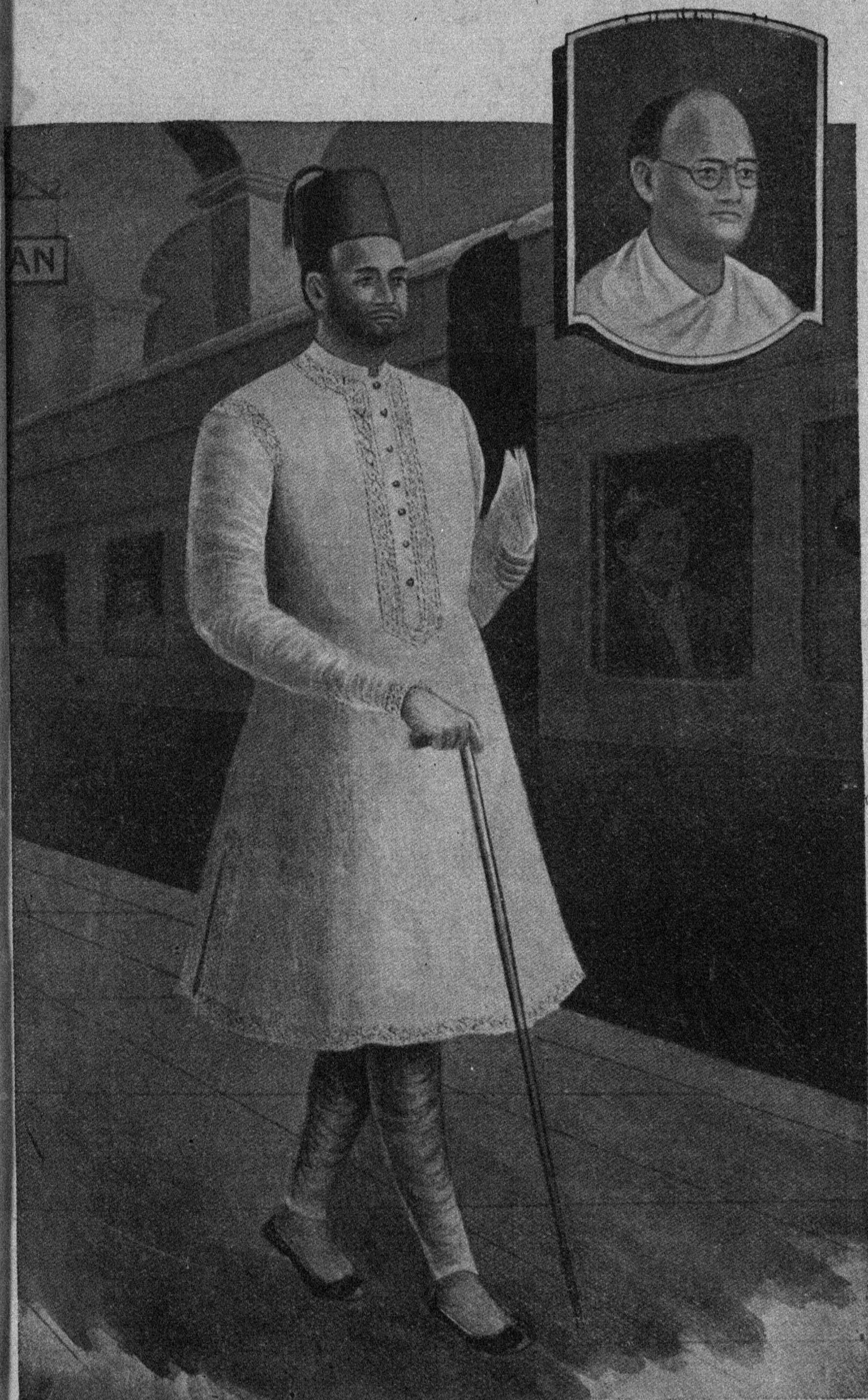
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কমলা বুক ডিপো
কলিকাতা

ঐ সমুদ্রের ওপারে, ঐ পর্ব্বতমালার পরপারে, ঐ ঘন বনানীর অপর পারে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র রচনা করিয়াছিলেন। ভারতের ভাগ্যদোষে সে প্রাসাদ আকাশে বিলীন হইয়াছে। বিশ্বসৃষ্টির নিয়মই এই। কিন্তু বালককাল হইতে যে প্রতিভা, আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেতন ছিল, তাহা অবিনাশী। কাহিনী মধ্যে তাহাই চিত্রিত করিয়াছি।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতার স্বর্ণদ্বার উন্মোচনে নেতাজীর রাষ্ট্র কতখানি সহায়তা করিয়াছিল. অনন্তকালের ইতিহাসে তাহা সুলিখিত রহিয়াছে।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার



নিরুদ্দেশ যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব্বারম্ভে

আজাদ হিন্দ সরকার

প্রথম অঙ্ক

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে সুভাষচন্দ্রের উদয় ধূমকেতুর উদয়ের সহিত তুলিত করিতে ইচ্ছা হয়। ধূমকেতু শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি:

"আকাশমণ্ডলে কখনও কখনও যে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সুবৃহৎ লাঙ্গুলের ন্যায় অংশ বিস্তার পূর্ব্বক উদিত হয়, লোকসমাজে তাহাই ধূমকেতু বলিয়া পরিচিত।

আবার—

"সৌরজগতের অন্তবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বিশেষ।"

আরও এক অর্থ—

"অগ্নি।"

আবার ইহাও কথিত আছে যে,

"ধূমকেতু স্থায়ী হয় না। আকাশমণ্ডলে জ্যোতির্ম্ময় রূপ ও আলোক বিস্তার করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।"

উল্লিখিত অর্থগুলির যেটিই গ্রহণ করা যাক্ না কেন, সুভাষচন্দ্রের আকৃতি, গতি ও প্রকৃতির সহিত অপরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তবে ধূমকেতু শব্দটির সহিত আমাদের সংস্কারগত বিদ্বেষও অনস্বীকার্য্য।

অভিধানেও আছে,

"শাস্ত্রে ধূমকেতুর উদয় অনিষ্টজনক বলিয়া লিখিত হইয়াছে।"

ইহা ভয়ের কথা বটে। সুভাষ উদয়ে দেশের অনিষ্ট হইয়াছে, একথা কেহই বলিবে না। দুর্ম্মুখ, দুঃসাহসী ভারতীয়-কমিউনিষ্টরাও ততখানি দুঃসাহস পোষণ করে মনে হয় না। অনিষ্ট হয় নাই, অপিচ ইষ্ট হইয়াছে ইহাই যদি জনমত হয়, তবে ধূমকেতুর সহিত তুলনা দোষাবহ হইয়া পড়ে না কি? কিন্তু মা ভৈঃ! শাস্ত্রে কাটান্ও স্পষ্ট।

"যে ধূমকেতুর দেহ হ্রস্ব ও প্রসন্ন এবং জ্যোতির্ম্ময়, তাহা অনিষ্টকর নহে।"

সুতরাং লেখক দায়দোষমুক্ত। ধূমকেতুর সহিত সুভাষকে তুলিত করায় রুষ্ট বা ক্ষুণ্ন হইবার কোন কারণ কাহারও আর রহিল না। সুভাষের দেহ যে হ্রস্ব, অতীব প্রসন্ন এবং সুবিমল জ্যোতির্ম্ময়, বাঙ্গলাদেশের লোক কি কোনও দিন তাহা ভুলিতে পারিবে? ভারতবর্ষও কি এমন 'ভূলো'?

কিন্তু কেন এই উপমা আর উপমার জন্য কেনই বা এই দীর্ঘ 'মল্লিনাথকৃত' টীকা, সে কৈফিয়ৎ আমি দিব না। উল্লিখিত কাহিনী পাঠ করিয়া যদি কেহ উপমাটি অসঙ্গত বিবেচনা করেন এবং অস্বীকার করেন তাহাতেও আমার দুঃখিত হইবার কারণ নাই। সেই সুবিখ্যাত হাতীর গল্পটী কি আপনাদের মনে নাই? করিশুণ্ডে হাত বুলাইতে বুলাইতে কেহ কহিল, এটা অমুক; কেহ বা হাতীর গোদা পায়ের মাপ লইয়া, বলিল উঁহু, এটা তুষুক! আমি বলিব, তথাস্তু।

আমাদেরও তখন পঠদ্দশা। প্রেসিডেন্সী কলেজের আকাশে অকস্মাৎ এক ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে সংবাদ পাওয়া গেল। প্রেসিডেন্সী কলেজ খাস গভর্ণমেণ্টের কলেজ, লালদীঘির রাইটার্স বিল্ডিঙের মত মাননীয় প্রতিষ্ঠান, অধিকন্তু, অবিসম্বাদিতরূপে প্রথম শ্রেণীর কলেজ, কিন্তু ধূমকেতুর আবির্ভাবে তাহাও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। এই কলেজের পৃষ্ঠদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ গভর্ণ-মেণ্টের অমিত তেজ, দুর্জ্জয় দম্ভ ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, সদা সতর্ক প্রহরীসম দণ্ডায়মান, তবু বিপর্য্যয় রোধ হইল না। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদ সুরক্ষিত এই দুর্গাভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ওটেন সাহেব ধূমকেতুর পুচ্ছাঘাতে, পপাত ধরণীতলে। চিরাচরিত নিয়মে ধূমকেতু তাহার জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছসমেত অদৃশ্য হইয়া গেল। কিছুকাল পর্য্যন্ত আর দর্শন নাই। হ্যালির ধূমকেতু, পৃথিবীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল, শুনিয়াছি; সুভাষ ধূমকেতু ছাত্রসমাজে কি যে বিপ্লব ঘটাইল, তাহার তুলনা নাই।

হ্যালিও অদৃশ্য হইয়াছিল: এই ধূমকেতুটিও অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ত নহেই, বঙ্গ দেশের কোনও কলেজেই আর তাহাকে দেখা গেল না। মহামহিমমহিমার্ণব বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষিত প্রেসিডেন্সী কলেজের মহামান্য অধ্যাপক ওটেন সাহেবের লাঞ্ছনা করিয়া যে লোক ত্রিভুবনেশ্বর বৃটিশের অপমান করিয়াছে, বৃটিশ সাম্রাজ্য অভ্যন্তরে তাহার দেখা না পাইবারই কথা। হইলও তাহাই। বঙ্গ দেশের কোনও বিদ্যালয়ে তাহাকে ত দেখা গেলই না, উড়িষ্যার কটকে—যে স্থান হইতে সে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, যে স্থানে তাহাদের বসবাস, যেখানে তাহাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেই কটকের র‍্যাভেন্সা কলেজও তাহাকে চৌকাঠ মাড়াইতে দিল না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কোপে পড়িতে কে চাহে!

প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিতাড়িত হইয়া এবং অন্য কোনও কলেজে স্থান না হওয়ায় সুভাষচন্দ্র কটকে অধিষ্ঠান করিলেন। মা-সরস্বতীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ,

কাজেই পল্লী-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ! আজও, এই ত্রিশ বৎসর পরেও, কটকের তরুণ-তরুণীরা সেই এক বা দেড় বৎসরের 'ইতিহাসের' গৌরব করেন। বলেন, বারাঙের অরণ্যাভ্যন্তরেই আই-এন্-এর সূচনা হইয়াছিল। কটকের জনকল্যাণকর সর্ব্ববিধ কার্য্যই সুভাষ ও তাঁহার সেই 'আই-এন্-এ' বাহিনী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। দুঃস্থের সাহায্যার্থ মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ, দুঃস্থের সেবা, রোগীর শুশ্রূষা, মৃতের সৎকার, সমস্তই তাহাদের কার্য্যের তালিকাভুক্ত। ব্যায়ামাগার, পাঠাগার, হস্তলিখিত মাসিক পত্র পরিচালনা, ডিবেটিং সোসাইটি স্থাপনাও এই সময়ে। আর অপরাহ্নের দিকে দলবদ্ধ, সারিবদ্ধভাবে কদমে কদমে কুচ কাওয়াজ করিতে করিতে বারাং পর্য্যন্ত গমন ও সন্ধ্যায় "বঙ্গ আমার জননী আমার" সঙ্গীত সহযোগে কটক ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে প্রত্যাগমন। উত্তরকালে সুভাষচন্দ্র যে সকল কার্য্য করিয়া যশঃস্বী হইয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে, সে সকলেরই সূচনা এই সময়ে—কটকেই হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের প্রধান মহানগরী কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হইয়াছিলেন। অতি অল্পকাল—মাত্র পাঁচ মাস—তিনি ঐ পদ অধিকার করিয়াছিলেন (কেন, তাহা আমরা সকলেই জানি। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম", অতএব তাঁহাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল।) কিন্তু সেই অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রতিভার পরিচয় প্রকাশ পাইতে কোনই বাধা জন্মে নাই। কটকের পল্লীসেবাকেই 'হাতে খড়ি' বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হাতে খড়ি ভালই হইয়াছিল। উত্তরকালে কলিকাতা মহানগরীর মেয়র হইয়াছিলেন বলিয়াই যে একথা বলিতেছি এমন নহে; পরন্তু স্বায়ত্তশাসন ও মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে সুভাষ-বাবুকে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে সমগ্র ভারতবর্ষই আগ্রহী হইয়াছিল। সঙ্গঠন-কার্য্যের হাতে খড়ি কেমন, উত্তরকালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার কোর ও আই-এন-এ অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ।

এই দেড় বৎসর কাল যে বৃথা যায় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই কালাবসানে, স্যার আশুতোষের চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে পুনঃ প্রবেশধিকার প্রাপ্ত হ'ন। অন্য পরিচ্ছেদে তাহার বিবরণ বিবৃত হইবে।

কয়েকবৎসর পরে আবার একবার ধুমকেতুর আবির্ভাব ঘটিল। বিলাতে, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (I. C. S.) পরীক্ষায় সসম্মানে—চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া মাত্র কয়েকদিন পরে, ঐ ব্যক্তি ইণ্ডিয়া অফিসে ঢুকিয়া সেক্রেটারী অফ

ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়ার হাতে সিভিল সার্ভিস পাঞ্জাখানা প্রত্যর্পণ করিয়া আর একবার যে আলোড়ন ঘটাইল তাহাতে শুধু ভারতসমুদ্র নহে, পৃথিবীতে যে সাতটা মহাসমুদ্র আছে সেই সাতসমুদ্রই উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। সিভিল সার্ভিসের উৎপত্তি হেভেন-এ—স্বর্গে, সেই জন্য এই সার্ভিসকে হেভেন-বরন্ সার্ভিস বলা হইয়াছে। এই চাকরীতে যাহারা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে আমরা—অর্থাৎ পৌত্তলিকগণ—ঈশ্বর-জানিত মহাপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করি, আর অন্য সর্ব্বত্র এই চাকুরিয়াদিগকে ঈশ্বরের সমতুল্য, ডেমি-গড্ রূপে পূজার্চ্চনা করা হয়। ইংলণ্ডের রাজার মুকুটের কোহিনূরের যে মর্য্যাদা, এই সার্ভিসেরও তাদৃশ সম্মান। বঙ্গ সমাজে (শুধুই বঙ্গ ?) আই-সি-এসের সুগলে যে কন্যা মাল্য দান করিতে পারে, পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদের সভায় যে কন্যাকুমারী অর্জ্জুনের গলে মাল্য দান করিয়াছিল, তাহার তুল্য যশঃস্বিনী। কিন্তু, ধূমকেতু তাহার পুচ্ছ তাড়নে নীল সমুদ্রের নির্ম্মল নীল জলও ঘোলা করিয়া দিল।

ইহার কিছুদিন পরে আর একবার ধূমকেতুর দর্শন মিলিল। ঘটনা ক্ষুদ্র, নাটকের কুশীলবগণও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কিন্তু আলোড়ন নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করিয়া মরুস্থানে কুসুমকানন রচনা করিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে, সংগঠনশক্তির প্রাথমিক পরিচয় হিসাবে সেই ঘটনাটি আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের এ্যাডমিনষ্ট্রেসন রিপোর্ট—শাসন-বিবরণীর উপক্রমণিকায় লিখিত থাকিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।

উত্তর বঙ্গে ভীষণ প্লাবন। সমগ্র উত্তর বঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে। এমনটি নাকি আর কখনও হয় নাই। লোক যে কত মরিয়াছে, বাড়ীঘর যে কত ভাসিয়াছে তাহার হিসাব নাই। গবাদি পশু নিশ্চিহ্ন ; গ্রামকে গ্রাম উজাড় ; পল্লীকে পল্লী অদৃশ্য ; লোক গাছের ডালে উঠিয়া বসিয়া আছে ; ভাসমান চালের মটকায় উঠিয়া দিনপাত করিতেছে। খাদ্য নাই, পরিধেয় বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই।

কলিকাতায় বন্যার্ত্তদিগের দুঃখবিমোচন জন্য ফাণ্ড গঠিত হইয়াছে। সংকীর্ত্তনের দল বাহির হইয়াছে—নূতন নূতন গান, নূতন নূতন সুরে গীত হইতেছে—থলিতে চাল ডাল, ঝুলিতে টাকা পয়সা, বাঁকে কাপড় জামা ভরিয়া উঠিয়াছে। সমাজের এবং সমাজের বাহিরের নারীরাও রাজপথ আলোকিত, পথিক-চিত্ত বিমোহিত—বুঝি বা বিভ্রান্ত করিয়া বন্যাক্লিষ্টের ক্লেশ নিবারণে পরম যত্নবতী হইয়াছেন। বেশবাসের বৈচিত্র্যে, রূপের ঝলকে, সুবাস-পুলকে, সুরের ঝঙ্কারে,

বিলোল কটাক্ষের প্রহারে, কমনীয় কোমল আননের নীরব করুণ আবেদনে মানুষের মনে ও পকেটে তুমুল দ্বন্দ্ব চলিতেছে। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিয়া অর্থ, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়জামা, ঔষধপথ্য সংগ্রহ করিয়া উত্তর বঙ্গে পাঠাইতেছেন।

গভর্ণমেণ্ট নীরব, নিশ্চল, গম্ভীর ও স্তব্ধ। বোধ করি চোখেও দেখে না, কাণেও শুনে না, কথাও বলে না। লোক যখন বড় বেশী হল্লা করে, চেঁচামেচি করে, তখন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হিন্দি-বাঙ্গলা-ইংরেজীতে বলে, গভর্ণমেণ্ট কি চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী (ইনষ্টিটিউসন ?) যে ফুকা কাচের শিশি হস্তে জানালায় দাঁড়াইলেই দাওয়াই মিল্ যায় গা!

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজে মাতিয়াছেন, সারা দেশের যুব সম্প্রদায়কে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। ছাত্রসমাজে ঋষিকল্প ও পূতচরিত্র ব্যক্তিটির অসামান্য প্রভাব। ছাত্র সমাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রবল বন্যা বাঙ্গলার যুবসমাজকেও সংক্রামিত করিয়াছে। বেকার, নিষ্কর্ম্মা ও নিষ্ক্রিয় যুব সম্প্রদায়েও অভিনব শিহরণ অনুভূত হইতেছে।

ইহার অত্যল্পকাল পূর্ব্বে, স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গলার যুব সমাজের সম্মুখে সেবা ব্রতের উচ্চাদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রাম-কৃষ্ণ সেবাশ্রম বাঙ্গলার জনগণমনে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদ জাগাইয়াছে। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে স্বামীজীর সেই সাহসপ্রোজ্জ্বল দৃপ্ত দিব্য মূর্ত্তি; বাঙ্গালীর শিয়রে শিয়রে স্বামীজীর গ্রন্থ; মুখে মুখে স্বামীজীর বাণী। যে পাঠ করিয়াছে—আর যে পাঠ না করিয়াছে লোকের মুখে শুনিয়া, সেও মুগ্ধ বিমোহিত হইয়াছে। আতুরের সেবা, আর্ত্তের উপকার—মানব হৃদয়ের সুপ্ত তারে অতি সঙ্গোপনে অতি সূক্ষ্ম ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইতে সুরু করিয়াছে! বিবেকানন্দের মূর্ত্তির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই সম্মোহন আসে।

এমন সময়ে উত্তর বঙ্গে প্লাবন! বাঙ্গলার শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী যুবসমাজ উত্তরবঙ্গের নামে ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল, তাহাদের মন সেইদিকে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংসর্গ দোষ মন্দেও আছে, ভালোতেও আছে; মন্দেরও সংক্রামকতা আছে, ভালরও আছে। অনুপাত—রেসিয়ো-র হারে ইতর বিশেষ থাকিতে পারে কিন্তু ছোঁয়াচ যে খারাপেরই লাগে, আর ভালোর লাগে না—এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। যাঁহারা, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশের ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন, তাঁহারা সৎসঙ্গে কাশীবাস হয়, এ কথাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নতুবা, আমাদের যে ক্লাবে মা সরস্বতীর সম্মুখে·নো-ভেকেন্সীও নো-এ্যাডমিসান লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও প্রবেশের চেষ্টা করিলে বীণাপাণির বীণাটি কাড়িয়া চোরা বাজারে বিক্রমপুরে প্রেরণ এবং দেবীর বাহনটিকে ধরিয়া ডাক্ রোষ্ট বানাইয়া ভক্ষণ করা হইবে জানাইয়া দিতেও কসুর হয় নাই, সেই "গোলোকে"র বিশ পঁচিশ জন সদস্য উত্তর বঙ্গে ছুটিবে কেন ? ক্লাবটির সবিশদ পরিচয় দিতে পারিব না বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। গোলোকের গোলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। নীতিজ্ঞানীরা বলেন, মৃতের সম্বন্ধে মন্দ কিছু বলিও না (দি মরট্যুইস্ নিহিল নিসি বোনাম্)। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব, কাজ কি ! তবে একটা কথা না বলিলেই নয়। গোলোক গতাসু হইয়'ছে ভালই করিয়াছে ; নহিলে সদস্যগণ গুল্‌তি প্র্যাকটিশে যেরূপ পোক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহাতে কেবল মাত্র ঢিলাইয়াই ব্রিটিশকে 'কুইট ইণ্ডিয়া' করিয়া তবে ছাড়িতেন ! ক্লাবটির অবস্থিতি ছিল, দর্জ্জিপাড়ায়। ইদানীং-কালে আমাদের শরৎদা দর্জ্জিপাড়াকে স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। "শ্রীকান্ত"র দর্জ্জিপাড়ার নুতুন দা ও তস্য পাম্পশু জুতা কি ভুলিবার ? শরৎদা বোধ হয় আমাদের গোলোক দেখিয়াছিলেন, কিম্বা হয়ত বা সভ্যই ছিলেন, কে জানে ! গোলোকে পাইকারী দরেই নতুনদা'রা থাকিতেন।

গোলোকের সাতাশজন সদস্য উত্তর বঙ্গে গিয়াছিলেন। একদিন তিনজনের প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহারা বলিলেন, নর্থ বেঙ্গলের উপর তাঁহারা হাড়ে চটিয়াছেন। আর যাইবেন না ; কিছুতেই না ; এমন কি, পি-সি-রায় মাথার দিব্য দিলেও, না।

নাকে খৎ, কাণ মোচড়া
আর যাব না বাগাচঁড়া।

শুনিলাম—শুনিলাম কেন, বুঝিলাম, সেই ধুমকেতু ! ধূমকেতুর আবির্ভাবে সমস্তই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাঁহারা ফাষ্ট ব্যাচের—একেবারে গোড়ার' কালের ভলান্টিয়ার, পাকা ঘুঁটিরও অধিক। 'কাল্‌কা যোগী দীর্ঘ জটা' সুভাষ বোস তাঁহাদের নিকট (১) চাল ডালের হিসাব চাহিয়াছে (২) ক্যাম্প কমাণ্ডান্টের বিনানুমতিতে নৈশ ভ্রমণ (বিহার ?) নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে (৩) রোল কল্ প্যারেডে যোগ দিতে বাধ্য করিয়াছে (৪) মুখের কাছে নাক আনিয়া মিছামিছি কিসের গন্ধ পাইয়া সসপেণ্ড করিবার হুমকী দিয়াছে (৫) একটা নোটিশ বোর্ডে হ য ব র ল যা-ইচ্ছে- তাই লিখিয়া সকলকে তাহা মুখস্ত করিতে বলিয়াছে (পাকা ঘুঁটিরাও বাদ নহে) ইত্যাদি এবং প্রভৃতি। পরবর্ত্তীকালে

পৃথিবীতে, এবম্বিধ আচরণ, নাৎসিজম, ফ্যাসিজম বলিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল। গোলোক-বিহারীগণ এই ভবিষ্যদ্বাণীই করিয়াছিল। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

আর শুনিলাম—শুনিলাম কেন, বেশ আতঙ্কিত হইলাম যে, ফার্ষ্ট ব্যাচে যে কয়জন উড়িষ্যানন্দন সুপকার হইয়া গিয়াছিল তাহারাও কর্ম্মে ইস্তফা দিয়াছে; পাওনা গণ্ডার জন্য ধর্ণা দিতেছে; প্রাপ্য বুঝিয়া পাইবামাত্র শিয়ালদহের রেলের টিকিট কিনিবে। ফলে এই যে শত শত স্বেচ্ছাসেবক সেবা কার্য্য করিতেছে তাহাদের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বন্ধ হইবেই হইবে। তাহাদের চার্জ্জও সামান্য নহে। উড়িয়া ঠাকুরকে পাণ শুপারী-দোক্তা, অভাবে পয়সা দিতে হয়, এ কথাটা না জানে কে? না দেয় কে? কিন্তু নবীন ক্যাম্প কমাণ্ডেণ্ট কড়া আইন করিয়াছেন, একটি কাণাকড়িও না! চাকর মহলেও বিদ্রোহের আশঙ্কা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ক্যাম্পের ঝাঁপ গুটাইতে না হয় যদি, তবে ইহাদের অর্থাৎ (গোলোকের গোলোকবাসিদের) নাম মিথ্যা, ধাম মিথ্যা, জন্ম মিথ্যা, তাহাদের পিতা মাতা ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যার বেসাতি মাত্র।

আজ, প্রায় দুই যুগ পরে এই কথাগুলি যখন লিখিতেছি তখন নিজের মনে হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; কিন্তু সত্য বলিতেছি, তখন একটা আশু বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত না হইয়া পারা যায় নাই। দর্জ্জিপাড়ায় এই হরিদ্রা বর্ণের কনকপোতগুলিকে সাজাইয়া গুজাইয়া অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের মুনিজনমনোলোভা চিত্রাঙ্কন করিয়া আমিই আগু বাড়িয়া উত্তর বঙ্গে পাঠাইয়াছিলাম! বিবেকানন্দকে তাহারা থোড়াই কেয়ার করিত। বিবেকানন্দ তাহাদের নিকট অজ্ঞাতপরিচয়। তাহারা পঞ্চানন্দকে জানে ও মানে। সে জানাটা কিরূপ তাহাও বলা দরকার। বেশী বলিতে পারিব না। আভাষে ইঙ্গিতে বলি:

পঞ্চানন্দকে মান্য করে, কেননা—

যে বলে গাঁজায় গন্ধ
ঘাড় ভাঙ্গে তার পঞ্চানন্দ!

পঞ্চানন্দের খাতির সেই জন্য!

পি-সি-রায় নামধারী ব্যাক্তিটিকে আমাদের গোলোক-বাসিদিগের চিত্তে পরিচিত করাইতে যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা আমি বলিতে প্রস্তুত থাকিলেও পাঠকসমাজের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। 'মাতুলালয়ের'

সংবাদ তাহাদের নখদর্পণে; স্থল পথেও অসীম অভিজ্ঞতা! জলে ও স্থলে যাহাদের অবাধ আধিপত্য, অন্তরীক্ষ্যেও পিছাইয়া পড়িবার লোক তাহারা নহে। আঁচলে বাঁধা চাবির রিঙের শব্দে তাহারা অঞ্চলাধিকারিণীর সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় গদ্যে পদ্যে বর্ণনা করিয়া কালিদাসের শৃঙ্গারাষ্টকমের মৌলিকত্ব নাশ করিতে পারে। তাহাদের সান্ধ্য বৈঠকের দাপটে দর্জ্জিপাড়ার অনেক বাড়ীর লোক রোয়াক ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছে। এই পিতৃ-তাড়িত মাতৃ-বিতাড়িত জনমর্দ্দগুলিকে লইয়া প্রথম যেদিন অত্যন্ত কুণ্ঠাভরেই আচার্য্যদেবের নিকট গেলাম, আশ্চর্য্য আচার্য্যদেব! আনন্দে ডগমগ হইয়া বলিলেন, ইহারাই মুখ্যি কুলীন বটে! আচার্য্যদেব যে একটা সেতুবন্ধের পরিকল্পনা করিতেছেন, নিঃসন্দেহ তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। আচার্য্যদেব কুলীনের কুল-মর্য্যাদা সম্বন্ধে এতই সচেতন যে সে আর কি বলিব? জামা, কাপড়, জুতা, সাবান, চিরুণী, ব্রাস এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাতকারণে হাত খরচ সম্বন্ধে ঢালোয়া হুকুম দিয়া দিলেন। প্রসঙ্গাভ্যন্তরে এ কথাটাও বলা উচিত যে আমরা কয়েকজন আচার্য্যদেবের 'আদর' লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। 'অঞ্চলের নিধি' (অবশ্য জননীর) বলিয়া আমাদের রঙ্গ করা হইত! কারণ, আমরা স্টেজে না নামিয়া নৈপথ্য-বিহার করিতেই চিরাভ্যস্ত। 'প্রম্পটার' কবে ও কোথায় আদর পায়?

সেদিনে আর আজিকার দিনে কি এতটুকুও মিল হয় না! আজ একটা কাজের খবর কাণে আসিতে যে বিলম্ব! আগে চল্ আগে চল্ রবে যুব সমাজ যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে; আর সেদিন দশমগ্রহ পূজার আয়োজন করিতে হইত। অনিশ্চিতে এমন মোহ, বিপদে এত আনন্দ, মরণেও এমন ঔদাসীন্য সেদিন বুঝি কল্পনারও অতীত ছিল। পৃথিবী আজ যেন বর্ষার খরস্রোতা নদী জলে ভাসিয়া চলিয়াছে। জোয়ারেও আনন্দ ভাঁটাতেও উল্লাস, প্রমোদেও অরুচি নাই, প্রমাদেও আকুল আগ্রহ। আজিকার যুব সমাজ—যুব সমাজ বলিতে যুবক যুবতী উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝায়, তাহা বোধ করি বলিতে যাওয়াই ধৃষ্টতা জীব-জন্মের সার মর্ম্ম পদ্মপত্রে জল নিশ্চিত অনুধাবন করিয়া "হেসে নাও দু'দিন বৈ ত নয়" আর "নাঃ জীবনটা কিছু নাঃ" করিয়া স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। কুল মিলে ভাল, না হয় অকুলেও অকুতোভয়!

ইহার সূচনা ঐ সময়েই হইয়াছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দ বীজ বপন করিয়াছিলেন। গান্ধীজী দক্ষ কৃষক, সোনা ফলাইয়াছেন।

গোলোকের অধিবাসীগণ পি সি-রায়ের নিকট ডেপুটেসনে যাইবে; রিলিফ ক্যাম্পের সমূহ বিপদ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে কৃতসঙ্কল্প করিয়া আমাকে বলিল, ডেপুটেসন লীড করিতে হইবে। ধার্য্য দিবসে নির্দ্ধারিত সময়ে প্রবল জ্বরাক্রমণে শয্যাশায়ী না হইলে কি যে বলিতাম আর কি যে করিতাম ভাবিতেও লজ্জা করে! কিন্তু জ্বর যে এমন হাত-ধরা ও বিপদ ভঞ্জন হইল কিরূপে, তাহা বলিতে গেলে সাতকাণ্ড রামায়ণ হইয়া পড়ে। পক্ষীরাজ গরুড়কে ধন্যবাদ। দেবরাজ ইন্দ্রের ডিকেটার হইতে বড় বিত্তাবলে যে সুধা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারই একবিন্দু ছিপির ফাঁক দিয়া মর্ত্ত্যে পতিত হইয়াছিল। সেই সুধাবিন্দু হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদ মূলটি বগলে রাখিলে টেম্পারেচার হু হু করিয়া উঠিতে থাকে। ইহা পরীক্ষিত সত্য! পাঠিকা-সুন্দরী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। রশুনের গুটি কয়েক কোয়া কয়েক মিনিট বগলের তলে ধারণ করিয়া, ফলাফল আমাকে জানাইলে খুসী হইব।

আচার্য্যদেবকে পরে এ সকল কথা জানাইতে হইয়াছিল, রশুনের ক্রিয়া কলাপও বাদ পড়ে নাই। তিনি বলিলেন, সুভাষ দিগ্বিজয়ী ছেলে। এই দেখ না, লর্ড লিটন পর্য্যন্ত প্রশংসা করতে পথ পান্ নি।

লর্ড লিটন বোধ হয় তখন বাঙ্গলার গভর্ণর।

কিন্তু গোলোকে আমার যাওয়া ভার। নর্থ বেঙ্গলের রিলিফের জন্য বন্ধুবর্গের অন্তর অহরহ ক্রন্দন করিতেছে, অথচ সুভাষ বোসের জুলুমবাজির প্রতিকার না করিয়া শোকোপনোদন করিতে যাইতেও পারে না। তাই আমাকে পাইলেই কবে ও কখন্ পি-সি-রায়ের কাছে লইয়া যাইবে তাহারই তাগাদায় তাগাদায় 'বুঝি প্রাণ বাহিরায়'!

ধূমকেতু সম্বন্ধে গোলোক অজ্ঞান অচেতন থাকিলেও আমরা পুরা-মাত্রাতেই সচেতন ছিলাম। তখন চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ্য দল গঠিত হয় নাই; চিত্তরঞ্জন দাশের "ফরওয়ার্ড" পত্রও জন্ম গ্রহণ করে নাই; রাইটার্স বিল্ডিং তখনও কলিকাতা কর্পোরেশনকে কুক্ষিচ্যুত করিতে বাধ্য হয় নাই; জনগণমনে কংগ্রেস তখনও একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই; রাষ্ট্রপতিত্ব যে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান সে জ্ঞান তখনও পূর্ণায়ত্ত হয় নাই; একটা কংগ্রেসকে দু'খানা করা অথবা নূতন কংগ্রেস গঠন করার কল্পনাও তখন জাগে নাই সুতরাং কদমে কদমে চলিতে চলিতে খুসী মনে গান গাহিতে গাহিতে তেপান্তরের মাঠে রাজ্য, রাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এ সকলই স্বপ্নের অসীম পরিব্যাপ্ত সীমানারও বহির্ভূত ছিল।

তথাপি মনে হইল, যে লোক—আমাদেরই বয়সী যে ব্যক্তি লোকচরিত্র নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছে, সে ত সামান্য নহে! অসামান্য না হইয়া যায় না—যায় না! কুৎসা করিতে নাই। বন্ধুবান্ধবের কুৎসা করা আরও, অতীব গর্হিত কার্য্য। আমি সে সকল কাজ করিয়া নরকে যাইতে চাহি না। আমি শুদ্ধমাত্র এই বলি যে, হাঁগা, দর্জ্জিপাড়ার নতুন দা'দের সুভাষ এমন ঝটিতি চিনিয়া ফেলিল কি করিয়া?

কয়েকদিন পরে, গোলোকের অপর এক সদস্য এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঔষধাদির এক বিরাট ফর্দ্দ লইয়া আচার্য্য দেবের কাছে যাইতে হইল। শৈলেশ আজ আর এ পৃথিবীতে নাই। আচার্য্যের আশীর্ব্বাদ ও সুভাষের আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা হতভাগা বেশী দিন সম্ভোগ করিতে পারিল না। যে দিন সে ল' পাশ করিয়া আদালতে টাকা জমা দিয়া উকীল হইল, তাহার পরদিন কোন্ অজানা আদালতের ডাকে কোথায় যে চলিয়া গেল, এ পৃথিবীতে তাহার চিহ্নটুকুও চিরতরে লুপ্ত হইল।

আচার্য্য শৈলেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কষ্ট টষ্ট হচ্ছে না ত বাবা?

শৈলেশ ভ্যাকুম-মুক্ত ইঞ্জিনের মত ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল; বলিল, কষ্ট কি বলছেন স্যার, কারও এতটুকু অসুবিধে পর্য্যন্ত নেই। ঘড়ির কাঁটা যেমন চলে, মিষ্টার বোসের আমলে তেরটা ক্যাম্প তেমনই ঘড়ির কাঁটার মত চলছে। চিঠি পত্র আসা যাওয়া নিয়ে ভারি মুস্কিল ছিল, গত সপ্তাহ থেকে আমাদের নিজেদের পোষ্টাফিস হয়েছে; ক্যাম্প-রাণার সিস্‌টেম্ খোলা হয়ে গেছে, স্যার; সালতি ক'রে আমরা ডাক নিয়ে যাই, নিয়ে আসি—পোষ্টাফিসের লোকেরা খুব খুশী। ক্যাম্পের অধীনে, তিনটে হাসপাতাল চল্‌ছে, এই ওষুধগুলো নিয়ে যেতে পারলে আর একটা ডাক্তারখানা খোলা হবে। রোগীর সংখ্যাও স্যার, ক্রমশঃ কমে আসছে।

আচার্য্য পরম সন্তুষ্ট মনে প্রশ্ন করিলেন, সুভাষ তোমাদের যত্ন টত্ন করে ত?

শৈলেশ লজ্জায় যেন রাঙা হইয়া উঠিল; অন্তরের পরিতৃপ্তি স্নিগ্ধ হাস্য-বিভায় তাহার সুকুমার আননখানিকে অপরূপ শ্রী বিমণ্ডিত করিল; সে নতাননে নম্রকণ্ঠে কহিল, করেন। বলিয়া সে একটু থামিল। তারপর, লজ্জাশীলা কিশোরী বালিকার মুখ একবার খুলিয়া গেলে যেমন বাক্যের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে, তেমনই অবিরাম গতিতে শৈলেশ বলিতে লাগিল, ক্যাম্পে খাবার ঘন্টা পড়লে, সমস্ত

ভলাণ্টিয়ারকে খেতে যেতে হয়, তিনিও সকলের সঙ্গে সেইখানে মাটিতে পাতা পেতে বসে পড়েন। কেউ যদি কোনদিন না আসে, কেন এলো না, অসুখ হয়েছে কি-না, কেন খাবে না, নিজে গিয়ে যতক্ষণ না জানছেন"—বলিতে বলিতে শৈলেশ থামিল। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রেমে তাহার অন্তর প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল; দু' একটা তরঙ্গ যেন কণ্ঠতটে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া কণ্ঠ রোধ করিয়া দিতেছিল। একটু পরে নতমুখে নম্রস্বরে বলিল, একদিন আমার মাথা ধরেছিল, অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছি হঠাৎ দেখি হ্যারিকেন হাতে ক'রে"—শৈলেশ আর বলিতে পারিল না।

আজাদ-হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট দেখি নাই—চকিতে আসিয়াছিল, চকিতে চলিয়া গিয়াছে। যেন—ভুলে ভুলে দেখা, ভুলে ভুলে শোনা; ভুলে মনে রাখা, ভুলে—ভুলে যাওয়া। সেই অস্থায়ী রাজ্যের প্রজাদেরও কথা বলিতে এই রকম কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া যায়; অশ্রুস্রোতে কথা ভাসিয়া যায়। যখন বাক্শক্তি ফিরিয়া আসে, কথা বলিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করে, বলে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার বন্দুকের মুখে রচিত হয় নাই; কূটনীতি দিয়া তাহাদের গাঁথনি হয় নাই। দেশপ্রেম ও স্বজাতি স্নেহের উপরেই সেই বিশাল সৌধ—বিরাট অট্টালিকা গঠিত হইয়াছিল।

২

ইংরাজী ভাষার "গ্র্যাঞ্জার" বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বাঙ্গলায় যদি তাহার দ্বারা জাঁকজমক বুঝায় তবে তাহার সহিত সুভাষচন্দ্রের মনের মিল ও অন্তরের সম্প্রীতি ছিল। খদ্দর, ত্যাগের প্রতীক ও চাকচিক্যহীন; এবং গান্ধীজি-পরিচালিত কংগ্রেসে, চাকচিক্য বর্জ্জন কংগ্রেসের অন্যতম মূলনীতি বলিয়া বিঘোষিত হইলেও কংগ্রেসে জাঁকজমক ও চাকচিক্যের অভাব কোনদিন দেখা যায় নাই। গান্ধীজী কংগ্রেসকে শহর হইতে দূরে পল্লীগ্রামে অথবা গণ্ডগ্রামে যেখানেই কেন লইয়া যান্ না, জাঁকজমক এবং চাকচিক্য হাত ধরাধরি করিয়া, সাজিয়া গুজিয়া, রঙ্গভরে লাস্যসহকারে থিয়েটারের গীতনাট্যের 'ব্যালে'র মত, সেইখানেই সহযাত্রী হইয়াছে। মোটা সুতায় হাতে-বোনা মোটা, খাটো ও 'গড়' খদ্দরও রাজাধিরাজ মহারাজার প্রাপ্য মান ও মর্য্যাদা পাইতে অভ্যস্ত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, গান্ধীজী স্বয়ং। গান্ধী-আরুইন চুক্তির দিনের কথা আমার মনে আছে। আমি তখন দিল্লী-প্রবাসী, খদ্দরের কটীবাসপরিহিত 'অর্দ্ধউলঙ্গ' এই ব্যক্তিটি যখন পুরাতন দিল্লী

হইতে নয়া দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি প্রাসাদে গমনাগমন করিতেন, তখন জড় প্রস্তর-নির্ম্মিত রাজপথ পর্য্যন্ত সজীব হইয়া উঠিত; সুবিশাল ও সুবিস্তৃত রাজধানীও ইন্দ্রপুরীতুল্য জাঁকজমকে খচিত ও চাকচিক্যে সচকিত হইয়া উঠিত।

যোল বৎসর পরে, আজ আবার নূতন করিয়া তাহারই পুনরভিনয় দেখিতে পাইতেছি। আজ দিল্লীতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী-মিশন ভারতবর্ষের সহিত বুঝা-পড়া করা যায় কিনা, কোন্ কোন্ সর্ত্তে বুঝা-পড়া হইতে পারে তাহারই বুঝা-পড়া করিতে বসিয়াছেন। এ সময়ে গান্ধীজী দিল্লীতে না থাকিলে, দিল্লীর যজ্ঞ দক্ষ-রাজার নিষ্ফল যজ্ঞ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা ছিল। তাই গান্ধীজি দিল্লীতে উপনীত। কিন্তু অবস্থিতি, ভাঙ্গি পল্লীতে। দু'চার দিনের জন্য দিল্লী প্রবাস করিতে আসিয়া দেখি, সেই ভাঙ্গি পল্লী রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদকেও দুয়ো দিতে বসিয়াছে। ভারত সচিব লণ্ডন নিবাসী মহামাননীয় লর্ড পেথিক লরেন্স মহোদয় সান্ধ্য ভ্রমণ মানসে ভাঙ্গী পল্লীতেই পাদচারণা করিতেছেন। এই মেথর পাড়ায় স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের ঘন ঘন আগমন ঘটিতেছে; পাতিয়ালার মহারাজের কাণের ও আঙ্গুলের ভূষণগুলির দ্বারা আধখানা দিল্লী আমি নিলামে কিনিতে পারি; (অবশ্য যদি নিলামে উঠে এবং মহারাজার ভাণ্ডার আমার হয় রত্ন!) ভূপালের নবাব যে এখানে যখন তখন পদার্পণ করিবেন তাহা কি তাঁহারই স্বপ্নেরও অগোচর ছিল না? বড়লাট সাহেবের অর্থসচিব প্রবল পরাক্রান্ত আর্চিবল্ড রাউল্যাণ্ড সাহেব নাসিকায় রুমাল না দিয়াও এই পাড়ার এই কুটীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেছেন, ইহাও চাক্ষুষ করা যাইতেছে। নারায়ণ ভূরিভোজনের স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া বিদূরের কুটীরে ক্ষুদান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন; রাজা অশোক স্বর্ণ সিংহাসন অপেক্ষা ভূম্যাসনে বসিতে ভালবাসিতেন; গান্ধীজী হরিজন পল্লীকে দুনিয়ার 'বড় লোকদের পাতে' তুলিয়া দিলেন। ভাঙ্গি পল্লী জাঁক জমকে জম জম, গানে গুঞ্জনে গম্ গম্, চাকচিক্যে চকিত ও 'গ্র্যাঞ্জারে' সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

বহুকাল পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-পর্য্যটক তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, 'গান্ধীজীর মত কুৎসিৎ ও কদাকার লোক সচারাচর দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই কদাকার ও কুৎসিত লোকটির চতুষ্পার্শে এমন একটি শুচিস্নাত সুরুচিসম্পন্ন 'রাজশ্রী' বিরাজ করে যে, যে কোন লোক তাঁহার সন্নিধানে আসিবামাত্র অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। যত দম্ভোদ্ধত চিত্ত ও উন্নতশির, যে দেশেরই মানুষ হৌক না কেন, এই সহজ,

শান্ত, স্তব্ধ, ও সুবিন্যস্ত পর্ণকুটিরের শীর্ণকায় জীর্ণঅঙ্গ অধিকারীর সম্মুখীন হইবামাত্র নিজের অজ্ঞাতসারে বিনয়ে নত হইয়া আসে। পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরে খুব সাদাসিদা, অমসৃন খদ্দরের ভূমিশয্যা, কুটীরে আসবাবপত্র আদৌ নাই, অথবা থাকিলেও এতই অল্প ও তুচ্ছ যে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কুটীরাধিকারী লোকটি কটিবাস পরিহিত, উত্তরীয় আছে কিম্বা নাই, দেখা যায় না। চোখে মোটা কাচের চশমা—একখানি ফ্রেম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খদ্দরের দড়ি তাহার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। সেকালের রেলওয়ে রেগুলেটার গোছের আমপাড়া একটা ঘড়ি মোটা একটা দড়িতে সংযুক্ত হইয়া লোকটির কোমরে সংলগ্ন থাকিয়া সময়ের মূল্য নিরূপণ করিতেছে! অতীতের মাঝে এইটুকুই আধুনিকতা! আর রূপের বর্ণনা সে ত আগেই করিয়াছি! কিন্তু ঐ দুর্ব্বল, কৃশকায়, জীর্ণ ও কদাকার লোকটির সম্মুখীন হইবামাত্র মনে হইল, আগন্তুকের নিকট হইতে রাজকীয় মর্য্যাদা আদায় করিয়া লইবার জন্যই সে বসিয়া আছে; প্রাপ্য না দিয়া উপায় নাই। পৃথিবীর বহু নরপতি যে সম্মান দুরাশাতেও আশা করিতে পারেন না, এই আয়ত-উজ্জ্বলনয়ন, অর্দ্ধ উলঙ্গ ফকিরটি অনায়াসেই তাহা লাভ করিতে অভ্যস্ত।" [হাফ-নেকেড ফকির]।

আজ খদ্দর সূক্ষ্ম ও মসৃন হইয়াছে; কিন্তু খদ্দরের জন্মকালে খদ্দর পরিধান করিয়া রাজনৈতিক ভদ্দর হওয়া সম্ভব হইলেও খদ্দর ছিল মোটা, মেঠো ও অভদ্র। 'বুনো' ঘোড়া 'ব্রেক' করিতে সেকালের কুক্ বা হার্ট ব্রাদার্সকে যে পরিমাণ বেগ পাইতে হইত; ভদ্দর হইবার বাসনায় খদ্দরধারণোদ্দেশ্যে কটীদেশ 'ব্রেক' করিতে আমাদিগকে তদপেক্ষা কম বেগ পাইতে হয় নাই। সেকালে খদ্দরে 'বাবু' সাজা সাধ্যাতীত ছিল বলিলেও বেশী বলা হয় না। গান্ধীজীর অবশ্য বাবুয়ানির বালাই নাই (কটীবাস বাবুয়ানির বিপরীত বিকাশ), তিনি বিলাতের বাকিংহাম প্যালেসের অধীশ্বরীকে ঐ খদ্দরেই 'ধন্য' করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, তস্য পুত্র দিগ্বিজয়ী জওহরলাল, আমাদের যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন, ভস্ম কখনই অগ্নিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না—খদ্দরেও রূপ ফাটিয়া পড়িতে পারে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উন্নত শিরে গান্ধীজী একদা একসঙ্গে তিনটি শিরোপা চাপাইয়া দিয়াছিলেন। সেদিন যতীন্দ্রমোহন ছিলেন বাঙ্গলার কংগ্রেসের নেতা, আইন সভায় কংগ্রেসের দলপতি ও কলিকাতার মেয়র: একই সময়ে তিনটি সম্মানজনক পদের অধিকারী। আমাদের প্রাচীন কাব্যাদি গ্রন্থে পুরুষের রূপের

একটা মান (স্ট্যাণ্ডার্ড) ছিল, সেকালের সমাজে সেই রূপের একটা মান মর্য্যাদাও ছিল। আজ পুরুষের রূপের ত কথাই নাই, নারীর রূপ বর্ণনাও অচল এবং কাজে কাজেই অদৃশ্য। অবশ্য বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত পরিণতি বটে। সাহিত্য সমাজের মুকুর! সমাজে যাহা আছে, সাহিত্যে তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়; সমাজে যাহা নাই, সাহিত্যে তাহা আসিবে কিরূপে? যেদিন দেশে খাদ্যের অভাব হইয়াছে, রূপের বিভা সেইদিন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। যেদিন খাদ্য গিয়াছে, সেদিন স্বাস্থ্য গিয়াছে। স্বাস্থ্যহীন জাতি রোগের আকর হইয়াছে। রূপ-শ্রী সেই দিন দেশ হইতে অন্তর্হিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে দেশের এতখানি খাদ্যাভাব হইয়াছিল কি-না বলিতে পারিব না; তবে তাঁহার রচনার মধ্যেও যে পার্থক্য আছে তাহাও লক্ষ্য করিতে হয়। নবাবনন্দিনী আয়েসা অথবা প্রতাপের বাল্য-সঙ্গিনী শৈবলিনীর রূপ-বর্ণনায় চিত্রকরের যে নৈপুণ্য ও আগ্রহ দেখি, পরবর্ত্তীকালের সূর্য্যমুখী বা রাধারাণীতে ততখানি আগ্রহ আর দেখি না। কেন দেখি না, তাহাও কি বলিতে হইবে? রবীন্দ্রনাথ রূপ-বর্ণনায় সংযম প্রকাশ করিলেন কেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে পথ একদম মাড়াইলেন না কেন, পাঠক-পাঠিকা সমাজের তাহা অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। পরবর্ত্তী সময়ের গল্প-উপন্যাস লেখকগণ আরও সতর্ক। তাঁহারা সমস্যা সমূহের সন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। গুটি পোকার বাসা ছাড়িয়া গুটির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ মনস্তত্ত্বে মনোনিবেশ করিলেন, কেহ বা সমস্যা ভঞ্জনে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু এক কথা সার। রূপের বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্ব দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহা দেশে নাই, তাহা সাহিত্যেও নাই। আজ দুর্ভিক্ষ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে বটে; কিন্তু সূচনা বহুদিন পূর্ব্বেই হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষকবলিত দেশের কবি ক্ষুধার জ্বালা অঙ্কিত করিতে পারিলেও রূপ-জ্যোতিঃ তাঁহার ধারণার অতীত। আজ যদি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সশরীরে আগমন করিতেন, তাহা হইলে প্রতাপ রায় কিম্বা শৈবলিনী আঁকিতে তাঁহার দিগ্বিজয়ী লেখনীও অবশ ও অলস হইত। নবাবনন্দিনী আয়েষার জনক আজ শত চেষ্টা সত্বেও ক্ষুদ্র সংস্করণ একটি আয়েসাও লিখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ! থাক্ সে কথা।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রূপের মানও পূরণ করিয়াছিলেন, প্রাপ্য মান ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘোন্নত দেহ, বিশাল বৃষস্কন্ধ, গৌর বর্ণ, সুকুমার আনন, খগ নাসা, আয়ত লোচন, আজানুলম্বিত বাহু মোটা খদ্দরের চাপে বিবর্ণ

বা মলিন না হইয়া উজ্জ্বল বিভায় বিকশিত হইতেই দেখা যাইত। সেনগুপ্ত বারবার পাঁচ বার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সদগুণরাশির তাঁহার অভাব ছিল না, কিন্তু কাব্যবর্ণিত রূপও যে অনেকখানি কার্য্য আপনা হইতেই সাধিত, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কথায় বলে, পহেলা দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারী—কথা সঙ্গত। সুভাষের সম্বন্ধেও কথাগুলি খাটে; সর্ব্বাংশে না হৌক, অংশতঃ নিশ্চয়।

গান্ধীজী, মৃত ও বিস্মৃতপ্রায় খদ্দরকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া, রাষ্ট্রসাধনার অঙ্গের সহিত খদ্দরের গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বত্যাগীর ভূষণ করিলেও খদ্দরকে সন্ন্যাসীর গেরুয়া করার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না ইহা সকলেই জানেন। কংগ্রেসী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, ঘর সংসার ভাসাইয়াছে, বিলাস ব্যসন তাহাদের নিকট অস্পৃশ্য, তথাপি কংগ্রেস সন্ন্যাসীর আশ্রম বা উদাসীর মঠ হয় নাই। তাই গান্ধীজীর ভাল লাগে কি ভাল লাগে না, তাঁহার ইচ্ছা আছে কিম্বা নাই ইহার সন্ধান করিতে উদ্যোগ আয়োজন কেহ করে নাই এবং কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় শক্তি অর্জ্জন করিয়া যতই শক্তিশালী হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের জাঁকজমকও বাড়িয়াছে। কাহারও পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন একেবারেই নিরর্থক ও অবান্তর। সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে জাঁকজমকের আকর্ষণ ফুলের অভ্যন্তরে মধুর মত ওতঃপ্রোত ভাবে বিজড়িত, সংমিশ্রিত ছিল।

ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ সুভাষচন্দ্রের হাতে আসিয়া পড়িল। লীগের বহু শাখা প্রশাখা সুবিস্তৃত দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডে পরিব্যাপ্ত। ভারতবর্ষীয় কংগ্রেসের অনুসরণে সেখানেও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সাধনা চলিতেছিল। বৃটিশের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে পরাধীন জাতির মনে উল্লাস ও উদ্দীপনার প্রবল প্রবাহ সেখানেও প্রবাহিত। বৃটিশ-পরিত্যক্ত ভাগ্যবিড়ম্বিত ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা, সেই সময়ে, সেই অবস্থায়, সেই পরিবেশে সহজ ও স্বাভাবিক হইলেও, সেই পরদেশে, ভূমিশূন্য রাজ্যে একটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে 'রাজসিকতা', তাহার জাঁকজমক ও চাকচিক্য কেবলমাত্র সুভাষচন্দ্রেরই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তাহা আমরা নিঃসন্দেহে, দৃঢ়তার সহিত নিশ্চিত অনুমান করিতে পারি। পরদেশে ভূমিশূন্য রাষ্ট্র গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হইতে ক্যাবিনেট সংগঠনের যে ঔজ্জ্বল্য, তাহাও সুভাষচন্দ্রের রাজ-অন্তরের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। বহুদিন, ন্যূনপক্ষে এক যুগাধিক-কাল পূর্ব্বে তাহার সূচনা এই কলিকাতা সহরেই দেখিয়াছিলাম। দুই আর

দুই যেমন চার হয়, পাঁচ কিছুতেই হয় না, তেমনই সেদিনের সঙ্গে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা দৃশ্যের সামঞ্জস্য অস্বীকার করাও অসাধ্য।

আমরা সকলেই জানি, সুভাষবাবু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হইয়াছিলেন। একবার—বোধহয়— ১৯২৮ সালে, তাঁহাকে মেয়র নির্ব্বাচিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বাদবিসম্বাদের ফলে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া বি, কে, বাসু (আমাদের 'মিতা' বিজয়কুমার বসু) মেয়র নির্ব্বাচিত হন। ইহার আড়াই বৎসর পরে, সুভাষবাবু যখন কারাগারে আবদ্ধ (আগস্ট ১৯৩০) তখন তিনি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মেয়র্যালটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। কারামুক্ত হইয়া কয়েকমাস কাজ না করিতেই পুনরায় কংগ্রেসীর স্থায়ী আবাস—রাজার অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিতে হয়। গান্ধীজী যেমন একটিবারমাত্র কংগ্রেসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ক্ষান্ত এবং তদবধি সভাপতি প্রস্তুতকারক (কুম্ভকার ?) থাকিয়া সন্তুষ্ট আছেন, কলিকাতা কর্পোরেশনেও সুভাষবাবু তদ্রূপ মেয়র-মেকার থাকিয়াই খুশী। মৌলানা আজাদ ছয় বৎসর ও তিনবার, পণ্ডিত জওহরলাল চারবার রাষ্ট্রপতিত্ব করিয়াছেন কিন্তু গান্ধীজী মাত্র একবৎসর ও একবার রাষ্ট্রপতি! চিত্তরঞ্জন দাশ দুইবার, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পাঁচবার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দুইবার মেয়র হইয়াছেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু ঐ একবারই, তা'ও ঐ কয়েক মাসেরই জন্য।

মেয়র—মহানগরীর সর্ব্বপ্রধান নাগরিক, পদটি সম্মানার্হ এবং বিশেষ মর্য্যাদাব্যঞ্জক। লণ্ডনের মেয়রকে লর্ড মেয়র বলা হয়। লর্ড মেয়রের পদের অসামান্য মর্য্যাদার কথা আমাদের পাঠক-সমাজের অবিদিত থাকিবার কথা নহে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাইনের আমূল সংস্কার সাধন করিয়া যে মনস্বী ব্যক্তি লণ্ডনের ধাঁচে মেয়র পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মস্থান কলিকাতা মহানগরীর মেয়র পদটিকে অনুরূপ সম্মানসমৃদ্ধ করিবার বাসনা পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বলিখিত জীবন কথায় ['এ নেশন ইন দি মেকিং'] তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। লণ্ডনের লর্ড মেয়রের ব্যাঙ্কোয়েট্, লর্ড মেয়রের ডিনার ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। হয়ত দরিদ্র ভারতবর্ষের মেয়রগণকেও সেই 'টামসিক' গড্ডালিকাস্রোতে ভাসিতে হইত কিন্তু দরিদ্রনারায়ণের সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ লণ্ডনের প্রান্তবাহিনী টেমস নদীর পরিবর্ত্তে সগরবংশ-উদ্ধারিণী

স্বর্গমন্দাকিনী পূতবাহিনী ভাগীরথীর পুণ্যস্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, লর্ড মেয়রের চিত্র সেই স্রোতে কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার হদিস পাইবার আর উপায় নাই। প্রসঙ্গতঃ এ কথাটা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, ইংরাজের সহিত ভারতবর্ষের যখন জান্-পছান্ও ছিল না, আমাদের ভারতবর্ষের বহু নগরে তখনও মেয়রের উচ্চাসন ছিল এবং নাগরিকগণ যোগ্য ব্যক্তিকে মেয়র নির্ব্বাচন করিত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছেন মাত্র। মেয়র‍্যালটি ইংরাজের অভিনব দান বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

সুভাষচন্দ্র বসু মেয়র। একদিন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, কর্পোরেশনে একটা রিসেপসান্—পরিচয় সভা—অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। পরিচয়-সভায় কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কর্পোরেশনের পদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দকে মেয়রের সহিত পরিচিত করাইবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে যে না পারে এমন নহে। এক সময়ে এই সুভাষচন্দ্র বসু এই কর্পোরেশনেরই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন; পরে কাউন্সিলার অথবা অল্ডারম্যান ও ভিন্ন ভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে বহুকাল হইতে কর্পোরেশনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন। পদস্থ কর্ম্মচারিদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহকর্ম্মী অথবা সহকারী ছিলেন, এখনও আছেন; অধিকন্তু প্রায় সকলেই সুপরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে ও এমন অবস্থায় রিসেপসানের প্রস্তাব যেন, বাস্তবিকই কেমন-কেমন! কিন্তু মেয়র যখন বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন তখন তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করাই সুসঙ্গত। প্রস্তাব কাহার ভাল লাগিল, কাহার লাগিল না; কে কি বলিল, না বলিল, ইহা নিতান্তই অবান্তর।

এইখানে একটি মজার গল্প বলি। গল্পটি আমি সুভাষবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে, সুতরাং গল্প হইলেও গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত "ফরওয়ার্ড" পত্রের তখন ভারি বোল্ বোলাও। সুভাষচন্দ্র বসু "ফরওয়ার্ড"এর কর্ম্মাধ্যক্ষ। কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত একটা লেন-দেনের সম্পর্ক "ফরওয়ার্ড" পত্রের ছিল—সকল সংবাদপত্রেরই থাকে। কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যে কর্ম্মচারীটি 'মাল' সরবরাহ করিত, সেই ব্যক্তি কিছু 'উপরি' আদায় করিত, সকল ক্ষেত্রেই তাহার বাঁধা বন্দোবস্ত। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, সংবাদ সম্পর্কে সংবাদপত্রের সম্পাদক যেমন সর্ব্বনিয়ন্তা, তাগিদ খাইতেও তিনি, লোককে চতুর্বর্গ—খুশী করিতেও তিনি, "ঐ যাঃ। ও "তাইত!" 'হারাইয়া

ফেলিতে'ও তিনি। পয়সা কড়ির ব্যাপারে তেমনই ম্যানেজারই 'শেষ কথা।' কর্ম্মচারীটি "ফরওয়ার্ড" পত্রের ম্যানেজারের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য 'উপরি' আদায় করিত। সে-কি ছাই কল্পনাতেও ভাবিতে পারিয়াছিল যে খবরের কাগজের আপিস হইতে ঐ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছোকরা অচিরকালমধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনেরই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া বসিবে। তাহার চিরাচরিত 'ফেল কড়ি মাখ তেল' নীতির প্রয়োগে "ফরওয়ার্ডের" ম্যানেজারকে, কোনও সময়ে বোধকরি, একটু বেশী মাত্রায় উত্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ছিনে জোঁকের মত, জলৌকা জালার আকার ধারণ না করা পর্য্যন্ত শোষণের বিরাম ছিল না। সুভাষবাবু যখন তক্ত তাউসে (চীফ একৃজিকিউটিভ অফিসার) বসিয়াছেন, তখন একদিন কার্য্যব্যপদেশে নিরীহ জলৌকার প্রবেশ। চীফের ঘরে তখন অন্যান্য কর্ম্মচারীও ছিলেন। চীফ সকলকে একে একে 'ছুটী' দিয়া, সর্ব্বশেষে সেই ব্যক্তির ফাইল ধরিলেন। ফাইল ত ছাই-পাঁশ! চীফ মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতেই তাহার অন্তরাত্মা খাবি খাইতে সুরু করিয়াছিল। কোন্ কেশবিরল অশুভদর্শন ব্যক্তির মুখ দেখিয়া প্রভাত হইয়াছিল, তাহারই হিসাব নিরাকরণে সে যখন আকাশ পাতাল চিন্তামগ্ন, চীফ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি...এই নহে? রক্তমোক্ষণকারী জলৌকা মুহূর্ত্তে সিক্ত-মার্জ্জার; সবিনয়ে নিবেদন করিল, তাহাই বটে! পিতামাতা ঐ নামই রাখিয়াছেন। প্রশ্ন হইল, আমি যখন "ফরওয়ার্ডে" ছিলুম, আমার কাছে আপনি প্রায়ই যেতেন, মনে পড়ে কি? কণ্ঠতালু তখন চৈত্র বৈশাখের বাঁকুড়া জেলার ধান্যক্ষেত্র; অন্ত্রমধ্যস্থ প্লীহা লিভার ফুটিফাটার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আক্কেল নামক বস্তুটি (যদি থাকিয়া থাকে) বন্দুকের আওয়াজ করিবার উপক্রম করিতেছে; অজ্ঞাত অদৃশ্য স্থানে বসিয়া টায়ফয়েডের রোগীর মত বাসুকী মাথা চালিতেছে; পদতলে ধরিত্রী টলমল—টলমল করিতেছে। এখনই এই মুহূর্ত্তে, ঐ কলমের একটি টানে চাকুরী জীবনের অন্তই "শেষ রজনী" হইতে পারে—চাকুরীসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর মানসিক অবস্থা যে লোক না বুঝিতে পারে তাহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা, বাঙ্গালী জীবনই ব্যর্থ। বাঙ্গালী চীফও তাহা না বুঝিবেন কেন? বলিলেন, যা করেছেন—করেছেন; আর করবেন না; মাইনেতেই সন্তুষ্ট থাকবেন, 'উপরি'র সন্ধান করলে চাকরী থাকবে না। লোকটির নাকি স্বস্থানে ফিরিয়া 'পতন মূর্চ্ছা' হইয়াছিল। তাহার পর একমাস সে জ্বরে ভুগিয়াছিল। জ্বরের মধ্যে কেবল ভুল বকিত; বলিত, ইস্! কে জানে যে সেই এই! 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশ "আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" ভাবিয়া

ভাবিয়া সারা হইয়াছিল; এই লোকটিও "এই সেই, সেই এই" রবে বাড়ীর লোককে দুশ্চিন্তিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কর্পোরেশনের চীফ, জে-সি-মুখার্জ্জি মনে মনে যতই হাস্য করিতে থাকুন, (অবশ্য হাস্য করিয়াছিলেন কি না তাহা আমি দেখিতে যাই নাই; তিনিও আমাকে সাক্ষী রাখিয়া দন্তরুচিকৌমুদী করেন নাই) মেয়রের বাসনা চরিতার্থ করিতে বিলম্ব করিলেন না। কবে, কোথায় ও কোন্ সময়ে রিসেপসান্ হইবে এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী মেয়রের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবেন, কে আগে কে বা পরে, তাহার তালিকা প্রস্তুত হইতে লাগিল। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী—শুধু কর্ম্মচারী কেন, কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোকই বেশ সচকিত হইয়া উঠিল। একটা মজা উপভোগ করিবার উপকরণ জুটিয়া গিয়াছে বলিয়া আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। নূতন লাট সাহেব আসিলে রিসেপসান্ হয়, তাহারা জানে; লাট সাহেবরা জেলায় গেলে রিসেপসান হয় ইহাও তাহারা শুনিয়াছে। কিন্তু মেয়রের রিসেপসান, অভিনব বটে! যাহাই হৌক, রিসেপসান বেশ জাঁকজমকের সহিত—হইয়া গেল। চীফ একজিকিউটিভ অফিসার পদস্থ কর্ম্মচারিদের একে একে মেয়রের সহিত করমর্দ্দন করাইয়া দিলেন। "পরিচিত করাইয়া" দিলেন—এই কথাগুলি আমি ইচ্ছা করিয়াই লিখিলাম না; লিখিলে মিথ্যা বলা হইত; কারণ মেয়রও সকলের সুপরিচিত; কর্ম্মচারীও প্রায় প্রত্যেকেই মেয়রের পরিচিত।

যে কথাটি বলিবার জন্য এতখানি ভূমিকা করিলাম এবং প্রবন্ধসূচনাতে যে কথা বলিয়াছি, এখন সেই কথায় ফিরিয়া আসিতে হয়। জাঁকজমকের প্রতি সুভাষচন্দ্রের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল; আমাদের গোলোকবাসিরা বলিয়াছে, (পূর্ব্ব অঙ্কে আপনারা তাহা পাঠ করিয়াছেন।) উত্তর বঙ্গের বন্যাত্রাণ শিবিরের পক্ষে একান্ত অনাবশ্যক ও অশোভন (অবশ্য গোলোকের মতে!) হইলেও, রাতারাতি ক্যাম্প কমাণ্ডেন্ট, ডেপুটী কমাণ্ডেন্ট, এসিষ্টাণ্ট কমাণ্ডেন্ট, এ্যাডজুটান্ট, এটাচি কত হরেক রকমের পদবী সৃজিত হইয়া গেল। শিবির হইতে তের মাইল দূরে পোষ্টাফিসের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য মেল্ রাণার সিষ্টেম প্রবর্ত্তিত হইল। হাসির কথা বলিব আর কত? প্রকাণ্ড একটা পেটা ঘড়ি আসিয়া গেল। কি না, খাবার ঘণ্টা দিতে হইবে! ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে থালা, গ্লাস হাতে ফল্ ইন। এ কি স্কুল, না কলেজ, না পুলিশের ফাঁড়ী যে প্রকাণ্ড ব্ল্যাক বোর্ড আমদানী করিবার দরকার হইয়া পড়িল? ক্যাম্প কমাণ্ডারের ক্যাম্পের দেওয়ালে ব্ল্যাক বোর্ড বিলম্বিত—সকালে নোটিশ, বিকালে বিজ্ঞাপন, সন্ধ্যায় ইস্তাহার,

নিশীথে জরুরি বিজ্ঞপ্তি! বিবাহ যেমন-তেমন হোক না কেন, চার পায়ে আলতার বহর দেখে কে?

গোলোকের লোকেরা যাহাই বলুক না কেন, শৃঙ্খলা-সুবিন্যস্ত শিবির পরিচালনার ভিতর হইতে ঘষা কাচের ফানুসে আবৃত আলোকের রশ্মির মত যে চাকচিক্য ও জাঁকজমক বিকীর্ণ হইতেছিল, নিতান্ত অন্ধ ব্যতিরেকে কাহারও চক্ষু এড়াইতে পারে না। বলা বাহুল্য সমস্তই সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা।

হইলই বা বন্যাত্রাণ শিবির! দুঃস্থের সাহায্য করিতে আসিয়া দুঃস্থ সাজিবার প্রয়োজন আছে কি? যাহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছে তাহাদিগের দৈন্যদশা ও হা-ভাতে হা-ঘরে-রূপ প্রার্থীর মনে তাহাদের উপর সম্ভ্রম বাড়াইতে পারে না। দুঃখীর ঘর-করণার পানে দুঃখী খুব ভরসাপূর্ণ নয়নে চাহিতে পারে না। শিবির সম্ভ্রম ও মর্য্যাদাসম্পন্ন হইলে তবে না আর্ত্ত, আতুর ও দুঃস্থ ভরসা করিবে; প্রত্যাশা করিতে পারিবে; মনে বল পাইবে! দুঃখীর ঘরকন্না করিলে চলিবে না, দাতার শিবিরকে সমৃদ্ধ শিবির করিতেই হইবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে। প্রতিপক্ষ প্রবল, প্রভূত পরাক্রমশালী, ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল সহস্রগুণ অধিক। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র বিরাজমান। জলে তাহার জাহাজ, সবমেরিণ, টর্পিডো, মাইন; স্থলে ট্যাঙ্ক, গান, কামান; বিমানে তাহার বম্বার, বিমান। তত্তুলনায় আজাদ হিন্দ ফৌজ অতীব নগণ্য। অস্ত্র অপ্রতুল, স্বেচ্ছাদত্ত দানের উপরে গঠিত ধনবল! কোথায় গান, কোথায় ট্যাঙ্ক, কোথায় বিমান! কোথায় কি!

জাপানীর আছে—সবই আছে; কিন্তু তাহাতে ইহাদের কি! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনেক টাকা, তাহাতে কাহার কি! জাপান যদি বুঝিত এই পাপিষ্ঠদের সহায়তায় ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশকে খেদাইয়া খৈঁদুমণিদের দিল্লীর দরবার হইবে তাহা হইলে দুষ্প্রাপ্যও সুপ্রাপ্য হইত; কিন্তু সুভাষ বোসের হাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা দেখিয়াই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে; জাপানী হাত গুটাইয়াছে। ফসলের আশা থাকিলে তবে না দাদনী দাদন দেয়। আজাদীর কিছু নাই, তবু সব আছে। কেননা তাহারা জন্মভূমির শৃঙ্খল মোচনের ব্রত ধারণ করিয়াছে। চড়া সুরে বাঁধা অন্তরের সেতার। ভিক্ষার গান গাহিবে না; মিনতির সুর ধ্বনিবে না; যাচ্ঞার বাজনা বাজিবে না।

সুভাষ বলিয়াছিলেন, তোমরা দেহের শোণিত দাও, আমি ভারতের স্বাধীনতা দিব। তাহারা তাহাতেই সম্মত হইয়াছে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য

তাহাদের শোনিতের প্রয়োজন আছে; নেতাজী বলিয়াছেন, শোণিত দিতে হইবে; তাহারা শোণিত দিতে চলিয়াছে, এই মাত্র। শোণিত দানের পর স্বাধীনতা আসিল কিম্বা আসিল না তাহা তাহারা দেখিতে আসিবে না; তাহারা তাহা জানিতেও চাহে না। নেতাজী বলিয়াছেন, স্বাধীনতা আসিবে, তাহারা স্থির বিশ্বাসে বুঝিয়াছে, স্বাধীনতা আসিবে। স্বাধীনতা কে ভোগ করিবে, কে করিবে না, সে সমস্যা তাহাদের নহে। তাহারা জন্মভূমির—মাতৃভূমির বন্ধন মোচন করিতে উদ্যত; পারা না পারার প্রশ্নও তাহাদের নহে; তাহারা জানিয়াছে শোনিত মূল্যে স্বাধীনতা ক্রয় করিতে হইবে; তাহারা মূল্য দিতে চলিয়াছে। অন্য চিন্তা তাহাদের নাই; অন্য চিন্তা তাহারা করে নাই।

কিন্তু তাহাদের নেতাজী অন্য চিন্তাও করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়েই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইউরোপ ও এসিয়ায় অক্ষশক্তি-অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যতগুলি রাজ্য ও রাষ্ট্র ছিল, নিজ রাষ্ট্রকে তাহাদের সমতুল্য বিজ্ঞাপিত করিয়া রাষ্ট্রযোগ্য মর্য্যাদা দাবী করিলেন। দস্যু, লুঠেরা, ঠেঙ্গাড়ের দল ভারতবর্ষ জয় করিতে চলিয়াছে, সুভাষচন্দ্রের রাজ-অন্তঃকরণ এই দীনতা, ও হীনতা, এই মর্য্যাদাশূন্য অপবাদ সহিতে পারিল না। আমি মনে করি, এই সময়ে সুভাষের সহিত সুভাষের একটা নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল। যে সুভাষ তাহার ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অধিনায়করূপে ভারতবর্ষকে বিদেশীর কবল হইতে উদ্ধার করিতে চলিয়াছে, আর যে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের অতীত ও ভবিষ্যতের মর্য্যাদার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি, এতদুভয়ে বিরোধ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়াই আমি মনে করি। ইতিহাস শিবাজীকে লুঠেরা, ঠেঙ্গাড়ে ও দস্যু নামে অভিহিত করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। সুভাষচন্দ্রের অভ্যন্তরে যে রাজর্ষি-সুভাষের বসতি ছিল, বিদ্রোহে—অন্তর্বিরোধে—তাহারই জয় হইল। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিল। জার্ম্মানী, জাপান ও ইতালী স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রকে স্বীকার করিল; সমান মর্য্যাদা দিল। সুভাষের বাসনা পূর্ণ হইল।

গান্ধীজী একদিন ভারতবাসীকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান দিয়া বলিয়াছেন, একবৎসরের মধ্যে স্বাধীনতা আনিয়া দিবেন। ভারতবাসী সে কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছিল; অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতা আসে নাই।

গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, তিন শত পঞ্চাশ কোটী নরনারী যদি একান্ত মনে স্বাধীনতার সাধনা করে, তিন শত পঁয়ষট্টি দিন চরকা কাটে, তাহা হইলে স্বাধীনতা না আসিয়া পারে না।

চরকা কাটার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ; তবে তিন শত পঞ্চাশ কোটী নর-নারী তিন শত পঞ্চাশ দিন ও রাত্রি চরকা কাটিয়াছিল কি-না তাহাতে অবশ্যই সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ ছিল।

গান্ধীজী যখন ঐ কথা বলিয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষ বিলাতের ল্যাঙ্কেশায়ারের উপরে ভারতবাসীর লজ্জানিবারণ-বস্ত্রের জন্য নির্ভর করিত। ল্যাঙ্কেশায়ার তথা ইংলণ্ড মূলতঃ ভারতবর্ষে বস্ত্র ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া তাহার দেশের ধন বৃদ্ধি করিতেছিল। সেই অন্নে হাত পড়িলে, বৃটিশ যে ভারতবর্ষের সহিত বুঝা পড়া করিতে উদ্যত হইবে এবং ভারতবাসীও স্বাধীনতামূল্যেই বুঝা পড়া করিবে, অন্য কোন সর্ত্তেই সে সম্মত হইবে না। গান্ধীজী তাহা স্থির জানিতেন। কায়মনে স্বদেশী ব্রত গ্রহণের ও সেই ছিল উদ্দেশ্য।

গান্ধীজীর বাসনা পূর্ণ হয় নাই, ইহাও যেমন সর্ব্বজনবিদিত, কেন হয় নাই তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। গান্ধীজী অতঃপর অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই অমোঘ ও মহাস্ত্র সার্থক অথবা ব্যর্থ তাহা প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বেই চৌরী-চারার ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় এবং গান্ধীজী অহিংসার পরিবর্ত্তে হিংসার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন।

ভারতবর্ষের দুইজন বিশিষ্ট জন নেতার মনস্তাপের অবধি ছিল না। পণ্ডিত জওহরলাল তখন কারাগারে। কারাগারের ভিতরেই 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত'। পণ্ডিতজীর করিবার কিছু ছিল না ; কোন কথা বলিবারও উপায় ছিল না। শৃঙ্খলাবদ্ধ শার্দ্দূল পিঞ্জর মধ্যে স্বীয় লাঙ্গুল দংশন করিয়াই তাহার চিত্তজ্বালার অবসান করিতে বাধ্য হয়। পণ্ডিতজীর আত্মচরিতে সে দৃশ্য কি মর্ম্মন্তুদ্! কি করুণ! এই সময়কার মর্ম্মভেদী হতাশার চিত্র পাঠকচিত্ত অবসন্ন করিয়া দেয়।

সুভাষচন্দ্র বসুও অত্যন্ত তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিন শত পঞ্চাশ কোটী নর নারীর মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়জন লোক চৌরী চারায় একটা পুলিশ চৌকী পুড়াইয়া দিল ও সেই আগুনে পুলিশ পুড়িয়া মরিল ইহাতেই ভারতব্যাপী আন্দোলনের অবসান ঘটাইতে হইবে, ইহার ঔচিত্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র সন্দেহ প্রকাশ করিতে বিরত ছিলেন না। সুভাষচন্দ্র চিরদিনই বিরামবিহীন সংগ্রামের পক্ষপাতী। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরাম বা আপোষের সুযোগ তিনি স্বীকার করিতেন না। গান্ধীজীর সহিত এই মতান্তর তাঁহার চিরকালই ছিল এবং

আমরা বরাবর দেখিয়াছি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মত তিনি বর্জ্জন করেন নাই এবং আপোষ মীমাংসা করিতেও রাজী হন নাই।

১৯৩৯ সালের মতবিরোধের মূলে এই মতান্তরই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। গান্ধীজীর পবিত্র চরিত্র, তাঁহার মহৎ আত্মা, তাঁহার অমানুষিক ত্যাগ, সর্ব্বোপরি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে দীর্ঘকালব্যাপী এক নায়কত্ব কংগ্রেসী দ্বন্দ্বে সুভাষকে পরাজিত করিয়াছিল বটে; কিন্তু সুভাষের মতের পরিবর্ত্তন করাইতে পারে নাই। পর বৎসর ১৯৩০ সালে রামগড়ে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন কংগ্রেসের আপোষ মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র রামগড়ের সন্নিকটে আপোষ বিরোধী সম্মিলন আহূত করিয়াছিলেন।

মালয়ে, সিঙ্গাপুরে অথবা ব্রহ্মের যুদ্ধে বৃটিশ-আমেরিকান সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জয় লাভের আশা অত্যন্ত কম জানিয়াও সুভাষচন্দ্র সংগ্রামে বিরত হয়েন নাই। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও তাঁহার ভারতীয় বাহিনীকে নিরস্ত করেন নাই; নিজেও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে চাহেন নাই। তাঁহার পক্ষে "চৌরী চারা" কল্পনাতীত; সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

এই সময়কার নেতাজীর মনের কথা বুঝিতে হইলে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠাতা-সর্ব্বাধিনায়কের মর্ম্মবাণী [অর্ডার অফ দি ডে] স্মরণ করিতে হয়। এপ্রিল ১৯৪৫ সালে সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাক্ষরিত এই ঘোষণাপত্র দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল :

"আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্ম্মীগণ!

বন্ধুগণ, অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আজ ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতেছি। এই সেই ব্রহ্মদেশ, যেখানে ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে অনেকগুলি শৌর্য্যব্যঞ্জক গৌরবময় যুদ্ধ তোমরা করিয়াছ এবং আজও করিতেছ। আমাদিগকে ইম্ফল হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছে; এই ব্রহ্মদেশ হইতেও আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। কিন্তু তাহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। স্বাধীনতার দূর ও বন্ধুর পথে জয়ও আছে, পরাজয়ও আছে। আমরা এতদিন বিজয় গর্ব্বে অগ্রসর হইয়াছি; আজ যদি ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াই থাকে, তাহাতে হতাশ হইব কেন? আমি চিরদিন আশাবাদী। পরাজয় বরণ করা আমার ধাতে সহে না; কোনদিনই আমি পরাজয় বরণ করি নাই। দুর্দ্দিন আসিয়াছে হইতে পারে কিন্তু আবার সুদিন আসিবে। নিশান্তে সূর্য্যোদয় অবশ্যম্ভাবী। আজ হটিতেছি,

কাল অগ্রসর না হইব কেন? ইম্ফলের সমতল ক্ষেত্রে, আরাকানের দুর্ভেদ্য অরণ্যে, ব্রহ্মদেশের তৈলখনি সন্নিকটের ভীষণ সংগ্রামে তোমরা বীরত্বের গৌরব নিশান উড্ডীন করিয়াছ; ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, ভাই সব, বন্ধুগণ, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাহা চিরোজ্জ্বল বর্ণে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ইনকুইলাব জিন্দাবাদ

আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ

"জয় হিন্দ"

সুভাষচন্দ্র বসু

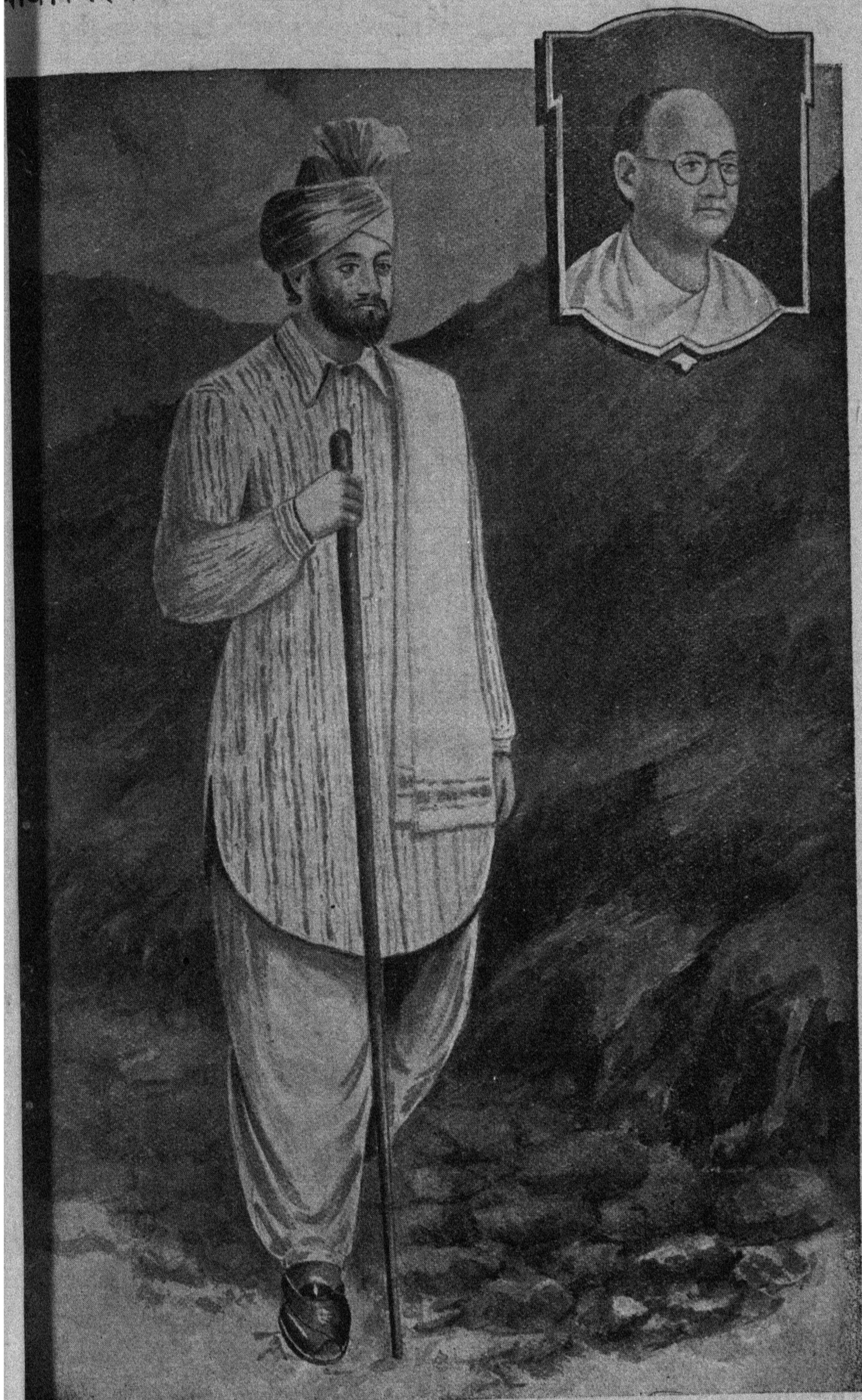
আজাদ হিন্দ ফৌজ সর্ব্বাধিনায়ক।

আশা পূর্ণ হয় নাই: পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। বৃটিশ ও আমেরিকান, পৃথিবীর এই দুই পরাক্রমশালী দেশের সম্মিলিত বিরাট বাহিনী আজাদ হিন্দ সরকার ধ্বংস ও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পরাভূত করে।

হাজার হাজার আজাদী ধৃত হইতে থাকে। কতক ভারতবর্ষে আনীত হয়; কতক সিঙ্গাপুর-মালয়-ব্রহ্মেই আবদ্ধ থাকে।

ভারতবর্ষে এই আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনীর কথা একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। বৃটিশের প্রচার-যন্ত্র নীরব ও নিশ্চেষ্ট ছিল না বটে; তবে ভারতবর্ষে চিরাচরিত পদ্ধতিতে মিথ্যা সংবাদেরই পরিবেশন চলিতেছিল। অন্য কোন সূত্রে প্রকৃত সংবাদ, সত্য তথ্য জানিবার আমাদের কোনই উপায় ছিল না। বৃটিশ দয়া পরবশ ও আমাদের হিতার্থ যতটুকু সংবাদ দিতেন আমাদের তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। কূট-কৌশলী বৃটিশের প্রচার মহিমায় আমরা জানিয়াছিলাম, সুভাষ বোস জাপানী দস্যুদলের সর্দ্দাররূপে ভারতবর্ষ প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। সুভাষের ইচ্ছা বৃটিশকে বিতাড়িত করিয়া ভারতে জাপানীর প্রতিষ্ঠা। ইহাতে সুভাষের লাভ কি? এ প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গিয়াছিল। সুভাষ জাপানীদের আনিতেছে, সুতরাং জাপানী রাজ্যে সুভাষের প্রতাপ হইবে, অসামান্য। প্রভুত্ব-বিলাসী সুভাষের ইহাই একমাত্র কাম্য।

কূটবুদ্ধিতে বৃটিশ বিশ্বে অপরাজেয়: কূটনীতিতে সে বিশ্ববিজয়ী। বৃটিশের কূটবুদ্ধির নিকট আমেরিকা নাবালক; রাশিয়া শিশু; তা অন্যে পরে কা কথা! বিগত বিশ্বযুদ্ধে তাহা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। পরের স্কন্ধে বন্দুক রাখিয়া যুদ্ধে জিতিতে বৃটিশ আজও বিশ্বে প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন। কূটনৈতিক



"আর কতদূরে নিয়ে যাবে"—
কাবুলের পথে।

যুদ্ধে প্রচার-বল মহাবল বলিয়া স্বীকৃত। যে বৃটিশকে ভারতবর্ষের একটি প্রাণীও বিশ্বাস করে না; বৃটিশের উচ্ছেদ সর্ব্বতোভাবে কাম্য হইলেও যুদ্ধ কালীন কূট-প্রচারের ফলে এমন ধারণার সৃষ্টি এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল যে যে-লোকের মুখ দিয়া ভারতবর্ষ কথা কহে, যে লোকের মুখ দিয়া ভারতের অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত নয়, ভারতবর্ষের সেই সর্বজনবরেণ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও বলিতে বাধ্য হইলেন যে যদি সুভাষ বোসের সেই দুর্ম্মতিই হইয়া থাকে, সে-যদি জাপানী বাহিনী লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণই করে, তাহা হইলে আমিই সর্ব্বাগ্রে অস্ত্রমুখে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব; তাহাকে অস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান দিব।

সত্য কথা বলিতে বাধা নাই, পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে ভারতবর্ষের বহু নরনারী—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। অনেকে আবার এই ছলে সেই ১৯৩৯ সালের কংগ্রেস বনাম ফরওয়ার্ড ব্লকের তিক্ত ইতিবৃত্তের পঙ্কোদ্ধারে যত্নশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তারপর যেদিন মেঘ ঝড় জল কটিয়া গেল, কুয়াশা কাটিয়া রবিকরজালে ধরিত্রী আলোকিত হইল, আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইতিহাস জানা গেল, সেদিন সেই জওহরলাল নেহেরুই সর্ব্বপ্রথম সুভাষের কীর্ত্তির গলে সুরভিত পুষ্পমাল্য দান করিয়া জয়হিন্দ ধ্বনিতে ভারতবর্ষ প্রকম্পিত করিলেন।

আই-এন্‌-এ'র কোর্ট মার্শাল যে ভারতবর্ষে নবীন জীবনের নবীন প্রেরণা দান করিয়া নবোৎসাহে নবোদ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যজ্ঞকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দিল, বিশাল ভারতবর্ষ একমনঃ প্রাণ হইয়া দিল্লীর লালকেল্লার বিচারশালার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, ভারতের মান মর্য্যাদা কৃষ্টি সংস্কৃতি একদিকে আর ঐ কোর্ট মার্শাল অন্যদিকে ভাবিয়া উত্তেজনার উজান স্রোতে ভাসমান হইল, ঐ কোর্ট মার্শালকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার রাজপথে, বোম্বাইরের জাহাজ ঘাটে, মাদ্রাজের দুর্গদ্বারে আত্মাহুতি দিতে তরুণেরা জয়যাত্রায় বাহির হইল, এ সকলের মূলে, পণ্ডিত জওহরলালের প্রচণ্ড দীপ্তি!

ভারতবর্ষের কংগ্রেস অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত; হিংসার সহিত তাহার কোনও সংস্পর্শ নাই। সুভাষের আজাদ হিন্দ বাহিনী হিংসার অগ্নিমন্ত্রের উপাসক; হিংসার দ্বারা বৃটিশের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইয়াছিল। কংগ্রেস হিংসার সমর্থন করিয়া কলঙ্কিত হইবে কিংবা হইবে না, এই তর্কের আশু অবসান ঘটাইয়া পণ্ডিত জওহরলালই আই-এন-এ কোর্ট মার্শালে আসামী সমর্থনে কংগ্রেসকে—কংগ্রেসের

বিপুল শক্তিকে নিয়োজিত করিলেন। কোর্ট মার্শালের উদ্বোধন দিবসে ভারতবর্ষ এক অভিনব দৃশ্য দর্শন করিল।

আমার পাঠিকা ও পাঠকের জানা আছে যে পণ্ডিতজী একদিন ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়াছিলেন; জীবনারম্ভে কয়েকদিন ব্যারিষ্টারী পোষাকে বিভূষিতাঙ্গ হইয়া বৃটিশের আদালতের শোভাবর্দ্ধনও করিয়াছিলেন; কিন্তু কয়েকদিন মাত্র! তারপর হইতে তিনি বৃটিশের আদালতে খুনে-ডাকাত-চোরের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; অন্য কোন রূপে আদালতে প্রবেশ করেন নাই। কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছেন, কারাদণ্ড মাথায় পাতিয়া লইয়া কারাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। এই দৃশ্যের সহিত আমাদের—ভারতবর্ষের সুপরিচয়। অকস্মাৎ, প্রায় দ্বাবিংশতি বর্ষ পরে দিল্লীর লালকেল্লায় অনুষ্ঠিত কোর্ট মার্শালের উদ্বোধন দিবসে পণ্ডিতজীকে ব্যারিষ্টারী বেশভূষায় সজ্জিত দেখিয়া নিখিল ভারতবর্ষ জয়হিন্দ ধ্বনি করিয়া বিপুল হর্ষ প্রকাশ করিল।

পণ্ডিতজীকে মামলা পরিচালনা করিতে হয় নাই। ভারতের মনোবিজ্ঞানে প্রভাব দান করিয়াই তিনি কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছিলেন। কোর্ট মার্শাল ধন্য হইয়াছিল।

আজ ভুলাভাই দেশাইয়ের কথা স্বতঃই মনে পড়িতেছে। অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি ভুলাভাই, উদ্ধত রণজয়ীর পাশববলদৃপ্ত সামরিক আদালতে বিজিত, নিপীড়িত ও নির্য্যাতীত মানবের সহজাত অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে প্রতিভা, যে মানবিকতা ও যে বাগ্মিতার প্রখর রবিরশ্মি বিকীরণ করিয়া গিয়াছেন, সুসভ্য পৃথিবীর ইতিহাসেও তাহা অপূর্ব্ব ও অভিনব। শৃঙ্খলিত সারমেয়ের শৃঙ্খল মোচনের অধিকার আছে; রজ্জুবদ্ধ গো, অশ্ব-মহিষেরও সে অধিকার স্বীকৃত; পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গমও মুক্তি কামনায় পিঞ্জর ভেদ- করিবার অধিকারী; সর্পেরও ফণা তুলিবার অবাধ অধিকার আছে; কিন্তু, অধিকার নাই কেবল পরাধীন ও পরপদানত মানবের। সৃষ্টির আদি হইতে সৃষ্টির অন্তকাল পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি-সাধনার নাম, বিদ্রোহ! পরাধীন মানব সভ্যজগতে করীভুক্ত কপিত্থবৎ থাকিতে বাধ্য। তাই পরাধীন মানবজাতির মুক্তি প্রচেষ্টা সভ্যতার তুলাদণ্ডে অমার্জ্জনীয় মহাপরাধ বলিয়া বিবেচিত। ভুলাভাইয়ের স্মৃতি অক্ষয় হৌক। বিশ্ববিজয়ী বৃটিশের সামরিক আদালতে তিনি, পাণ্ডিত্য প্রভাবে, ন্যায় ও যুক্তিতর্কের প্রতাপে প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন যে, জড়জগতে যাহাই হৌক না কেন, জীবজগতে পরাধীনতার নাগপাশ মোচনের চেষ্টা জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, মহান ব্রত, চরম ও পরম সাধনা। যে জীব

সে ধর্ম্মাচরণে বিরত, মহান ব্রত উদযাপনে পরাঙ্মুখ, সাধনায় উদাসীন, জীবজগতের সে ঘৃণ্য। পক্ষান্তরে, ব্রতধারী যে মানব ধর্ম্মসাধনা করিয়াছে, সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ যাহাই কেন হোক না, জীবজগতে সে বরেণ্য। মানবের শ্রেষ্ঠ ব্রত পালনে যদি জীবনাবসানও ঘটে, অনন্ত পুণ্য ও অক্ষয় স্বর্গ তাহার আয়ত্তাধীন। পৃথিবীর বিজিত ও পরাধীন মানুষ ভুলাভাই দেশাইয়ের কথা শুনিয়া ধন্য হইয়াছে। সামরিক আদালত দণ্ড সম্বরণ করিয়াছে ; দণ্ডপ্রদাতা অপরাধীত্রয়কে মুক্তিদান করিয়াছেন। স্বর্গে যগুপি দেবতারা থাকেন, তাঁহারা ভুলাভাইয়ের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন। তাই দেখি, সামরিক আদালতের বিচার শেষে স্বর্গের স্বর্ণমণ্ডিত পুষ্পকরথ মহারথী ভুলাভাইকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ধন্য ভুলাভাই, ধন্য তুমি! হোক্ নাম ভুলাভাই, তবু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, এই ভাইটিকে ভারতবর্ষ ভুলিবে না।

এই স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রই ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে বৃটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এক রাষ্ট্র অপর এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে ; কাহারও পক্ষে হীনতা বা মর্য্যাদাহানির কথা উঠিতে পারে না। দাবাবোড়ের খেলায় রাজাকে রাজাই মারিতে পারে ; মন্ত্রীকে মারিতে মন্ত্রীর দরকার হয় ; হাতীকে হাতী দিয়া, ঘোড়াকে ঘোড়া দিয়া, নৌকাকে নৌকা দিয়া টিপিতে হয়—নহিলে খেলার নিয়ম ভঙ্গ হইয়া পড়ে, সম্মানের হানি হয়।

রাষ্ট্রের সঙ্গে জাঁকজমক ও চাকচিক্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন। সংসারবিরাগী, সর্ব্বত্যাগী কংগ্রেসী হইলেও সুভাষের মধ্যে যে 'সুপ্ত' রাজসিকতা, তাহাও এই সময়ে পরিপূর্ণ গৌরবে জাগরিত হইয়া উঠিল। সব রাষ্ট্রই বহু বিভাগে বিভক্ত হয়। রাজস্ব বিভাগ, শাসন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, যুদ্ধ বিভাগ। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টেরও বহু বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে মন্ত্রী নিযুক্ত। মন্ত্রীরা সকলেই বিশ্বাসী ও সুযোগ্য। দুঃখীর ঘরকন্না নহে—রাজর্ষির রাষ্ট্রতন্ত্র!

সুভাষ গঠিত রাষ্ট্রতন্ত্রে, নারাও পুরুষের সহিত সম মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঝাঁন্সীর রাণী বাহিনীর নেত্রী লক্ষ্মী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম পরিচালিকা। নব্য-ভারতের স্রষ্টা, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রে নারীর দাবী অস্বীকার করিলে, ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মর্য্যাদা যেমন ক্ষুণ্ণ হইত, আজিকার পৃথিবীকেও তেমনই অবজ্ঞা করা হইত। সমগ্র এসিয়ায় যিনি জাগ্রত নব-জীবনের, নবীন ও দূরাগত জগতের গান শুনাইয়াছেন, তাঁহার রচিত রাষ্ট্রতন্ত্র পক্ষপাতমূলক বা একদেশদর্শী হইতে পারে না।

আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে নারীর অধিকার গান্ধীজি কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম স্বীকৃত হইয়াছে, আমরা সকলেই তাহা জানি। গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত এক একটা আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাতে ভারতবর্ষের গৃহ প্রাঙ্গন গিয়াছে, পুরুষের সঙ্গে নারীও একে একে দুইয়ে দুইয়ে দলে দলে ভাসিয়া রাজনীতির আবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নারী পুরুষের সঙ্গে সমান দুঃখ, সমান কষ্ট, সমান নির্য্যাতন, সমান নিপীড়ন বরণ করিয়া পুরুষের সহিত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজপুরুষ ও আইন শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণকারীগণ কোমলাঙ্গীদের জন্য কোমল ও মৃদু শাস্তির ব্যবস্থা করিলে, নারী দৃপ্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভারতে নারী পুরুষের ছায়া, পুরুষের আশ্রিত, পুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিত, অবলা, অসহায়া, দুর্ব্বলা নারী, পুরুষের দয়া দাক্ষিণ্যের প্রার্থিনী নারী, যুগ যুগব্যাপী এই যে বদ্ধমূল ধারণা, নারী স্বয়ং তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। শুধু কি অস্বীকার? পুরুষ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে, শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে নারীকে তাহার দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে সহযাত্রী করিয়া লইয়াছে। সেই দিন হইতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে পুরুষের সহিত নারীও যুদ্ধে রত হইয়াছেন; যোদ্ধার ভাগ্যবিপর্য্যয় নারী হাসিমুখে শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

রাজনীতিতে নারীর নব-চেতনার উদ্ভবের মূলে গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বান যে অসম্ভব সম্ভব করিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ভগীরথ যেমন করতালি দিয়া স্বর্গমন্দাকিনী ত্রিপথগা জাহ্নবীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, গান্ধীজী তেমনই অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে গৃহভ্যন্তরে আবদ্ধ নারীকে বৃহত্তর জগতে মুক্ত আকাশ তলে, রাজনৈতিক রণস্থলে আনয়ন করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, তাঁহার পথ সুগম ও সহজ করিয়া রাখিয়াছিলেন, দুইজন মহামানব। আমি তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিয়া পারি না। বঙ্গ সাহিত্যাকাশের ঊষাকালে পূর্ব্বাকাশ যখন পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিতেছিল তখনই—সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—যাঁহার প্রতিভার দীপ্তিতে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের দ্যুতিতে জগৎ আলোকিত—প্রভাষিত—প্রভান্বিত করিয়াছিল, বঙ্গ সাহিত্যের স্রষ্টা, বঙ্গে জাতীয়তার প্রধান পুরোহিত, বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট নারী চরিত্রের পানে আমার পাঠকপাঠিকা-সমাজের মনোযোগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। যোদ্ধা সীতারামের নন্দা ও রমা-এই দুই মণি মানিক্য লাভেও বঙ্কিমচন্দ্র তুষ্ট হইতে পারেন নাই। স্ত্রীর সন্ধানে বাহির হইতে হইয়াছিল। নন্দা ও রমা সীতারাম গড়িতে পারিত না।

বার ভুঁইয়ার সেরা ভুঁইয়া সীতারামের জন্য শ্রী-র প্রয়োজন। সহস্র জনমর্দ্দের মাঝে বৃক্ষারোহণ করিয়া অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছা ঘুরাইয়া "শত্রু মার" ধ্বনি করিতে "শ্রী"ই পারিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র মহেন্দ্রের কল্যাণী লিখিয়াই তৃপ্ত হইলেন না ; তাঁহাকে পোড়ারমুখী শান্তিকে আঁকিতে হইল। জীবানন্দ সিংহ, শান্তিদেবী সিংহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধ পুরুষ, সিদ্ধ সাধক। সাধনার চড়া সুর, নরম সুর সবই জানিতেন। পাছে শ্রীর, কিম্বা শান্তির সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া পুরুষ ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, মাঝামাঝি ছবিও আঁকিতে হইল। উজ্জ্বলে মধুরে, রৌদ্রে ও কারুণ্যে ভরিয়া দেবী রাণী গড়িতে হইল। নারী সংসারে স্ত্রী, খেলা ঘরে খেলার সামগ্রী আর রহিল না ; স্ত্রী শ্রদ্ধার অধিকারিণী হইলেন ; তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদায় বঞ্চিত করে কাহার সাধ্য ?

তাহার পর আসিলেন, দিগ্বিজয়ী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ বলিলেন,

"হে ভারত ! ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী !"

এই একটি ছত্রে স্বামী বিবেকানন্দ নারীজাতির জন্য মহোচ্চ আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সীতা—সৃষ্টির অন্তকাল পর্য্যন্ত মানবের শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। সাবিত্রীর ত্যাগ, তাঁহার সহিষ্ণুতা, সর্বকালে মানব মনে তাঁহার জন্য শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে। দময়ন্তীকে কে না ভালবাসে ? কে না পূজা করে ?

সুভাষচন্দ্রের জীবনে বীর সাধক বিবেকানন্দের প্রভাব খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না। মুকুরে যেমন প্রতিবিম্ব, সুভাষে তেমনই স্বামীজি প্রতিবিম্বিত। সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি কার্য্যে আমরা সেই বিপ্লবী সাধু বিবেকানন্দের বাণী প্রতিধ্বনিত হইতে শুনি।

> "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—
> আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল
> মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল
> ভারতবাসী আমার ভাই।

"তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী।

"ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল, দিনরাত বল—

"হে গৌরীনাথ হে জগদম্বে

আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা। আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

সুভাষের আজীবনের সাধনা কি ঐ মন্ত্রের উপরই অধিষ্ঠিত নহে?

হায়, কয়জন ভারতবাসী স্বামীজির মত অকুণ্ঠকণ্ঠে বলিতে পারে যে "ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত?"

সুভাষচন্দ্র পারিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র আত্মবলি দিয়া বলির মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন। সুভাষের মত "জয় মা" বলিয়া আত্মবলি দিতে কে পারিয়াছে? মা'র মুক্তির জন্য বলির প্রয়োজন, তাই সুভাষচন্দ্র জন্ম হইতেই বলির জন্য প্রস্তুত! তাই তাঁহার বলি সার্থক! মা সন্তুষ্ট! ভারতবাসী গৌরবান্বিত।

তৃতীয় অঙ্ক

খৃষ্ট অব্দ ১৭৫৭এ ভারতবর্ষের কালরাত্রির আরম্ভ। ভারতবাসী কাল-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নরপতির বিলোপ ঘটাইয়া বাঙ্গালী খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়াছিল। প্রায় দুইশত বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালী সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে; তথাপি, প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে অথবা পাপ খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মহাপাপের শাস্তিও মহাদণ্ড!

একা রাবণের পাপে স্বর্ণলঙ্কা মজিয়াছিল, ছারেখারে গিয়াছিল। বাঙ্গালীর পাপে বাঙ্গলা মরিয়াছিল, ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছিল। বাঙ্গালীর পাপে ভারতবর্ষ মজিয়াছিল। সপ্তসমুদ্রের বারি ঢালিলেও বাঙ্গালীর কলঙ্কের অবসান হইবার নহে!

একমাত্র আশার কথা, আনন্দের কথা, গর্ব্ব ও গৌরবের কথা যে বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্র সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত যদি অপূর্ণ থাকিয়া থাকে, তাহার জন্য তাঁহার সাধনা নিন্দিত হইবে না; বাঙ্গালীর পাপের ভরা, পাপের পশরা এতই ভারী, এতই গুরু যে এক মহাসাধকের সাধনায় তাহার অবসান সম্ভব নহে! তবে একথাও ঠিক যে সাধনার স্বর্ণ-মন্দির-দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, "উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর মূর্ত্তি" আজ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে।

একশত বর্ষ পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জনজাগরণের প্রাথমিক সূচনা দেখা

গিয়াছিল। ১৮৫৭ সালে জনবিক্ষোভের সূত্রপাত। বৃটিশের ভাগ্য বিপর্য্যয়েরও তখনই আরম্ভ।

তাহার পর হইতে, ভারতের অস্তমিত ভাগ্যরবি পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টায় বিরত হয় নাই। ১৮৫৭ অব্দের কাহিনী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের নামে শীতল শোনিত আজও উষ্ণ হয়। ১৯৪২ অব্দও স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিল। আমাদের সৌভাগ্য, খৃষ্টীয় অব্দ ১৯৪২কে আমরা চাক্ষুষ করিতে পারিয়াছি। ১৯৪২এ ভারতের ভিতরে ও বাহিরে যে জনযজ্ঞারম্ভ হইয়াছে, তাহার পূর্ণাহুতি কবে হইবে জানি না, আবার শতবর্ষ, ১৯৫৭ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে কি না তাহাও বলিতে পারি না; তবে যেদিনই সে-দিন হৌক না কেন, যজ্ঞান্তে, ১৭৫৭এর প্রায়শ্চত্ত যে হইবেই, স্থলে জলে অনলে অনিলে অন্তরে বাহিরে দিব্যাক্ষরে তাহা লিখিত থাকিতে দেখা যাইতেছে। ১৯৪২এর আগষ্ট মাসে ভারতের অভ্যন্তরে যে স্মরণীয় শুভক্ষণে "কুইট্ ইণ্ডিয়া" ধ্বনি ধ্বনিত হইয়াছিল, ভারত সীমান্তের পারেও সেই অজ্ঞাত অপরিচিত জনপদে, সেই দিনই কে-জানে কোন্ কুহক মন্ত্রে সেই "কুইট্ ইণ্ডিয়া" ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি ভীম গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল।

এই সাদৃশ্য, এই সামঞ্জস্য, এই ঐক্যতানবাদিত সামগান একই সময়ে বহু দূর দূরান্তে মহাসমুদ্র-ব্যবধানে সুদূর ভূখণ্ডে সম্ভব হইল কেমন করিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা আমি করিব না; কারণ, প্রয়োজনেরও অভাব বটে, বাহুল্যও বটে! আমি কেবল এই কথা বলিব যে মনুষ্যের অগোচরে বোধ করি বা অন্তরীক্ষে বসিয়া যিনি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন—বিশ্বের জড় ও জীবের ভাগ্য চিরদিন যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহারই ইঙ্গিতে ভারতের ভিতরে ও বাহিরে পরাধীনতার লৌহ-নিগড় ছিন্ন করিবার উদগ্র বাসনা একই সময়ে— একই মাহেন্দ্রক্ষণে পরাধীন ভারতবাসীকে "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল।

অসম্ভব সম্ভব নহে ত কি? ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে রাষ্ট্রীয় মহাসভার কর্ম্মপরিষদ "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্র ভুর্জ্জপত্রে লিখিয়াছিলেন। কাগজের-কলমের কালী শুষ্ক হইল-কি-হইল না, ৮ই আগষ্ট নিশান্তের পূর্ব্বেই রাষ্ট্রীয় সমিতির লোকজন পোঁটলীপুটলীসহ, মায় গান্ধীজী পর্য্যন্ত, অজ্ঞাত স্থানে চালান হইলেন। অহিংসাব্রতধারী মানুষ কয়জন, গো-চারণের গাভীদল যেমন যষ্টিহস্ত গোপবালকের অগ্রে অগ্রে নিঃশব্দে চলে, সেইরূপ চলিতে চলিতে গো-শালায়

প্রবেশ করিলেন ; ঝাঁপ বন্ধ হইয়া গেল। পৃথিবীর সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না। কথার কথায় সংযোগ ছিন্ন নহে, প্রকৃতপক্ষে সকল সংযোগই বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু "কুইট ইণ্ডিয়া"র গতি রোধ করিতে পারা গেল না ; শব্দ ব্রহ্ম—শব্দদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডের বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। কে জানিত যে শব্দও বিপ্লবের বিষবাষ্পে ভরা ছিল!—অনতিবিলম্বে বায়ুমণ্ডলও বিষাক্ত হইয়া উঠিল। আমেরিকার (আমেরিকার ত ? না, চোরের ধন বাটপাড়ে মারিল ?) এ্যাটম্ বম্ব তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই ; বিশ্বযুদ্ধের মহারথীগণ তখনও তাহার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। কিন্তু অহিংসার যজ্ঞকুণ্ডোত্থিত "কুইট্ ইণ্ডিয়া" শব্দমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষ কাঁপাইয়া দিল।

আমেরিকার এ্যাটম্ বম্ব (আবার জিজ্ঞাসা করি, এ্যাটম বম্ব আমেরিকার বটে ত ?) জাপানের মাত্র দুইটি নগরীর উপরে বর্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে সাতদিন মধ্যে ছয় বৎসরের পুরাতন ও জটিল মহাব্যাধি—বিশ্বযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। "কুইট ইণ্ডিয়া" বম্বের ইতিবৃত্ত আজও লিখিত হয় নাই। এই বম্ব কোথায় কোথায় পড়িয়াছিল তাহার বিবরণ আজও অপরিজ্ঞাত। যে বিন্দু পরিমাণ সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে বিক্রমে, ইহাকে আঁটিয়া উঠিতে বিশ্বযুদ্ধজয়ী (জয়ী ত বটেই!) বৃটিশকে নাজেহাল হইতে হইয়াছিল। ভারতের ভিতরে—বোম্বাই প্রদেশের সাতারা, বাঙ্গালার মেদিনীপুর, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া, মাদ্রাজের রাজমাহেন্দ্রী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছে। আমাদের ভারতবর্ষে ইতিহাস পূজিত হয়। এই ইতিহাসও পূজা পাইবে।

আর ভারতের বাহিরে, দক্ষিণ পূর্ব্ব-এসিয়া খণ্ডে, "কুইট ইণ্ডিয়া"র প্রতি-ধ্বনি স্থাবর জঙ্গম বিকম্পিত করিয়া দিয়াছিল। ভারত অভ্যন্তরে নিঃস্ব, নিরস্ত্র, নিঃসহায়ের নির্ঘোষ ; আর বাহিরে, অস্ত্রের ঝন্ঝনাৎকার। শ্রাদ্ধ বাড়ীর অন্তঃপুরাঙ্গনে কীর্ত্তনের খোল করতালের ঝঙ্কার ; আর বহিরঙ্গনে অগ্রদানী রেয়োভাটের কলহ-কোলাহল।

১৯৪২ ও পরবর্ত্তীকালের ঘটনাবলীকে বিদ্রোহ ও বিপ্লব আখ্যায় অভিহিত করিলেও তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। ১৯৪২এর পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে—সেদিনের খুব বেশী বিলম্ব আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না—তখন দেখা যাইবে যে এই সময়কার বিপ্লব বা বিদ্রোহ যাঁহারা ঘটাইয়াছিলেন, আর্ট ফর আর্টস্ সেক্, বিদ্রোহের জন্যই বিদ্রোহ, বিপ্লবের খাতিরেই বিপ্লব, ভাঙ্গার উদ্দেশ্যেই ভাঙ্গা, তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল

না। ভারত ভিতরে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, ডু অর ডাই—করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে; আর, ভারতের বাহিরে যাঁহারা কুইট ইণ্ডিয়া সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের যিনি নেতা, তাঁহার বাণী ছিল, তোমরা শোণিত দাও, আমি স্বাধীনতা দিব। দেখা যাইতেছে, কথা দু'টির মধ্যেও অপূর্ব্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে। করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের অর্থ বিশ্লেষণ করিলে স্বতঃই অনুমিত হয় একটা কিছু করিবার বা গড়িবার ইচ্ছা ছিল। কি করিবার বা কি গড়িবার বাসনা ছিল, তাহা ব্যক্ত হইতে পারে নাই। কারণ, আগেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবের কালি না শুকাইতেই লর্ড লিংলিথগো "রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে" করিয়াছিলেন। লর্ড মহোদয় করিৎ-কর্ম্মা ও ত্বরিত-গতি লোক, আজই, এখনই যাহা করা যাইতে পারে কাল বা একটু পরের জন্য রাখিয়া দিবার ধৈর্য্য তাঁহার ছিল না।

তথাপি মনে হয়, গান্ধীজির মনের মণি-কোঠায় কি বাসনা, পুষ্প-কোরকে রেণুর মত, রত্নাকর-গর্ভে রত্নরাজির মত, সঙ্গোপনে বসতি করিতেছিল তাহার সম্যক গবেষণা আজ যদি নাও হইয়া থাকে, একদিন তাহা হইবে; আর সেদিনও কি খুব দূরে? নিশ্চয়ই না। আজীবন সত্যাশ্রয়ী, নিঃসংশয়িতরূপে শান্তিকামী, অহিংসাব্রতধারী মানুষটি কোন্ কাজ করিয়া মরিতে চাহিয়াছিলেন (করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে), অনুসন্ধিৎসু ভারত একদিন তাহা বাহির করিবেই। সেই ত ভারতের বৈশিষ্ট্য। অতীতের স্বর্ণসূত্রে ভারত চিরদিন আবদ্ধ। ভারতের মহান বর্ত্তমান যে মহীয়ান অতীতের পটভূমিকাতেই পরিস্ফুট, ভারতবাসীর তাহা অজ্ঞাত নহে!

'গরুর পাল' পুণা ও আমেদনগরের 'গোশালায়' আশ্রয় প্রাপ্ত হইবার পরে দেশময় যে সকল অনাচার ও অত্যাচারমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই সকল কার্য্য কি গান্ধীজির করেঙ্গে-র অন্তর্ভুক্ত? বিশ্বাস করা কঠিন। দিকে দিকে টেলিগ্রাফের তার কাটা গেল, রেলের লাইন উপাড়িয়া ফেলিল, ডাকঘর পুড়িল, নির্দ্দোষ নিরপরাধ মরিল, থানা জ্বলিল—এই সকল কাজ করিয়া মরেঙ্গে—মরিতে বলা বা মরা কি গান্ধীজীর অভিপ্রেত ছিল? মনে ত হয় না। বরং মনে হয়, সাতারার পত্রী সরকার, মেদিনীপুরের গ্রাম-রাজ ও ভারতের বাহিরে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই ঐ করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গের মধ্যে বাসনারূপে অন্তর্নিহিত ও অব্যক্ত ছিল।

বিদ্রোহ, আমরা অনেকগুলি দেখিয়াছি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্রোহ পরিচালিত হইতে দেখা গিয়াছে। তাহার পশ্চাতে

করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের উচ্চাদর্শ ছিল কি? না, বড় জোর, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" ঐ পর্য্যন্ত। বাঙ্গলার অগ্নিযুগও দেখিয়াছি। 'আনন্দ মঠের' খঞ্জ অনুকরণে কতকগুলা হত্যা ও লুণ্ঠন। দেশময় আতঙ্কের সৃষ্টি ছাড়া, কৈ, করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গের মত সর্ব্বত্যাগের আদর্শ গড়িয়া উঠিতেও ত দেখি নাই। ১৯১৯ হইতে দফায় দফায় সমুদ্রোচ্ছাসের মত কত আন্দোলনই ত আসিল—রাউলাট বিদ্রোহ, খিলাফৎ আন্দোলন, ডাণ্ডী মার্চ্চ, লবণ সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য—এমন আরও কত আন্দোলন আসিল, দেশ ওলট পালট করিতে চাহিল; লাখে লাখে লোক জেলে গেল, হাজার হাজার লোক মরিল, শতকে শতকে সর্ব্বস্বান্ত হইল—কিন্তু কৈ, সাতারার মত জেলা শাসন, মেদিনীপুরের মত গ্রাম রাজ, আজাদ হিন্দ সরকারের মত স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা ত শুনা যায় নাই। যাঁহারা নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন, তাঁহারা অবশ্যই সাতারার পত্রী সরকার, মেদিনীপুরের গ্রাম রাজ ও সুভাষের আজাদ হিন্দ সরকারের আংশিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন এবং ইহাও তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইংরাজের রক্ত চক্ষু, অলিতে গলিতে সেন্সর, কঠিন আদেশ, সমুদ্যত দণ্ড সত্বেও যতটুকু খবর বাহির হইতে পারিয়াছে তাহাতেই জাগ্রত ভারতের অনমনীয় দৃঢ়তা, অজ্ঞাতপূর্ব্ব সঙ্ঘবদ্ধতা, কল্পনাতীত সংগঠনকুশলতা দেদীপ্যমান হইয়াছিল! বৃটিশের অপরিমেয় পশুবল—অপরিসীম ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল ছল-কল-কৌশল অবহেলা ও উপেক্ষা করিয়াই ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ভারত বাসী উন্নতশির স্ফীতবক্ষ অচঞ্চল পদবিক্ষেপে তাহার "কুইট্ ইণ্ডিয়া" অভিযান অকুতোভয়ে পরিচালিত করিয়াছিল। তাহার মুখে তাহার চোখে তাহার বুকে লিখিয়া রাখিয়াছিল "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"

স্রোত-হারা তটিনীর মত ভারতের গণ-সরকার ও জন-রাজ আজ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডের আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টও অবলুপ্ত, কিন্তু নহুঁষের প্রেতাত্মার মত তাহাদের ছায়া-দেহ আজও ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে স্থলে জলে প্রান্তরে কান্তারে অণুতে পরমাণুতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে জয় হিন্দ হাঁকিয়া ফিরিতেছে। মানুষ আজ এক ভাষায় কথা কহে; এক ভাবধারায় চিন্তা করে; আজ তাহার এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য; আজ তাহার কামনা বাসনা সাধ অভিলাষ, করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে। ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে, মিশরে, পারস্যে, ইরাণে, পালেষ্টাইনে করেঙ্গে মরেঙ্গেরই ইয়া তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। কলিকাতার রাজপথে—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে, বোম্বাইয়ের জাহাজ ঘাটে, জব্বলপুরের শস্ত্রাগারে—আর

কত নামই বা করিব ? সর্ব্বত্রই ঐ করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে জয় হিন্দ রবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বাস্তব-অবিশ্বাসী এতদুভয়ে সংযোগ দেখিতে পায় না ; কিন্তু চক্ষুষ্মান বাস্তববাদীর সে ভ্রম হইবার নহে। আজিকার ভারতবর্ষে "জয় হিন্দ" শীতলশোণিত মুমূর্ষুকেও উজ্জীবিত উদ্দীপ্ত করে। হারাধন প্রাপ্তিতে জননীর যে আনন্দ "জয় হিন্দ" ধ্বনিতে ভারতবাসীর আজ সেই আনন্দ ; সে যেন তাহার হারানিধি অমূল্য সম্পৎ ফিরিয়া পাইয়াছে। বন্দেমাতরমে যেটুকু ফাঁক ছিল জয় হিন্দ তাহা ভরিয়া দিয়াছে।

১৯২৯ হইতে ১৯৩৩ বৃটিশের ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি বিহারের ভূমিকম্পের মত মাথা নাড়া দিয়াছিল। দাম্ভিক বৃটিশ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের অধীশ্বর বৃটিশের সম্রাটের প্রবল প্রতাপ প্রতিনিধিকেও দীন-দরিদ্র ভারতের এক অর্দ্ধ উলঙ্গ ফকিরের সহিত একাসনে বসিয়া একই কাগজখণ্ডে লিখিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর দান করিতে হইয়াছিল। কলমও এক কি-না তাহা অবশ্য জানা যায় নাই, তবে এক হওয়াই সম্ভব। সে দিনের কথা আজও আমাদের মনে আছে। বিলাতে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স আহ্বান করিয়া অধীন ও অবনত ভারতের সঙ্গে বুঝা পড়া করিতে হইয়াছিল। কৌপীন-সম্বল ফকিরের যাত্রায় বিলম্ব হয়, বৃটিশ সিমলা শৈল হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেণ ছুটাইয়াছিল। বোম্বাইয়ে জাহাজকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। লণ্ডনের রাস্তার আইন কানুন টেমস্ নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া এই অর্দ্ধ উলঙ্গ ফকিরের সুবিধা করিয়া দিতে পথ পায় নাই। ফকিরের মোটরের অগ্রে অগ্রে ফায়ার ব্রিগেড ঘণ্টা বাজাইয়া রাস্তা সাফ্ রাখিত। বৃটিশ জানিত, ঐ ফকিরই করেঙ্গে ঔর মরেঙ্গে—করিতেও পারে, মরিতেও পারে। আবার, রাখিলেও রাখিতে পারে, মারিলেও মারিতে পারে।

১৯৪৬ সালে আর লণ্ডনে কনফারেন্স নহে। সম্ভব হইলে খাস্ পার্লিয়া-মেণ্টও ভারতে আসিয়া হাজির হইত। তাহার প্রয়োজন হয় নাই। গন্ধমাদন আসিয়াছে, বিশল্যকরণী আহরণ করিয়া লইতে পারা যাইবে। গরজ বড় বালাই ! 'বদনে রদন লড়ে ওদনে বঞ্চিত' ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স তিন মাসাধিক কাল এই গরমে, ফুটি-ফাটা আম-পাকা জাম-পাকা কাঁঠাল-পাকা গ্রীষ্মে উত্তপ্ত প্রস্তর দিল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন। বড়ই "মদেক সদয়েষু" ভাব। 'সবিনয় বিনয়-পূর্ব্বক নমস্কারমিদং কার্য্যাঞ্চাগে' মুখবন্ধ করিয়া আলাপ (প্রলাপ ?) ও আলোচনা চালাইতেছেন। থিয়েটারের বিরহিনী নারীর গীতি গীত হইতে শুনা যাইতেছে—

"আমি বিলাইতে চাই আমারে।"

চাকা যে ঘুরিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। যুদ্ধকালে বৃটেনের ভাগ্য নিয়ামক বুল-ডগানন উইনষ্টন চার্চ্চিল বাঁধা দাঁতে মোটা চুরুট ধৃত করিয়া যে দিন দম্ভভরে ও সদর্পে বিঘোষিত করিয়াছিলেন যে "বৃটিশ মহাসাম্রাজ্যের নীলাম-বিক্রয়ে ঘণ্টাধ্বনি করিবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই" এবং "বৃটিশের যাহা আছে, চিরদিনই তাহা থাকিবে"!—সেইদিন, অন্যে না জানিলেও, অন্যের জানিবার সুযোগ না থাকিলেও, তাঁহার ত অজ্ঞাত ছিল না যে পদ্মা নদীর পাড় ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছে এবং পদ্মার ভাঙ্গন্ এমন নহে, ভাঙ্গন্ একবার সুরু হইলে শেষ যে কোথায় তাহা জানাও যেমন সম্ভব নহে, কল্পনা করাও তেমনই অসম্ভব। হিটলার-মুসোলিনী-তোজো এক পক্ষে, চার্চ্চিল-রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিন অন্য পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে যখন নরমেধযজ্ঞানুষ্ঠিত করিতেছিলেন তখন আমাদের জানা না থাকিলেও, আমাদের জানিবার সব পথ সর্ব্বপ্রযত্নে, সর্ব্ববিধ উপায়ে বন্ধ থাকিলেও, ইংলণ্ডে চার্চ্চিল ও ভারতে লিংলিথগোর নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল না যে নীলামের ইস্তাহার প্রস্তুত; ঘণ্টা বাজিতে যেটুকু বিলম্ব।

বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ; ততোহধিক বিচিত্র প্রবৃত্তি আমাদের এই ভারতের অধিবাসী। পরাধীনতার বেদনা, লাঞ্ছনা, গ্লানি, অপমান, নির্য্যাতন ও নিপীড়ন ম্যালেরিয়ার পালা জ্বর, দুর্ভিক্ষের অল্পাহার, অর্দ্ধাহার, অনাহারের মত নিতান্তই গা-সহা হইয়া গিয়াছে। বিশ্বের মানব-জাতি যখন স্ব স্ব দেশের স্ব স্ব জাতির স্বাধীনতা রক্ষণে, স্বাধিকার সংরক্ষণে, এমন কি অধিকার সম্প্রসারণে জীবনমরণ সংগ্রামে প্রমত্ত, আমার দেশ ভারতবর্ষে নরনারীও স্বাধীনতা অর্জ্জন মানসে "কুইট ইণ্ডিয়া" মন্ত্রে মাতিয়াছে, ভারতের বাহিরেও ভারতবাসী "দিল্লী চলো" ফুকারিতেছে, সেই সময়েও বিচিত্র-এই দেশ ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর মনুষ্য ইংলণ্ডের চার্চ্চিল-আমেরীর দয়াদাক্ষিণ্যের দরগার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করতঃ নিষ্ক্রিয়, স্থানুবৎ অবস্থান করাই গৌরব বোধ করিলেন। শুধু কি তাহাই? এই আনবিক রশ্মির যুগেও মধ্যযুগীয় ধর্ম্মগত, সম্প্রদায়গত, অবলুপ্ত-প্রায় ভোঁতা অস্ত্রের সন্ধান করিয়া কলহানলে সমিধ্ নিক্ষেপ করিতেও লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করিলেন না। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে একটা শক্তিশালী অংশের দর্শকের ভূমিকা অভিনয়েই কালাতিবাহিত হইল। বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ!

ঘণ্টা বাজিতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। বিশ্বরণতাণ্ডবের যখন অবসান ঘটিল, নীলামের ঘণ্টা তখনই ঘোররবে বাজিয়া উঠিল। তাহার পূর্ব্বেকার অর্থাৎ যুদ্ধকালীন ঘটনা এইস্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন আছে।

বিচিত্র এই দেশের ইতিহাস অতীব বিচিত্র সত্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু বিস্মিত হইতে হয় না। ভারতবর্ষের ইতিহাস-সমুদ্র মন্থনে এরূপ রত্নরাজি আগেও উঠিয়াছে ; এখনও উঠিতেছে। যুগে যুগে, শতাব্দীতে শতাব্দীতে তাহারা ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছে ; আজও ইতিহাস কলঙ্কিত করিতেছে।

উইনষ্টন চার্চ্চিল যুদ্ধে ইংলণ্ডকে জয়শ্রী আনিয়া দিয়াছে, ইংলণ্ড এ কথা অস্বীকার করিবে না ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে জয়শ্রীদাতা চার্চ্চিলকে পদাঘাতে বিদূরিত করিতে ইংলণ্ডের লোক এক লহমা বিলম্ব করে নাই! তাহারা বুঝিয়াছিল, যুদ্ধেতে চার্চ্চিল ভাল, শান্তিতে অচল। তাই তাহারা তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিল। চার্চ্চিলের সহিত আমাদের নারদ ঋষির সামঞ্জস্য অদ্ভুত। শ্রীল নারদ নামে কোন মুনি আদৌ ছিলেন কি-না আমি জানি না কিন্তু কোন কোন পুরাণ-কার ঢেঁকি বাহনে এক নারদ ঋষিকে ত্রিভুবন ঘুরাইয়া বেড়াইয়াছেন ইহা আমরা দেখিতে বাধ্য হই। তাঁহার ঢেঁকিটি এখনকার এরোপ্লেন বলিয়াই মনে হয়। তিনি সেই মনোপ্লেনটিতে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যেখানে দেখিলেন, স্বামী-স্ত্রী বেশ মনের মিলে ঘর সংসার করিতেছে, ছল ছুতা ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ বাধাইয়া দিলেন। যেখানে দেখিলেন লোকে শান্তিতে বসবাস করিতেছে, একটা লাঠালাঠি লাগাইয়া দিয়া ঢেঁকি প্লেনে চম্পট দিলেন। চার্চ্চিলের আজ সেই দশা। কখনও আমেরিকাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, চল্ ভাই বনে যাই, কাঠ কাটিগে খটাখট্। কখনও বা ফ্রান্সকে মন্ত্র দিতেছেন, আয় না ভাই তাল ঠুকিগে ঠকাঠক। প্রকাশ্যে ঐ কথা ; আর কাণে কাণে—নৈলে, ঐ লালকোর্ত্তা! ভারতবর্ষের কোন কোন লোক বা কোন কোন সম্প্রদায়ের জন্য চার্চ্চিলের চক্ষুর সাঁতারপানি সর্ব্বজনবিদিত। আজও, যখন নখ গিয়াছে, দন্ত গিয়াছে, কেশর নাই, থাবা বর্ষা কালের নূনের পুঁটুলী হইয়া পড়িয়াছে, তখনও ঢেঁকি আরোহনে তাহাদের উস্কাইয়া বেড়াইতেছেন নারদ! নারদ!

মায়ের অপেক্ষা মাসীর দরদ বেশী কেন, এই চির সত্য কথাও যে কেন লোকে ভুলিয়া যায় তাহাই আশ্চর্য্য! তাই ত বলি, বিচিত্র দেশ এই ভারতবর্ষ! ততোঽধিক—বিচিত্র আমরা—ভারতবাসী!

ভারতের অতি বড় দুর্ভাগ্য! ভারতবর্ষ যখন ন্যূনাধিক দুইশত বৎসরের আমোঘ মোক্ষম্ Tata Steel নির্ম্মিত লৌহ নিগড় ভঙ্গ করিবার জন্য তনুমনঃধন উৎসর্গ করিয়াছে তখন আরও একটি রাজনৈতিক্ দলের দর্শন মিলিল। অহীরাবণের পুত্র মহীরাবণের মত, এই দল ভূঁ

হইয়াই রণ রঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যে বৃটিশ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ফ্রিজিডিয়ার-রেফ্রিজারেটারে বাসি মাছ ও পচা মাংসের সঙ্গে তাকে তুলিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছে; যে বৃটিশ, কুরুরাজ দুর্য্যোধনের মত ভারতকে কোনদিন সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়িয়া দিবে না, শুনাইয়া দিয়াছে; যে বৃটিশ, ভারতবর্ষকে মহা আহবে লিপ্ত করিবার পূর্ব্বে একটি মুখের কথাতেও ভারতের মতামত জানিবার প্রয়োজন দেখে নাই, আইন গড়িয়া, বে-আইন রচনা করিয়া নো-আইনের নাগপাশ নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের জন, ভারতের ধন পরমানন্দে যুদ্ধে উৎসর্গ করিয়া দিতে বিন্দুমাত্র কালহরণ করে নাই; যাহার যে রাজ্য, তাহারই তাহা থাকিবে বলিয়া দিয়াছে; সাম্রাজ্যের নীলামের আসরে ঘণ্টা বাজাইবার জন্য রাজমন্ত্রীত্ব হয় নাই বিশেষ করিয়া ভারতবাসীকেই তাহা শুনাইয়া দিয়াছে; পাছে অতলান্তিক সনদে পৃথিবীর স্বাধীনতার কথা আছে দেখিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা দাবী করিয়া বসে, তাই অতলান্তিক সনদ ভারতের জন্য নহে বজ্রনির্ঘোষে এ কথাও ভারতবাসীকে জানাইয়া দিয়াছে; তথাপি, হায় রে হায়! সদ্যঃভূমিষ্ঠ এই দল বৃটিশের যুদ্ধেরও নামকরণ করিল, জনযুদ্ধ। ভারতের জনগণকে বৃটিশকে সহায়তা দান করিতে আহ্বান দিল। বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ; ততোহধিক বিচিত্র—বিচিত্রাধিক বিচিত্র এই ভারতের অধিবাসী! সেদিনের কথা মনে করিতেও হাসি আসে; লজ্জা হয়। হাসি আসে এই জন্য যে মানুষ কত সহজে বিভ্রান্ত হয়, কেমন অসঙ্কোচে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে; আর লজ্জা এই যে, তাহারাও আমাদের আত্মীয়, আমাদেরই স্বজন। পদাঘাতে পদাঘাতে ধুলিধূসরিত অঙ্গ, সেই ধুলি ব্রজরেণুরূপে পূজা পায়।

ট্রামে কিম্বা বাসে ডাম্ব-ক্যাট্‌লবৎ চলিতেছি—আর মা কালীকে জোড়া পাঁঠা (যদি পাওয়া যায়, তবেই দিব) মানত করিয়া বলিতেছি হে-মা, মড়ক করো, কলকাতা কিছু হাল্কা হোক, নহিলে এত ভিড়ে আর ত পারি না মা! অকস্মাৎ রুক্ষ কেশ, শুষ্ক আনন, মলিন বসন যোদ্ধৃবর্গের প্রবেশ! কাহাকেও গুঁতাইয়া, কাহাকেও হাতাইয়া, কাহাকেও বা লাথাইয়া, তাহারই মধ্যে স্থান করিয়া লইয়া হঠাৎ—বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত হুঙ্কার ত্যাগ—"জাপানীদের রুখ্‌তে হবে" বলিতে বলিতে তৈলবিরল, শুষ্ক কেশরাশি মুহূর্ত্তে খাড়া হইয়া উঠিল; বিরস আননে অনল জ্বলিয়া উঠিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; নবেন্দ্রিয় যেন এক মুহূর্ত্তে কুইক্‌ মার্চ্চ সুরু করিয়া দিল—"জাপানীদের রুখতে হবে।" আচম্বিতে মনে হইত, বুঝি বা জাপানী বোম্বেটেরা উল্টাডিঙ্গির ক্যানাল পার হইয়া টালার

পুলে চড়াও হইয়াছে, আর রক্ষা নাই! এখন একমাত্র উপায়—"জাপানীদের রুখতে হবে!" যখন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে, পৈতৃক প্রাণ করতলে পুরিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছি যে কি উপায়ে রুখিব—কামড়াইব—না আঁচড়াইব—না হাওয়ায় ঘুঁষি ছুঁড়িয়া বা মাথা ফাটাইব (মাথা যদি জাপানী খেলনার মত হয়, তাহা হইলে আমার মত ক্ষীণজীবির ঘুঁষিতে ফাটিতে পারে!) যোদ্ধৃবর্গের প্রস্থান; প্রস্থান না বলিয়া অন্তর্দ্ধান বলিলেই ভাল হয়। অবসর নাই, বড় তাড়া, কেননা, "জাপানীদের রুখতে হবে!" আবার কাহাকেও গুঁতাইয়া, কাহাকেও হাতাইয়া, কাহাকেও কুনাইয়া, কাহাকেও লাথাইয়া, টালার পুল কিম্বা শ্যাম-বাজারের চৌমাথার উদ্দেশে ছুটিতে হইল। আমরা মা-কালীর নিকট অন্য আরজি পেশ করিলাম, হে মা, জাপানীদের রুখতে পারি আর নাই পারি, বাড়ী গিয়ে যেন দরজা বন্ধ করতে পারি!

ভাল হৌক মন্দ হৌক ভারতের সংস্কার আছে, এখানে গাঁটছড়া একবার বাঁধা পড়িলে আর তাহা ছিন্ন হয় না। বাসা বদল, বসন বদল, পাদুকা বদলের মত পতি বা পত্নী বদলের রীতি বা নীতি আজও প্রতীচীতে জলচল হয় নাই। গুরু ভাল, শিষ্যও মেধাবী, গুরুদত্ত বিদ্যা অর্জ্জনে আগ্রহ দুর্নিবার থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দুইশত বর্ষকাল মধ্যে ভারতবাসী পত্যন্তর বা দারান্তর গ্রহণে গুরু ইয়োরো-পের মত নৈপুণ্য আজও আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ভারতে বৃটিশের পতিত্বের অবসান ঘটাইতে ভারতবর্ষ বদ্ধপরিকর; কিন্তু পত্যন্তর গ্রহণের বিন্দুমাত্র বাসনা তাহার নাই। বৈধব্যে বিরুচি তাহার কোনদিনই ছিল না, আজও নাই, একাদশীর উপবাসে তাহার অভ্যাস আছে। ভারতের শিরোভূষণ তুষারকিরীটিনী হিমা-চলের ন্যায় ভারত নারীর বৈধব্যও বহু পুরাতন। বৃটিশকে "কুইট-ইণ্ডিয়া" করিতে বলিয়া, বেলফুলের মালা হস্তে পীতবরণ (?) বনমালী জাপানীকে সুস্বাগতম্ করিতে চাহিবে ভারতবর্ষের জীবিত নরনারীদিগের মধ্যে সে স্বৈরাচারেচ্ছা কেহ পোষণ করিত বলিয়া শুনা যায় নাই। তবু যে শূন্যে, বায়ুপৃষ্ঠে কীল চড় ঘুঁষি গাঁট্টা হাঁকড়াইয়া জাপানীদের রুখিবার দরকার হইয়াছিল, ইহাই যথেষ্ট বিস্ময়; তাহার উপরে আবার জনযুদ্ধের রাফ্রাঁ। "রুশকি লড়াই হামকি লড়াই!" "রুশকি লড়াই হামকি লড়াই" ধুয়ায় কাণমাথা ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল। বিজ্ঞ লোকে বলে, অভিসারিকার প্রেম নিকষিত হেম, যেন এ-সি কারেণ্ট—ছোঁয়াচ লাগিবামাত্র মরণং ধ্রুব। সাম্যবাদী রাশিয়ার নবীন প্রেমে ডগমগ তনুমনঃ কমিউনিষ্টগণ দেশকে হেঁচকা টানে খানিকটা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল

বৈকি ! কমিউনিষ্ট কি সত্যই ভাবিয়াছিল, মার্জ্জারের মৎসে, শার্দ্দুলের মাংসে, যুবজনের যৌনরসে অরুচি হইয়াছে ? বৃটিশ তাহার সাম্রাজ্যলিপ্সা বিসর্জ্জন দিয়াছে ? মার্জ্জার মেছুয়াবাজারের বাসা ছাড়িয়া দিয়াছে ? ব্যাঘ্র মহোদয় নররক্ত ও নরমাংস উপেক্ষা করতঃ তপোবন পর্ব্বতকন্দরে বুদ্ধবন্দনায় রত হইয়াছে ? যুবক যুবতীগণ চন্দ্রমাশালিনী মধু যামিনীতে বকুলের তলে বসিয়া (বা শুইয়া) "হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে" গাহিতেছে ? সত্য সত্যই কি কমিউনিষ্ট ভায়ারা এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিল ? কে জানে বাপু ; আমি ত বুঝি না !

সে সময়ে পৃথিবীময় যে ভ্রান্তিবিলাসের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল ইহাই বা অস্বীকার করিবে কে ? আমেরিকার রাষ্ট্রধর রুজভেল্ট (তাঁহার আত্মার সদ্গতি হৌক !) জোর গলায় ফোর ফ্রিডাম্—চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার গাহনা গাহিতেছেন ; তাঁহার মামাতো ভ্রাতা (অনেকে বলে মাসতুতো) চার্চ্চিল অতলান্তিক মহাসাগর-বক্ষে জাহাজে বসিয়া অতলান্তিক সনদে সাদা কালিতে স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া পৃথিবীকে অভাব হইতে, পীড়ন হইতে, ভয় হইতে, শোষণের কবল হইতে নির্ব্বিচারে মুক্তি দিবার অভয় বাণী শুনাইতেছেন ; যুদ্ধের অবসানে এই পচা পুরাতন প্রৌঢ়পৃথিবীতে নূতন স্বর্গ, নূতন মর্ত্ত্য রচিবার আশ্বাসে আশ্বাসে ধরিত্রীর রসনা রসসিক্ত করিয়া তুলিতেছেন। এ সকলে লোকের ভুল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু কুলটার পবিত্র পাতিব্রত্যের মত, পরম ধার্ম্মিক বকের ধর্ম্মাচরণের মত, বৃটিশের শোষণবিতৃষ্ণার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহাদের ভ্রান্তি হইবার নহে, তাহারাই একদিকে "কুইট-ইণ্ডিয়া" ও অন্যত্র "দিল্লী-চলো" করিয়াছিল। মহীরাবণের পুত্র অহীরাবণ তাহাতে বড়ই রাগ করিয়াছিল। বিশ্বের মুক্তি প্রদাতা, বিশ্ববাসীর স্বাধীনতা-বিধাতা, বৃটিশের জীবন-মরণ যুদ্ধের সময়ে যাহারা বৃটিশকে কুইট-ইণ্ডিয়া করিতে বলে, মহীরাবণ গালি দিয়া তাহাদের ভুত ভাগাইয়া দিয়াছিল। আর দিল্লী-অভিযাত্রীগণ তাহাদের নিকট মিরজাফর, কুইসলিং, পঞ্চমবাহিনীর গৌরব অর্জ্জন করিল। বিচিত্র-দেশ আমাদের ভারতবর্ষ ; ততোহধিক বিচিত্র তাহার সর্ব্বংসহা প্রকৃতি ! পচা পুকুরের পঙ্কও তাতে ; কিন্তু ভারতের সহিষ্ণুতার অন্ত নাই। আজও তাই মহীরাবণ মনুষ্য-সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেছে।

কিন্তু একটা কথা আমরা ভাবিয়া পাই না। ভারতীয় কমিউনিষ্টরা কি আজও রাশিয়ার প্রেমের স্বপ্নে মশগুলচিত্ত ? উচাটনহিয়া ? ঘুমঘোর—দিবাস্বপ্ন, কি এখনও ভাঙ্গে নাই ? যুদ্ধের সময়ে বিচ্ছিন্ন বোতাম পেণ্টালুনের রসি কসিতে

কসিতে যে-বৃটিশ ব্রহ্মদেশ পরিহরি বিপদভঞ্জন মধুসূদম যীশুখৃষ্টের শতনাম আবৃত্তি করিতে করিতে সিমলা শৈলে আসিয়া পিতৃদত্ত প্রাণ ও দুইশত বৎসরের দুর্জ্জয় মান রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন এবং দিনে অদিনে, ক্ষণে অক্ষণে, সময়ে অসময়ে স্বাধীনতার স্বর্ণবাণী শুনাইয়া ব্রহ্মবাসীকে ভবিষ্যতের সুখসায়য়ের সুখ তরঙ্গে নাগরদোলায় দোল দিতেছিলেন, আমেরিকার দৌলতে যুদ্ধজয়ের পরে, সেই ব্রহ্মদেশে শুভ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাঁহাদেরই সে কি বীরপণা! সে শৌর্য্য, সে বীর্য্য দেখিয়া ব্রহ্মবাসী অহরহ তারকব্রহ্মসনাতন নাম স্মরণ না করিয়া পারিতেছে না। শুধু ব্রহ্মদেশই বা কেন, ইন্দোনেশিয়ায় দেখ, জাপানী বোম্বেটে যেদিন হানা দিয়াছিল, বৎস ডচ কোন্ কচু বনে ঢুকিয়া অমূল্য জীবন রক্ষা করিল ; আর যেমন যুদ্ধ শেষ হইল, অমমি কচুরায়ের সিংহাসনারোহণের মত জাভায় আসিয়া সিংহপরাক্রম দেখে কে? ইন্দোচীনে দেখ, বীরবর ফরাসী 'যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব' করিয়া ফ্রেঞ্চ লীপ্—চম্পট পরিপাটি করিতে এক লহমা বিলম্ব করে নাই, যুদ্ধান্তে খাস মহলে ফিরিয়া আনামাইটের হাতে মাথা কাটিতেছে। আর সকলের মূলে—তলে তলে—জনযুদ্ধওয়ালাদের পরম মিত্র বৃটিশ, বেয়োনেট বাগাইয়া বলিতেছে, ছিঃ ঝগড়াঝাঁটি কি করিতে আছে? পরস্বাপহরণ মহাপাপ। যাহার যাহা ছিল, তাহাই তাহার থাক্! মহাজনের মহাবাক্য শুনিয়াও যাহারা পরস্বাপহরণজনিত মহাপাপে রত বা লিপ্ত হইবে বৃটিশ তাহাকে নিহত বা নিরস্ত করিবে। যেহেতু, গীতা বলেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

বৃটিশই দুষ্কৃতবিনাশ, সাধুজনের পরিত্রাণ ও ধর্ম্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগেও দেশে দেশে সম্ভব হইতেছেন। কিন্তু আমি ভাবি কি, ইহাতেও যদি ভ্রান্তি নিরসন না হয় তাহা হইলে তাহাদের ভ্রান্তিতেও সন্দেহ জাগে না কি? আর যদি ভুল বুঝিয়া থাকে—ভুল কাহার না হয়—মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। —পৃথিবীর পরিত্রাতা পরমপিতা যীশুপুত্র ইংরাজও বলিয়াছেন, টু আর ইজ হিউম্যান্! অর্থাৎ কি-না ভুল মানুষেরই হয়, গরু ভেড়ার হয় না। কিন্তু মহী-রাবণগণ ভ্রম ও ত্রুটী স্বীকার করে না কেন?

'কুইট ইণ্ডিয়া' ব্যর্থ, দিল্লী যাত্রাও বিফল হইয়াছে, জার্ম্মেনী গতাসু—জাপান বিগতপ্রাণ—ভি, ফর ভিকটি (ভ্যানিশ নহে!) তথাপি বৃটিশ' ভারতের সহিত বুঝাপড়া করিতে চাহে কেন? গরজ বড় বালাই। গরজে গোয়ালা ঢেলা

বহে। বৃটিশ ভারতবাসীকে 'তু' ডাক দিয়া বিলাতে না লইয়া গিয়া নিজেরাই ভারতে আসিয়া বুঝাপড়া করিতে গলদঘর্ম্ম হইতেছে। কেন গা? ভারতবর্ষ সাবালক হইয়াছে; আর তাহাকে বেত্র-অগ্রে দণ্ডায়মান রাখা শোভন ও সঙ্গত হয় না? প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে—তাহাকে স্বাধীনতা দিতে হয়। ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবির পার্লিয়ামেণ্ট সৌধাভ্যন্তরে, হাউস অফ কমন্সের সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রধান মন্ত্রী এ্যাট্‌লি যেদিন এই শুভ সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে দিন (বোধ হয়) স্বর্গে দেবতারা দুন্দুভি নিনাদ করিয়াছিলেন; অপ্সরী-কিন্নরী পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল; আর আমেরিকা ধন্য ধন্য করিয়াছিল; বৃটিশের বুটলেহীর দল রবি ঠাকুরের কবিতা রিসাইট্ করিয়া গগন ফাটাইয়া ফেলিয়াছিল:

"ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী! চরণপদ্মে নমস্কার"

কিন্তু ভারতবাসী জানে, তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভালই জানে, কৃপণের বাড়ীর ফলার, না আঁচাইলে বিশ্বাস নাই; কিন্তু সে কথা যাক্; অথবা সে কথা এখন থাক্। আমি আজাদ-হিন্দ-সরকারের কথা বলিতেছি, সেই কথাই বলি।

একদিনের জন্য হৌক, অথবা এক সপ্তাহের জন্য হৌক, কিম্বা এক মাস বা এক বৎসরের জন্য হৌক, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার যিনি গঠন করিয়াছিলেন তাঁহার সাধনা বিফল এবং বিফলতায় হিমালয়-প্রমাণ হইলেও, ভারতবাসীর আজাদী আকাঙ্ক্ষানলে সে যে পূর্ণমাত্রায় ঘৃতাহুতি দিয়া গিয়াছে, বৃটিশ যদ্যপি তাহা না বুঝিয়া থাকে তাহা হইলে বৃটিশের রাজনৈতিক বুদ্ধির ভাণ্ডারে গোময়াতিরিক্ত পদার্থ আছে বলিয়া মনে করা কঠিন হইয়া পড়ে!

১৯৪২ সালের আগে পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একটা নিরুপদ্রব আন্দোলনের মধ্যেই পর্য্যবসিত ছিল। বিমুখ ও বিরূপ বৃটিশের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে মান অভিমানের পালা গাহিয়াই আমরা চলিতেছিলাম। বৃটিশের নানা অজুহাত (দুরাত্মার অজুহাতের অভাব হয় না)। নানা অছিলা, নানা বায়নাক্কা—বৃটিশ দিবে না, আমরাও ছাড়িব না। যাহারা আন্দোলন করিয়াছে, তাহাদিগকে কারাগারে পুরিয়াছে, ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে; নির্য্যাতন, নিপীড়ন—সম্ভব ও অসম্ভব, সঙ্গত ও অসঙ্গত, সভ্যতাসম্মত ও অসভ্য এবং বর্ব্বরোচিত আচরণও যে করে নাই এমনও নহে, প্রতিবাদে কারাগারে আরও জনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; লাঠি বরণ করিতে আরও লোক, গোলাগুলির মুখে বুক পাতিতে কাতারে কাতারে আরও অনেক নরনারী আগাইয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস মূকের মুখে ভাষা, দুর্ব্বলের বুকে বল, ভীরুকে সাহস, কাপুরুষকে নির্ভীক করিয়া

ভারতবর্ষকে বহুদূর—বহু দূর পথে লইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কণামাত্র অবকাশ না থাকিলেও ১৯৪২ পরবর্ত্তীকালের 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গের' তুলনায় সে সমস্তই নিষ্প্রভ ও অনুল্লেখ্য হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া ভারতবাসী অনন্ত দুঃখ, অশেষ কষ্ট বরণ করিয়াছে, গৃহ সংসার অতলে ভাসাইয়াছে, পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, বন্দুকের গুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, হাসি-মুখে গান গাহিতে গাহিতে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়াছে, তবু স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতার রূপ, স্পর্শ, গন্ধ কিরূপ, স্বাধীনতার স্বাদ কেমন, স্বাধীনতার বাতাস মলয়ানিলের মত মিষ্ট মধুর কি-না এ সকলের সহিত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ কোন পরিচয়ই তাহার ছিল না। এই ভারতবর্ষ তাহার দেশ, তাহার জন্মভূমি, তাহার স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি, এই মাটি তাহার মা-টি, ভারতবর্ষ তাহার সে'ও ভারতবর্ষের—কিন্তু তাহার দেশে তাহার অধিকার নাই, কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহার জন্মভূমি মাতৃভূমিতে সে যেন প্রবাসী, পরদেশবাসী, তাহার মা-টিকে মা বলিয়া ডাকিবার, মাতৃরূপা জননীকে পূজার বেদীতে বসাইয়া পূজা করিবার স্বাধীনতাটুকুও তাহার নাই। মাতৃমূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে অপরাধ হয়, মা'র রূপগুণের স্তব রচনা করিলে রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইতে হয়। তাহাদের দেশ অন্যে শাসন করে, শোষণ করে। পরের দয়াদত্ত কণামাত্র প্রসাদ পাইয়াই তাহাকে তুষ্ট থাকিতে হয়। সে চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক সে নহে। স্বগৃহে তাহার অদৃষ্টে মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা—এ দুঃখ বড় দুঃখ। এ বৈষম্য মর্ম্মান্তিক বৈষম্য। অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল কংগ্রেস এই বৈষম্য দূর করিবার বিধিমত চেষ্টা করিলেও ভারতবাসী তাহার গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারে নাই; স্বাধীনতার নন্দনকাননের পারিজাত সৌরভ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই। নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকার সেই লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া দিয়াছে; ক্ষণকাল, স্বল্পকালের জন্য হইলেও স্বাধীনতার সৌরভ, স্বাধীনতার আস্বাদ অনুভব করিয়া ভারতবাসী ক্ষণকালের তরেও, স্বল্পকালের জন্যও ধন্য হইয়াছে।

একি কম গর্ব্বের কথা যে ভারতবর্ষের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ইংলণ্ড-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিয়াছিল? একি অল্প গৌরবের কথা যে ভারতবাসী বিদেশীর সম্পর্ক ছেদন করিয়া, বিদেশীর সংস্রব রহিত করিয়া, বিদেশীর ক্ষমতার বিলোপ ঘটাইয়া বিদেশীর রাজ্যে স্বকীয় শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল? মণিপুরে তাহার পতাকা, ইম্ফলে তাহার পতাকা,

কোহিমায় তাহার পতাকা, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তাহার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পতপত শব্দে উড্ডীন থাকিয়া বিশ্বসভায় ভারতের গৌরব, ভারতের মর্য্যাদা প্রচারিত করিল। আজ মনে পড়ে বিজয়সিংহের পতাকা একদিন ভারতের বাহিরেও উড়িয়াছিল। আজ মনে পড়ে ভারতবর্ষ সুদূর চীনেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সে সকলই কাহিনীমাত্র; অতীতের ইতিহাসের সুখস্বপ্ন। তবে ভারতের সান্ত্বনা ও বৈশিষ্ট্য যে ভারত তাহার অতীতকে বর্ত্তমানের মতই শ্রদ্ধা করিতে জানে।

জার্ম্মেনী, ইতালী, জাপান প্রভৃতি অক্ষ-শক্তি যেদিন পৃথিবীর ত্রাস ছিল, দুর্জ্জয় ও অপরাজেয় জাতি বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইদিনও, তাহারাও, ভারতের এই অস্থায়ী—আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়াছে, তাহার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, এই স্থুল ও প্রত্যক্ষ সত্য পৃথিবীর ইতিহাস কি অস্বীকার করিতে পারিবে? ইতিহাসেই মিথ্যার বেসাতী তাহা জানি কিন্তু জাগ্রত ভারতের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া মিথ্যার প্রচার আজিকার দিনে, তত সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের লাটপ্রাসাদে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িতেই আমরা দেখিয়াছি। ভারতের নগরে নগরে, বৃটিশ বেণে মসলার দোকানে, এমন কি, শৌণ্ডিকালয়েও ইউনিয়ন জ্যাক্ উড়াইয়া ভারতবাসীকে তাহার অসহায়তায়, অযোগ্যতায় ব্যঙ্গ করিয়াছে, উপহাস করিয়াছে। আমাদের মন, আমাদের নয়নও এমনই অভ্যস্ত, এমনই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল যে ইউনিয়ন জ্যাককে আমাদের সাষ্টাঙ্গে বৈষ্ণব প্রণিপাত করিতেও মর্য্যাদাক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সুচতুর বৃটিশ "অনুপ্রবেশের" কৌশল ভালই জানে। স্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় পতাকার প্রয়োজন থাকিবার নহে কিন্তু অজ্ঞাত কারণে, একেবারে নির্দ্দোষ ভাবে ইউনিয়ন জ্যাক উড্ডীন হইতে দেখা যাইত। বয়স্কাউট, গার্ল গাইড যে উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হইয়া থাক্—উদ্দেশ্য অসৎ এমন কথা বলিতেছি না, ইউনিয়ন জ্যাকের কোনও দরকার হইবার কথা নহে কিন্তু দেখা গেল বৈষ্ণবের নামাবলীর মত ইউনিয়ন জ্যাক ইহাদেরও নামাবলী হইয়া গিয়াছে। বয়স্কাউট-দিগকে জনসেবা ব্রতে উদ্বুদ্ধ করা হয়; শৃঙ্খলাজ্ঞানের উপকারিতা অনুভূত করানো হয়; পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি স্কাউটদিগের চিত্তাকর্ষণ করা হয়; তাহাদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়া হয়, এই সকল কারণে এই অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের একটা সহজাত শ্রদ্ধা আছে। অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলে

পতাকা খানির প্রতিও শ্রদ্ধা জন্মিবে, ইহাই স্বাভাবিক। বৃটিশেরও সেই কামনা। সুকুমারমতি বালকবালিকার অন্তরে শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত করাই তাহার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হইয়াছিল এমন কথাও বলা যায় না। কিছুকাল পূর্ব্বেও ছাত্র-ছাত্রী সমাজে দুইটি বিভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ করা যাইত। একস্তরে দেখিতাম, অল্প বয়সেই সাহেবিয়ানা যেন পাইয়া বসিয়াছে। ইহারা অপর স্তরের সমবয়স্ক ও সহধ্যায়িগণকে কতকটা করুণার চক্ষুতে দেখিত। সাহেবিয়ানার ভিতর দিয়া আভিজাত্য প্রকাশের ব্যাকুলতা একটু বেশী মাত্রাতেই প্রকট হইত। সাধারণ হইতে তাহারা 'উচ্চ ও স্বতন্ত্র' মুখে না বলিলেও হাবে ভাবে আকারে প্রকারে তাহা অব্যক্ত থাকিত না। ইউনিয়ন জ্যাক পরিশোভিত ফ্ল্যাগ পোষ্ট অতিক্রম করিবার কালে অসামান্য গর্ব্ব ও গৌরব বোধ করিত।

পরে একদিন আসিয়াছে যেদিন, আমাদের দেশে, আমরা কোন কোনদিন আমাদের পতাকা উত্তোলন করিয়াছি ; পতাকার তলে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য অঞ্জলি ভরিয়া দিয়াছি। ইংরাজ ইহা দেখিয়াছে! দেখিয়া হাসিয়াছে, খেলাঘরের খেলা-বোধে উপহাস করিয়াছে। আবার যেদিন খুসী হইয়াছে, সেদিনই আমাদের সেই পতাকা ছিঁড়িয়াছে, পদতলে দলিত করিয়াছে! রূঢ় আঘাতে, নিষ্ঠুর অভিভাবকের মত আমাদের খেলাঘরের খেলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ! সেই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বস্ত্রখণ্ডের মানরক্ষায় কত নর নারী প্রাণ দিয়াছে! শক্তিমদমত্ত বৃটিশ ফিরিয়াও দেখে নাই। মাথায় বৃটিশের লাঠি পড়িয়াছে, তথাপি পতাকা হস্তচ্যুত করে নাই ; বন্দুকের গুলিতে প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, তবু শিথিলমুষ্ঠি পতাকাখানি পরিত্যাগ করে নাই ! ভারতের জাগৃতির ইহাই ছিল চূড়ান্ত নিদর্শন।

তারপর একদিন আসিল যেদিন আমার সেই পতাকাখানি—ভারতের স্বাধীনতা-সাধনার পবিত্র প্রতীক সেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত চরকাঙ্কিত পতাকাখানি—স্বাধীন ভূখণ্ডে, স্বাধীন জনপদে মুক্ত বায়ুভরে স্বেচ্ছান্দোলিত হইয়াছে শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে চোখে জল আসিয়া পড়িল। গর্ব্বে, আনন্দে, গৌরবে উল্লাসে শ্রাবণের ধারা বহিল। মনে হইল, স্বপ্ন। নয়ন মার্জ্জনা করিয়া দেখিলাম, স্বপ্ন নহে সত্য। তখন মনে হইল এখন মরি না কেন! স্বাধীনতা সূর্য্যের রশ্মিটুকু থাকিতে থাকিতে, স্বাধীনতার সমীরণটুকু বহিতে বহিতে এ ছার নশ্বর জীবনভার নমিত করি না কেন! আবার চোখের জলে বুক ভাসিল ; বুঝি বা উল্লাসের চাপে হৃদয়ের স্পন্দন স্তব্ধ হইল। হায় রে! তবু তুমি আমি কেহই সে দৃশ্য চোখে দেখি নাই! স্বাধীন আকাশে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন পতাকা

স্বাধীন বাতাসে কোলাকুলি করিতে যাহারা দেখিয়াছে, যাহারা সেই পতাকা অভিবাদন করিয়াছে, আজ এতদিন পরে, এতদূর দেশে বসিয়া তাহাদের গৌরবপরিপূরিত আননে প্রতিফলিত আনন্দের, তাহার নয়নে প্রতিবিম্বিত ঔজ্জ্বল্যের, তাহাদের গর্বোন্নত স্ফীত বক্ষের পরিপূর্ণ অনুভূতির কণামাত্রও কি আমরা অনুভব করিতে পারি? হয় ত পারি; হয় ত পারি না। তা যদি না'ও পারি, তাহাতেই বা কি আসে যায়? আমার দেশে, আমার ভারতবর্ষে তীর্থপ্রত্যাগতের পাদ বন্দনার যে রীতি ছিল, আজিকার ভারতবর্ষে, অতীতগৌরবে গৌরবান্বিত ভারত তাহারই পদাঙ্কানুসরণে আজাদ হিন্দ্ সরকারের পাইক পদাতিকেরও পাদ বন্দনা করিয়া ধন্য হইতে চাহিতেছে। সেকালে আত্মীয় স্বজন তীর্থধর্ম্ম করিয়া ফিরিলে কিম্বা গঙ্গা স্নান করিয়া গৃহে আসিলে কে আগে পা ধুইয়া দিতে পারিবে তাহার জন্য প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া যাইত। দিল্লীর লাল কেল্লায় বৃটিশ যেদিন দম্ভভরে আজাদীর কোর্ট মার্শেল বসাইল সেদিন ভারতবর্ষ আজাদীর চরণ বন্দনার দৃশ্য কি কেহ কোনদিন ভুলিতে পারিবে?

বন্দে মাতরম্।

জয়হিন্দ্।

৫

আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠাতা সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির অথবা 'ঈশ্বরের পুত্র' ছিলেন (!) না। ছিলেন, রক্তে মাংসে, মেদে ও মজ্জায় গঠিত নশ্বর জগত ও মর্ত্ত্যের মানুষ। বিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীতে যে-লক্ষ্য কোটি মানুষ বসতি করে, তাহাদেরই একজন। দেহের রক্তমাসে যেমন উপকরণ, দোষ গুণও তেমনই দেহের অঙ্গ বা অংশ অথবা উপকরণ। কোন মানুষের দেহে মাংসের আধিক্য, কেহ অতি ক্ষীণকায়, কাহারও রক্তের চাপে শরীর অসুস্থ, কেহ বা রক্তাল্পতায় কাতর। গুণ কাহারও অধিক, কেহ বা বহুদোষের আকর; নির্গুণ কিম্বা নির্দোষ মানুষ সুদুর্লভ। আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারেন নাই। আর দশজনের মত, তাঁহার শরীরও দোষ এবং গুণের আগার হইতে বাধ্য। আমি তাঁহার গুণের অথবা দোষের তালিকা সঙ্কলন করিতে বসি নাই; তালিকা প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমি মনে করি না। সমস্ত পরিহার করিয়া, তাঁহার একটি মহৎ দোষের কথাই আমি বলিব।

সুভাষবাবুর বৃটিশ-বিদ্বেষ ছিল, ওজনাতিরিক্ত। এত অধিকমাত্রাতেই এই 'বস্তুটি' ছিল যে মাপিয়া পাওয়া যাইত না এবং আমার বিশ্বাস তিনি স্বয়ং সাধ্যমত

চেষ্টা করিলেও ইহা গোপন করিতে পারিতেন না। পারার ঘা যেমন গোপন করা যায় না, সুভাষের বৃটিশ-বিদ্বেষও তেমনই চাপা থাকিত না। ঐ দোষ হয়ত আরও অনেকের আছে; হয়ত শতকরা নিরানব্বই জনেরই আছে, আশ্চর্য্য নহে! যে কয়জন লোক এখনও সংক্রমণমুক্ত আছে, ১৯৪৮ সালের বাকী কয়মাস গত হইলে দেখা যাইবে তাহাদের ব্যাপ্টিজমও সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজী পৃথিবীতে একজনই আছেন, দুইজন গান্ধীর সংবাদ ত শুনি নাই তবে সুভাষচন্দ্রের মত অসঙ্কোচে অকুণ্ঠকণ্ঠে বৃটিশ-বিদ্বেষ ব্যক্ত করিতে আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া আমি অন্ততঃ মনে করিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, তাঁহারা বৃটিশের নীতির বিদ্বেষী, কিন্তু বৃটিশকে বিদ্বেষ করেন না। অনেকে ভদ্রতার আভরণ ফেলিতে ইচ্ছা করেন না, অন্তরে অথবা ভিতরে যাহাই কেন থাক্ না। বৃটিশ ছিল সুভাষের জাত শত্রু।

বৃটিশ বিনাশ বা বৃটিশের বিলোপ সাধন জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম পবিত্র ব্রত হিসাবে সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রু বিনাশে বল, ছল, কল ও কৌশল সমস্তই প্রযোজ্য, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসমাজে বিধান আছে। সুভাষ সেই বিধানানুযায়ী কাজ করিয়াছেন। যে অন্তর অহিংসামন্ত্র বরণ করিয়াছিল, শত্রু নাশ জন্য সেই অন্তরই জিঘাংসার রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়াছিলেন; যে মণিবন্ধে শান্তিকামী গান্ধীজীর শান্তিমন্ত্রপূত পবিত্র রাখী বাঁধিয়াছিলেন, সেই করে বৃটিশশোণিতলিপ্সু ক্ষুরধার খড়গ ধারণেও দ্বিধা করেন নাই। দ্রুপদ রাজার সভায় কৃত্রিম মীণাক্ষী বিদ্ধ করাই ভিক্ষুকবেশী ফাল্গুনীর লক্ষ্য ছিল, বৃটিশের দিল্লীর লাল কেল্লাও তেমনই ছিল, সুভাষের লক্ষ্য। বনবাসী, ফলমূলাহারী চীরধারী ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের দুরন্ত ক্ষাত্র তেজও ক্ষত্রিয় গর্ব্ব যেমন অজ্ঞাতবাসের গোপনীয়তা উপেক্ষা করিয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় পৃথিবীর রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রের মহোচ্চ শিক্ষা সত্ত্বেও তেমনই সুভাষের বৃটিশ-বিদ্বেষ প্রধূমিত হইয়া হিংস্রকরে কৃপাণ ধারণ করিয়া হিংসাদৃপ্ত চরণে দিল্লী অভিযানে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল।

আমার উক্তির কদর্থ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াই আমাকে সতর্ক হইতে হইতেছে। ব্যক্তিগতভাবে কোন বৃটিশ বা ইংরাজকে সুভাষচন্দ্র বসু বিদ্বেষের চোখে দেখিতেন, আশা করি একথা কেহ মনে করিবেন না। যে বৃটিশের শোষণে ভারত শোণিতশূন্য পাংশুবর্ণ, অন্তঃসারশূন্য অসার; অস্ত্রবলে, শস্ত্র তেজে যে বৃটিশ ভারতকে ক্লৈব্য দান করিয়াছে; যে বৃটিশ বিজিত ভারতবর্ষকে

আপন স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যে বলে নিরস্ত্র, ছলে ও কৌশলে অসহায় ও অনাহারে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে ; ভারতের সহিত যে বৃটিশের শাসন ও শোষণের সম্পর্কে খাদ্য ও খাদকের সম্প্রীতি, সেই বৃটিশ তাঁহার বিদ্বেষের বিষয়বস্তু। এই বৃটিশ কোনও মানুষ নহে ; এই বৃটিশ আদৌ হয়ত বৃটিশ জাতিরই কেহ নহে ; এই বৃটিশ সেই বৃটিশ, যাহার শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় ভারত কঙ্কালসার, নির্জীব মুমূর্ষু ও মৃতকল্প। এই বৃটিশ মূর্ত্ত আইনে অর্ডিন্যান্সে, টেরিফে, এক্সপোর্টে, ডিফেন্স রুল্‌সে। এই বৃটিশ একটা প্রক্রিয়া মাত্র। এ বৃটিশের দেহ বাস্তব না হইতে পারে, বরং ইহার বারবীয় দেহ হওয়াই সম্ভব। নারীর পতিত্ব যেমন, পুত্রের অন্তরে পিতৃত্ব যেমন, সন্তানের হৃদয়ে মাতৃত্বের আসন যেমন, ইহাও তেমন। পতিত্ব যদি কল্পনাতীত ভাবের স্বর্গরাজ্য না হইত, তাহা হইলে মদ্যপ, দুশ্চরিত্র ভণ্ড ও লম্পট পতিকেও সাধ্বী স্ত্রী কখনও পূজা করিত না, পদাঘাতে বিদূরিত করিত। কিন্তু ভাবরাজ্যের চিন্তাধারায় পতিত্ব এমনই এক পূজ্য আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে যে ব্যক্তিবিশেষ যেমনই কেন হোক না, পতিত্ব পূজার্হ। পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, পুত্রত্ব, প্রভুত্ব সব ঐ এক কথা। পুত্র, দুই অক্ষরে ঐ শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃবক্ষে মধুচক্রবিনির্গত মধুর মত অপত্যস্নেহ ক্ষরিয়া পড়িতে থাকে ; স্নেহে উদ্বেলিত মাতার হৃদয় সাগরের উচ্ছ্বসিত বারি বালুবেলায় আছাড় বিছাড় করিতে থাকে। এখানে সুপুত্র কুপুত্র, সুমাতা কুমাতা ভেদ নাই। মা ও সন্তান! সুভাষের বৃটিশও সেই বৃটিশত্ব, যাহা নিঃশেষে শোষণ করে ; শোষণ করিবার জন্য শাসন করে ; শাসন অবাধ ও অব্যাহত এবং অপ্রতিহত রাখিবার জন্য গোটা জাতিটাকে নিঃসহায়, নিঃস্ব নিরস্ত্র, ক্লীব ও পঙ্গু করিয়া রাখে ; নিরস্ত্র জনতার উপর কামান চালাইয়া শান্তিরক্ষা করে ; নির্বিবচারে নরহত্যা করিয়া বলে, বিদ্রোহ দমন করিতেছে! সুভাষের বৃটিশ সেই বৃটিশত্ব, যাহাতে ভারতবাসী তাহার স্বদেশ, তাহার মাতৃভূমি, তাঁহার জন্মভূমি ভারতবর্ষকে মা বলিয়া ডাকিলে, রক্তনেত্রে ভ্রূকুটি করে ; মাতৃপূজার মন্দিরকে রাজদ্রোহের আগার বোধে ধ্বংসের আদেশ দেয় ; দেশসেবককে, মাতৃপূজারীকে আমরণ কারাবাস করিতে হয়। সুভাষের বৃটিশ সেই বৃটিশত্ব, যাহা পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া মিথ্যার বেসাতি করে ; মিথ্যার বেসাতিতে অতীতের গৌরব বিকৃত করে ; ক্রীতদাসের কণ্ঠে স্বর্ণপদক ঝুলাইয়া দিয়া ক্রীতদাসের মহত্ত্ব প্রচার করে। সুভাষের বৃটিশ সেই বৃটিশত্ব—যাহা ভারতবাসীকে ভারতবাসী নামে পরিচিত করিতে শিক্ষা না দিয়া ভারতবাসীকে শত ভাগে, শত স্তরে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিতে উৎসাহিত করে।

ধর্ম্মের বিভাগ, সম্প্রদায়ের বিভাগ, জাতির বিভাগ, জাতির ভিতরে খণ্ড জাতির বিভাগ, বেড়ার গায়ে বেড়া, পাঁচীলের পরে পাঁচীল তুলিয়া দিয়া বৃটিশত্ব সাধুতার ভাণ করিয়া বলে, হায় হায়, ইহারা মিলিতে পারে না কেন! মেয়েলি কথায় বলা যায়, 'চোরকে বলে চুরী করিতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকিতে'। ভারতবাসীরা ঝগড়া করিয়া, মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে, বৃটিশ পরমানন্দে পুডিং ভক্ষণ করে। প্রশ্ন হইতে পারে বোধ হয় যে, এই বৃটিশত্ব (মূর্ত্তিহীন বিগ্রহখানি) কোথায় বসতি করে? উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বৃটিশের সওদাগরী অফিসে তাহার বাস, গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে তাহার নিবাস, থানায় তাহার বসতি, আদালতে তাহার আবাস! রেলে যাও, কলে যাও, কারখানায় যাও, ব্যাঙ্কে যাও, জাহাজে উঠ, হোটেলে খানা খাইতে যাও, দেখিবে, জগদীশ্বর যেমন সর্ব্বত্রবিরাজমান, বৃটিশত্বও তেমনই সর্ব্বত্র-পরিদৃশ্যমান। হিমগিরি হিমালয় যেমন ত্রিপথগা ভাগীরথীর উৎস, রাজধানী দিল্লীর লালকেল্লা তেমনই বৃটিশত্বের উৎস। সুভাষ সেই লালকেল্লার ধ্বংস কামনা করিয়াছিলেন। লালকেল্লার গোরা সৈন্য বা প্রাসাদাভ্যন্তরস্থ বড়লাট তাঁহার লক্ষ্য নহে; লক্ষ্য সেই বৃটিশত্ব।

বৃটিশ বিদ্বেষ-বিষের সূচনা কবে ও কোথায় এবং কেমন করিয়া হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। বাল্য ও কৈশোরে ইংরাজী ভাষা, ইংরাজের পোষাক-আষাক, ইংরাজের আচার ব্যবহারের উপর প্রীতির অভাব যে ছিল না, তাহা ত আমরা ভালই জানি। আমার স্নেহশালিনী পাঠিকা ও ধৈর্য্যশীল পাঠক সাবধান! একটি ছোটখাট ডিম্বাকৃতি এ্যাটম্ বম্ব নিক্ষেপ না করিলেই যে নয়! —ত্রুটী মার্জ্জনীয়। প্রেমময় যীশুর বংশধরগণ কোনরূপ 'ওয়ার্ণিং' না দিয়াই হিরোসিমা ও নাগশাকিকে আনবিক বম্বদ্বয় উপহার দিয়াছেন। আমি কিন্তু ততটা ধর্ম্মপ্রাণতা দাবী করি না, তাই অগ্রিম 'নোটিশ' দিয়া বোমা ছুঁড়িলাম। সুভাষ যখন মাষ্টার সুভাষচন্দ্র বোস, কটক স্কুলের ফার্স্ট ও ফোরমোস্ট 'বয়', তখন বৃটিশের রাজ্যের হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট জেনেরালের পদ বা চাকুরীটাই ছিল সুভাষের সার্থক-জীবনের 'টার্গেট'—চরম লক্ষ্য। হাইকোর্টের জজ নহে, ফেডারল কোর্টের জজও নহে (তখন হয়ত এই কোর্ট ছিল না) লাট সাহেবীও নহে, মাত্র এ্যাডভোকেট জেনারেল হইলেই সন্তুষ্ট! আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, যৌবনাগমের পূর্ব্বেই দৃষ্টিভঙ্গী উজান বহিতে সুরু করিয়াছিল। 'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণ রেণু বলি' শিরে ধারণ করিবার আকাঙ্ক্ষা চিত্ত ভরিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত বৃটিশ বিদ্বেষের কোনই সংস্রব নাই। তখন স্বদেশ প্রেমের

বাণ ডাকিয়াছে, দুকূল প্লাবিয়া পল্লী নগরী প্রান্তর কান্তার ভাসিয়া গিয়াছে ; সে পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া কে না ধন্য হইয়াছে? সে উত্তাল উন্মাদ প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধতা করিতে গিয়া ঐরাবতও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, বন্যার জল, সাগরের বারি সাগরে ফিরিয়া গিয়াছে, পলি পড়িয়া আছে। পলিও স্বাদেশিকতার স্মৃতিপূত, পবিত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু বিদ্বেষমুক্ত—বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নাই। নদীর পলি-মাটির মতই কোমল মসৃণ, উর্ব্বর ও মৃদু-সুরভিত। প্রেসিডেন্সি কলেজের যে ঘটনাটি 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্রের নাম সংযুক্ত হইয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সেই ঘটনার সহিতও বৃটিশ বিদ্বেষের সংস্পর্শ নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক-ধর্ষণের সহিত সুভাষের সম্পর্ক কতটুকু বা কতখানি ছিল অথবা আদৌ ছিল কি-না, পরে ও প্রবন্ধান্তরে আমি তাহা সঙ্গী সাথীর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরাকরণ করিবার বাসনা পোষণ করি। ওটেন-নাট্যের নায়ক যিনিই কেন হৌন না, নাটকের একমাত্র 'মর্য্যাল' ছিল, অশিষ্টের শাসন। অশিষ্ট ছাত্রের প্রতি শিক্ষক যে ঔষধ প্রয়োগ করেন, অতীব দুর্জ্জন শিক্ষকের উদ্দেশ্যে তাহাই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। তবে ব্যবস্থা যে নীতিশাস্ত্রবিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি : এই পৃথিবী কি কোন নীতিশাস্ত্রের পাতা রেল লাইনের উপর দিয়া হড় হড় গড় গড় শব্দে গড়াইয়া চলে? আমার ত তাহা মনে হয় না। দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকার, নীতির ন্যায় ও দুর্নীতির অন্যায়—পৃথিবীময় ইহাই শাশ্বত ও সনাতন! সে যাহাই হৌক, বিদ্বেষের সূচনা তখনও হয় নাই। তবে উই লাগিয়াছিল। আমার ভাঙ্গা ঘরের তাঁলের কড়িখানি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অক্ষুন্ন অটুটই ত দেখিতাম হঠাৎ যেদিন ভাঙ্গিয়া পড়িল দেখিলাম, অলক্ষ্যে উই পোকা সেখানিকে নিঃশেষে জলপান করিয়াছে।

বৃটিশ-জাতির পুরুষ বা নারী আসিয়া ঘর ঝাড়ু দেয়, জামা কাপড় কাচে, জুতা বুরুষ করে দেখিয়া সুভাষের বড় আনন্দ। অন্তরে অসুখের সূচনা হইয়াছিল—তাহার পরিচয় বিলাত হইতে লিখিত (কোন বন্ধুকে) একখানি পত্রের একটি ছত্রে তাহা অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায়। "ইংরাজ আমার জুতা সাফ করিতেছে, যখনই দেখি আমার আনন্দ হয়।" আমাদের ভারতবর্ষে আমরা বৃটিশের বুট লেহন করিতে বাধ্য! এ বড় দুঃখ।

বৃটিশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ হওয়ার কথা জানা যায় সেইদিন, যেদিন আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, শিক্ষানবিশীর সূচনাতেই—ঢাকী সুদ্ধ

বিসর্জ্জন—বোধনে বিজয়া হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটি এইখানে বলিব। ঘটনা ক্ষুদ্র হইলেও পরিণতি বিরাট। বটের বীজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, কিন্তু বট বিটপীকুলশ্রেষ্ঠ! কিন্তু ঘটনাটি বলিবার পূর্ব্বে আমার সুধীরা পাঠিকা ও সুধী পাঠকের 'মুখ বন্ধ' করা আবশ্যক।

আমি শুনিয়াছি (এবং দেখিয়াছি) সুভাষচন্দ্রের জীবন-কথা বহুজন বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। যাহারা এই প্রয়োজনীয় কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বহু বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিও আছেন, আবার অনভিজ্ঞ ভাগ্যান্বেষীও থাকিতে পারেন, আমি জানি না। এমন একটা "বিষয়" পাইলে কাহার না হাত সুড় সুড় করে? পরাধীন দেশের, পরপদানত জাতির মধ্য হইতে এমন এক শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন বীর পুরুষের উদ্ভব হইতে দেখিলে লেখক-সমাজের হস্ত কণ্ডূয়তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ত বটেই, যাহাদের 'কোন কালে ছিল না চাষ, ধানকে বলে দুর্ব্বোঘাস'-পর্য্যন্ত বিদ্যা, তাহারাও যদ্যপি 'কাস্তে ভাঙ্গিয়া' লেখনী গড়াইয়া ফেলে, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। সেক্সপীয়ারের কল্পিত চরিত্রাবলী অবলম্বনে শত ব্যক্তি শত প্রবন্ধ রচনা করিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত নরনারীর কত রকম ব্যাখ্যা কত জন করিল; রবিবাবুর কবিতার কত ভাষ্যই ত বাহির হইতেছে! আর এমন মানুষের জ্বলন্ত চিত্র অবলোকনে কাহার ভাবসাগরে না আলোড়ন হয়! মানুষটিও আবার দূরের মানুষ নহে। মানুষটি আমার ঘরের পাশে জন্মিয়াছে, আমার পাশের ঘরেই তাহার বসতি ছিল। তাহাকে সকলেই দেখিয়াছে। যে লোক চাক্ষুষ দেখে নাই, সে'ও তাহার ছবি দেখিয়াছে; অহরহ তাহার কথা শুনিয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তা হাবভাব, চালচলন, আচার ব্যবহার, সমস্তই হয় চোখে দেখা, না হয় কাণে শোনা। আমি যে ভাষায় কথা কহি, সেই তাহার ভাষা; আমার ভাব ও অভাব তাহার ভাব ও অভাবের সহিত এক সূত্রে আবদ্ধ; আমার সুখদুঃখে তাহার সুখদুঃখ ওতঃপ্রোত বিজড়িত। সেই প্রিয় পরিচিত লোকটি একদিন আমাকে ভাই, আমার মা'কে মা বলিয়া ডাকিত, আমার ভগ্নীকে ভগ্নী বলিয়া আহ্বান দিত, সেই লোকটি! আমার জন্মভূমি, তাহার জন্মভূমি। আমার ভারত, তাহার ভারত। আমার জন্মভূমির দুঃখে তাহার নয়নে দরবিগলিতধারা। আমার ভারতের বন্ধন মোচনের জন্য সারাজীবন সে দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে; সারাজীবন কারাবাস করে। দারিদ্র্যকে মাথার মণি করিয়াছে; দৈন্য তাহার চিরসাথী। সম্পদকে হেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছে;

বিপদ তাহার পথের পথিক। দেশকে ভালবাসিয়াছিল, দেশবাসীকে ভাল-বাসিয়াছিল বলিয়াই না সে সর্ব্বত্যাগী! দেশের দুঃখ, দেশবাসীর দুর্দ্দশা তাহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়াছিল বলিয়াই না মরণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর পথে গমন করিয়াছিল? এ সেই লোক! ভক্তি গদগদ-কণ্ঠে সে 'মা' বলিয়া ডাকিত, মা, জননী জন্মভূমি আহ্বানে সাড়া দিতেন কিনা জানি না, তাহার দেশের লোক চক্ষুর সম্মুখে তাহার সেই জীর্ণবাসা, জীর্ণদেহা, হৃতসর্ব্বস্বা, মলিনাননা জননী জন্মভূমিকে দেখিতে পাইত। মনে হইত তাহার কণ্ঠের মাতৃনামই মুর্ত্তিধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা। যেদিন তাহার আহ্বান আসিল সমগ্র ভারতবর্ষ অবিচলিত নিষ্ঠাভরে দ্বিধাসঙ্কোচহীন পদ বিক্ষেপে তাহাকে অনুসরণ করিল। একদিকে ভারতবর্ষ, অন্যদিকে বৃটিশ সেদিন যে অভিনব দৃশ্য দেখিল, তাহা শুধু অভাবনীয় নহে, অবিস্মরণীয়ও বটে! এই সেই লোক! সেদিন গান্ধীজিও আচ্ছন্ন, অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন। সেদিন শুধু ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়া এই মানুষটির পানে স্তব্ধ ও নির্ব্বাক নির্নিমেষে চাহিয়াছিল। সেই লোক একালে, এই পরাধীন দেশে, বিশ্বের অবজ্ঞাত দাসানুদাস জাতির মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়া যেদিন প্রভাতের অরুণরাগরঞ্জিত ভারতের বিস্ময় বিমুগ্ধ নরনারীর স্তম্ভিতস্তব্ধ নয়ন সমক্ষে বিরাট বিশাল হিমাচলসদৃশ মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইল, সেদিন সেই মূহূর্ত্তে শতাব্দীর পর শতাব্দীর স্তূপীকৃত বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা বিমুক্ত হইয়া মেবারের রাণা প্রতাপের বীর্য্য, মারহাট্টা ছত্রপতি শিবাজীর শৌর্য্য মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মত তেজোদ্দীপ্ত হইয়া নিখিল ভারতবর্ষের জাড্যকে যেন বেত্রাহত সুপ্ত সারমেয়ের মত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। মানুষটি কোথায় কেহ জানে না। জীবিত কিম্বা মৃত, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। তা পারে না সত্য; কিন্তু দিগন্ত হইতে দিগন্ত ব্যাপ্ত ভারতবর্ষের মানবদেহে যেখানে প্রাণের স্পন্দন আছে সেইখানে—সেই বক্ষে কাণ পাতিলে শুনা যাইবে, প্রতি স্পন্দন একই ভাষায় কথা কহিতেছে। ভাষা দুর্ব্বোধ্য নহে, বলিতেছে, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু—নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু। কোটী কোটী নরনারীর শুভেচ্ছা কি বৃথা হইতে পারে? কিন্তু যদি বৃথাই হয়, তাহাতেই বা কি! হোক বৃথা, হোক মিথ্যা। তথাপি এই ভারতবর্ষ উৎকর্ণ হইয়া তাহার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করিবে। সুদীর্ঘ দিবস ও বিনিদ্র রজনীর মাঝে মর্ম্মর ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের উত্থানপতন অনুভব করিবে। প্রোষিতভর্ত্তৃকার উপমা আমি দিব না; কিন্তু দিলেও অন্যায় হইত না। এমন অনন্ত আশা লইয়া কি কেহ কোন কালে কাহারও আসা-পথ চাহিয়াছে?

সে যাহাই হোক, বেত্রাঘাতে সুপ্তিভঙ্গে মানুষ দেখিল তাহাদের সেই পরম প্রিয়, পরম আদরের মানুষটি মূর্ত্তিমান গীতার মত বলিতেছে—

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত—

কোথায় ছিল স্কটলণ্ডের পর্ব্বতশিখরনিবাসী রবার্ট ব্রুস! কোথায় ছিল ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি! কোথায় ছিল জর্জ্জ ওয়াশিংটন! কোথায় ছিল রাশিয়ার ট্রট্স্কি লেনিন! কোথায় ছিল বাঙ্গালার বার ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া—যশোরের প্রতাপাদিত্য, কোথায় ছিল বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন রাজা নবাব সিরাজদ্দৌলা! বিভ্রান্ত ভারতবর্ষ সেই একটি মানুষের মধ্য দিয়া যেন শত শতবৎসরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস প্রত্যক্ষীভূত হইতে দেখিল। সুষুপ্ত হৃদয়ের তারে তারে ধীর মধুর করুণ গীতিস্বরে যে বাসনা ঝঙ্কৃত হইতেছিল মানুষ অকস্মাৎ দেখিল, সেই বাসনা জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হইয়া, পৌত্তলিকের আরাধনার প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ ধারণ করিয়া তাহার হৃদয় চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিরা মূর্ত্তিমান! বিশ্বাস করা কি সহজ, না বিশ্বাস করিতে সাহস হয়? আমরা যখন আয়র্লণ্ডের ডি ভেলেরার কাহিনী পাঠ করি, বুক দশ হাত হয়; ফরাসী বিপ্লব আমাদিগকে একটা অজানা অচেনা রাজ্যে টানিয়া লইয়া যায়; আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আর কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের মহারণের পার্থক্য আমাদের নিকট অত্যন্ত অল্প বলিয়া অনুভূত হয়; ১৮৫৭ সালের ভারতের ইতিহাসখানিকে আমরা অন্তরের ফুলজল নৈবেদ্য সহযোগে পূজা করি! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! কল্পলোকে বিচরণে চির-অভ্যস্ত ভারতবাসী অকস্মাৎ একদিন দেখিল, স্বপ্ন নহে, ভ্রম নহে, গল্প নহে, গাথা নহে, কাহিনী নহে, অথচ স্বপ্নের মোহমদিরামণ্ডিত, গল্পের মত গঠন-পারিপাট্য, গাথার মত মধুর, কাহিনীর মত চিত্তবিভ্রান্তকর এই প্রত্যক্ষ দর্শন!

বিংশ শতাব্দীতে, অস্ত্রশিক্ষাহীন, শস্ত্রবলহীন দুর্ব্বল ভারতবাসী ভারতেরই সীমাভ্যন্তরে বৃটিশের রাজ্যের ভিতরে, বিতাড়িত বৃটিশের রাজ্যখণ্ডে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিল! এমন লোকের জীবন বৃত্ত লিখিয়া ধন্য হওয়ার আগ্রহও যেমন স্বাভাবিক, পাঠক-পাঠিকার জনতা হওয়াও তেমনই স্বাভাবিক। যে গল্পে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের বর্ণনা আছে সে গল্প শুনিতে মৃতকল্পদেহে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়; আর সে গল্প লিখিতেও যেমন, শুনিতেও তেমন। সে গল্প যে গোটা জাতির সম্পদ; সে গল্প ত কাহারও ইজারা মহল হইতে পারে না। তাই শুনিয়াছি, অনেকেই লিখিয়াছেন, এখনও লিখিতেছেন এবং আশা করিতে পারি যে, পরেও লিখিবেন। তাঁহাদের সহিত আমার বিরোধ নাই

—বিরোধ হইতেও পারে না, কিন্তু আমার মুশকিল এই যে আমি কাহারও কোন লেখাই পড়ি নাই (মায় নিজের লেখা পর্য্যন্ত!)। সেই জন্য মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতেছি না ত? রোমন্থনে আমার জন্মগত ও প্রকৃতিগত অনভ্যাস, অপিচ নিদারুণ অরুচি আছে।

৬

এখন যে গল্পটি আমি বলিব, আমি জানি না অপর কেহ স্থানান্তরে—ক্ষেত্রান্তরে—অথবা পত্রান্তরে বলিয়াছেন কি-না! আমার সূত্র নিঃসন্দেহে যদি না নির্ভরযোগ্য হইত, তাহা হইলে তাহার উপরে সৌধ নির্ম্মাণের উদ্যোগ আমি করিতাম না। আর যদি এমনও হয় যে এই কাহিনী অন্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই বা দোষ কি! কত অসত্য, অমূলক, অলীক কাহিনী লোকের মুখে মুখে—যুগে—যুগে—শতাব্দীতে শতাব্দীতে সত্য বলিয়া বাজারে চলিয়া গেল, আর এমন একটি সত্য ঘটনা—এমন এক গৌরবময় কাহিনী ব্যক্তি-বিশেষ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত হইবে, (all rights reserved) সেই বা কেমন কথা গা?

পরম বিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ. সর্ব্বকৃৎ, শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান বিরোধী ছিলেন। বিধিমত উপায়ে বিরোধ নিরোধের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। আত্মীয়নিগ্রহ নিবারণকল্পে নিজ মান, মর্য্যাদা জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়াও যখন দেখিলেন যুদ্ধ অনিবার্য্য হইল, তখন কোন পক্ষাবলম্বন না করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া পৃথিবীতে যে মহদাদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন, কথকঠাকুর ও ঠাকরুণদিদিগণের কল্যাণে সে কথা পৃথিবীর বড় কেহ জানে না। জানা উচিত ছিল, জানিলে উপকার হইত; কিন্তু দুঃখ এই যে, জানে না। বরং জানে, তিনিই যত নষ্টের গুরু ঠাকুর; জ্ঞাতিবিরোধ ও মহাযুদ্ধ তাঁহার প্ররোচনাতেই ঘটিয়াছিল। আরও জানে, তিনি বাল্যে মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; যৌবনে যুবতী গোপাঙ্গনাগণের বসন চুরি করিয়া মানসে কাম চরিতার্থ করিতেন; পরনারী—তাহাও আবার একটি দু'টি নহে, আমেরিকান শাস্ত্রিদিগের মত পাইকারী দরে—পরনারী সম্ভোগলালসায় 'লেকের ধারে' চন্দ্রমাশালিনী নিশীথে, কদম্বের মূলে রাসলীলার আসর জমাইতেন। প্রচারের কি বিচিত্র মহামহিমা! ক্লেরিওনেট্ অথবা পিকলুজাতীয় কোনও বংশীতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সেই বাঁশী হস্তে তিনি গৃহস্থ বাড়ীর আনাচে

কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং কোকিল যেমন কুহুরবে প্রেমিক-প্রেমিকা চিত্ত আনচান করিয়া দেয়, বংশীধ্বনি করিয়া এই ভদ্রলোকটিও তাহাই করিতেন। তাহাতেও উদ্দেশ্য সফল না হইলে মার্কিণ মহাবীরগণের ন্যায় কণ্ট্রাক্টর বা সাপ্লায়ার—'পিম্প' নিয়োজিত করিতেন। কণ্ট্রাক্টরদিগের মধ্যে কুব্জা প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে সিদ্ধবাক্ কথক ঠাকুর ও ঠাকরুণদিদিগণ কৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনেও বিরত নহেন। 'মধুর মধুর বংশী বাজে, সেই ত বৃন্দাবন'—যেমন বংশী বাজিল—বনমাঝে কি মনোমাঝে কে-জানে, অমনি শ্রীকৃষ্ণের নদীরূপা মহিষী (বাপ্!) কালিন্দী যমুনা উজান বহিল; গোপাঙ্গনাগণ গৃহ-সংসার, পতি-পুত্র, শাশুড়ী-ননদ, মায় জটিলা-কুটিলা পর্য্যন্ত, ফেলিয়া-ঝেলিয়া কাহারও বা চোখে ধুলা বালি দিয়া, তনুমনঃধন, জীবন-যৌবন অর্থাৎ সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে ছুটিল। বংশীবাদকও তাহাই চাহেন; তাহাই অভিলাষ।

"কাচিদঞ্জলিনাগৃহাৎ তন্বী তাম্বুল-চর্ব্বিতম্
একাতদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ।"

আমার দুঃখ এই যে ইহার সুষ্ঠু বঙ্গানুবাদ দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। ছাপার অক্ষরও মসীবর্ণ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনায় অক্ষম অনুবাদ দিতেও নিবৃত্ত রহিলাম। আহা, কি অপরূপ চরিত্র চিত্রণ! ধন্য কথক ঠাকুর, তুমিই ধন্য, কি ছবিই গাঁথিয়া দিয়াছ।

তা থাক্ সে কথা। সুভাষ আই-সি-এস-স্বর্ণ সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন (ভালই করিয়াছিলেন) সকলেই জানেন; কিন্তু কেন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যক্ষ কারণ ছিল কি-না, থাকিলেও তাহা কি, অনেকে তাহা না জানিতেও পারেন এবং প্রচারের কল্যাণে বা কৌশলে ভগবান ভূত হইতেও পারেন। তাই সেই কথাটি আমাকে এখন বলিতেই হইবে। সেই কথাটি "প্রত্যক্ষ কারণও" বটে, বিদ্বেষ-বিষ-বৃক্ষের বীজ বপনও বটে! ইচ্ছা ছিল, চিঠিখানি প্রতিলিপি করিয়া মুদ্রিত করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রসম্বলিত কাগজখণ্ড বর্ত্তমানে লজ্জাবতী লতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কাগজের মত নির্জীব পদার্থেরও এমন স্পর্শ-কাতরতা দেখিতেছি যে তাহার অঙ্গস্পর্শে সঙ্কোচ অনতিক্রম্য হইয়া পড়িতেছে। এই চিঠিখানি সেই দিন লেখা—যেদিন একজন ভারতীয় বৃটিশ মহাসাম্রাজ্যের কৌস্তুভরত্নসমাদৃত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিশে হাসিমুখে ইস্তফা দিয়া আসিয়াছিল। পত্রখানি, কেমব্রিজ, ফিট্জ উইলিয়াম হল্ হইতে লিখিত হইয়াছিল।

"আজ কর্ত্তব্যের আহ্বানে I. C. S. চাকরী ইস্তফা দিয়াছি। আমাদের একটা বই পড়তে হোতো তাতে আছে "Indian Syce is dishonest." আমি ঐ sentence সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করি, কারণ ঐ sentence পড়ে পাঠকের মনে ধারণা হবে যেন ভারতবাসীরা dishonest কর্ত্তৃপক্ষ next editionএ কথাটা তুলে দেবেন বলেন। আমি বলি যে যখন জিনিষটা অন্যায়, আমি ঐ লাইন পড়িব না। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, না, তোমায় পড়তে হবে। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম "আমি তাহলে চাকুরী ছাড়িয়া দিলাম।"*

পত্রের ভাব ও ভাষা এতই স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও স্বতোস্বচ্ছ যে আমার "মল্লিনাথস্য টীকা" করিবার প্রয়োজনাভাব; কিন্তু ব্যাপারটা যখন হুঁকার জল নহে, তখন একটু বিশদ করিয়া বলিতে দোষই বা কি! ধুমপায়িদের অজানা থাকিতে পারে না যে হুঁকার জল মাত্র দু'দশ ফোঁটা বেশী হইলেও মুশ্‌কিল, ফস্ ফস্ শব্দ করিয়া মুখে জল উঠিতে থাকে; ধুমপানের আনন্দ ব্যহত হয়।

আই-সি-এস্ পরীক্ষা পাসের পরে হাতে কলমে শিক্ষার (প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিঙের ব্যবস্থা আর কি!) ব্যবস্থা আছে; তাহাতে কিছু কিছু পড়াশুনাও করিতে হয়। সেই ব্যবস্থার মধ্যে একখানি অবশ্যপাঠ্য 'প্রাইমার' গ্রন্থ আছে—গ্রন্থ না বলিয়া গীতা—সিভিল সার্ভিশ গীতা বলিলেই বোধ হয় প্রাইমারখানির সম্যক পরিচয় প্রকাশ ও মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। প্রাইমারের একাংশে ঐ ছত্রটি ছিল—Indian Syce is dishonest, ভারতীয় সহিস অসৎ। সিভিল

* চিঠিখানি সুভাষের সহাধ্যায়ী অন্তরঙ্গ ও সুহৃদ শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখিত। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনারম্ভের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যে কয় ব্যক্তির সহিত সুভাষ অবিমিশ্রভাবে বিজড়িত ছিলেন, মদীয় সুহৃত্তম চারুচন্দ্র তন্মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। কটকে পাশাপাশি বাড়ী, এক স্কুলে, একসঙ্গে, এক ক্লাশে অধ্যয়ন, পরীক্ষায় পাশাপাশি স্থান অধিকার ইহাই ছিল বাল্যে ও কৈশোরে এতদুভয়ের বিশেষত্ব। পরে সুভাষ I. C. S. ও চারু B. C. S। তাহার পরে? চারু আজও জেলা জজের আসনে বসিয়া কাহাকেও বা ফাঁসী দিতেছেন; ঘর সংসার করিয়া আমাদেরই মত—অথবা (কিম্বা না হয়) একটু উঁচুতে উঠিয়া দশের এক হইয়া আছেন; আর সুভাষ? ভারতাকাশে শত সূর্য্যের কিরণ বিকীর্ণ করিয়া সুভাষ-ভাস্কর কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে কে জানে। কিন্তু আকাশ এখনও—আজও প্রভাময়; বাতাস অত্যুত্তপ্ত; জনগণমন উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত। সুভাষের সুবাসে ভরা। সুভাষের প্রথম জীবনে চারু ছাড়া আরও দুইজনের সান্নিধ্যের সংবাদ পাওয়া যায়। জগন্নাথ দাশ চৌধুরী ও হেমন্তকুমার সরকার। জগন্নাথ উড়িষ্যাপ্রদেশের এক জমীদারবংশসম্ভূত উড়িয়া বালক; আর নদীয়ার চাঁদ হেমন্ত কংগ্রেসে আসিয়া সারাজীবন কারাবাস করিতেছে। "চালচিত্র" অধ্যায়ে আমি তাহাদের কথা বিশদভাবে বলিব।—লেখক।

সার্ভিস পাশ করিয়া যাহারা বৃটিশের সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে, সাম্রাজ্য স্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইবে, আকাশে ঈশ্বর, মর্ত্তে সিভিল সার্ভান্ট—কে অধিক শক্তিমান অনন্তকাল ধরিয়া যে তর্কের মীমাংসা কেহ করিতে পারিবে না, সেই অমিত-প্রতাপশালী, অসীম শক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে তুচ্ছ, নগণ্য ঘৃণ্য সহিসের কথাটা শুনাইতে হইল কেন? যে সিভিল সার্ভান্ট জেলার দণ্ডমুণ্ডের একছত্রাধিপতি হইবেন, বিভাগের অবিসম্বাদিত অধীশ্বর হইবেন, চাই কি লাটের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া কোটী কোটী মানব-শিশুর রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা হইবেন, তাঁহাকে দশ টাকা বেতনের অধম সহিসের গুণপনা হৃদয়ঙ্গম করাইবার কি কারণ থাকিতে পারে?

কারণ আছে বৈ কি। গুরুতর কারণ আছে। অকারণে কেহ কিছু করে না। কূটনীতিবিশারদ বৃটিশ অকারণে সহিসকে এতখানি প্রাধান্য দেয় নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যদেবতা যদি ভারতবাসীর প্রধান গুণটিই না জানিল, ভারত শাসন সে কিরূপে করিবে? ভাগ্য-নিয়ন্তা ভারতবর্ষে গিয়া দেখিবে, কি সহিস, কি বেহারা, কি বাবুর্চ্চি, কি বা কেরাণীবাবু, সকলেই পরম অনুগত, অতীব বিনীত; দেখিবে, সদাই তটস্থ, হুকুম তামিলে তৎপর; 'না' বলিতে জানে না; ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে; প্রভু বলিতে 'প্রাণ করে আন্‌চান'! দেখিয়া শুনিয়া পরম কারুণিক দয়াল যীশুপুত্র যদি বা 'প্রেম করিয়া বসে', তাই এই সতর্কবাণী! সাবধান, অসাধুদের সম্বন্ধে সাবধান। বিশ্বাস করিও না, আস্কারা দিও না; হে সাধু, সাবধান।

কথাটা পাঠকের মনে করাইয়া দেওয়া ভাল। সিভিল সার্ভিশের সৃষ্টি-কালে শ্বেতাতিরিক্ত কোন জাতির প্রবেশাধিকার কল্পনারও বহির্ভূত ছিল। কৃষ্ণ-কায় রেয়োভাটগণ যে এখানেও ভিড় জমাইতে আসিবে, সার্ভিসের সৃষ্টিকর্ত্তারা ইহা ভাবিতেও পারিতেন না। রেয়োভাটদিগকে এড়াইবার সমস্ত কল-কৌশল বিকল করিয়া দিয়া সনাতন পদ্ধতিতেই তাহারা শ্রাদ্ধবাড়ীর উঠানে হৈ চৈ লাগাইয়া দিয়াছে।

শ্লো-পয়জন ইহাকেই বলে। কত সহজে, কেমন নির্দ্দোষ-নিরপরাধ উপায়ে বিষাইয়া দেওয়া হইল! কোথায়ও একটু খিচ্ রহিল না; কোনস্থানে একটু দাগ পড়িল না; সুচারুভাবে কার্য্য সমাধা হইয়া গেল! সুভাষচন্দ্র বসু আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ভারতবাসীর চরিত্রের প্রতি এই কটু কটাক্ষ মানিয়া লইতে পারিলেন না। তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল। পরীক্ষকগণ তর্কে পরাস্ত

হইয়া স্বীকার করিলেন যে ঐ ছত্রটি অসঙ্গত এবং ভবিষ্যৎ সংস্করণে বাদ দেওয়া হইবে। কিন্তু সুভাষ বসু ধারে কারবারে রাজী নহেন। তিনি যুক্তি দিলেন, যাহা অসঙ্গত তাহা এখনই বিলুপ্ত হইবার যোগ্য। আজ নগদ, কাল ধার!

তা' কি করিয়া হয়? আবার তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং তর্কের অবসানে সুভাষচন্দ্রকে সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়া আসিয়া ঐ চিঠি লিখিতে হইল। আই-সি-এস্ নাট্যের উজ্জ্বল দৃশ্যের যবনিকা উঠিতে না উঠিতে সীনের দড়ি ছিঁড়িল। যবনিকা পতন হইল। বোধনে বিসর্জ্জন।

তা হৌক। কিন্তু বৃটিশের দুরভিসন্ধিমুলক প্রচারকার্য্যের বিরুদ্ধে যে কঠোর মনোভাব দৃঢ়ীভূত হইল, তাহা হ্রাস না পাইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। তাহারও কারণ স্পষ্ট এবং বহু।

ইতিহাস কদাচিৎ সত্যকথা বলে। সত্য গোপন ও সত্য বিকৃত করিবার অসামান্য নৈপুণ্য ইতিহাসেরই আছে। শুধু কি তাহাই? ক্রীতদাসী যেমন প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বস্ব—নারীত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়, বিজয়ীর পক্ষে নির্লজ্জ স্তাবকতা করিতে নির্লজ্জ ইতিহাসের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। ভারতে বৃটিশের দান অশেষ ও অসংখ্য, ইহাই আমরা শুনি; পৃথিবীতে এই ঢক্কাই নিনাদিত। কিন্তু বৃটিশের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূচনা যে ভারত বিজয়ের পরবর্ত্তী কালেই ঘটিয়াছে, এই সত্য যতই অরুচিকর হৌক, গোপন করিবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে! সালসার বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেখা যায় "কি ছিলাম" আর "কি হয়েছি"। ভারত অধিকারের পূর্ব্বে বৃটিশের অবস্থা ও ভারত অধিকারের পরে গ্রেট বৃটেনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সেই আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের উপমা সুপ্রয়োগের বাসনাই প্রবল হইবে। নদীর এক কুল ভাঙ্গে অপর কূল গড়িয়া উঠে—এই উপমাও সর্ব্বজনবিদিত। ভারতের যেদিন হইতে অবনতি, সেইদিন—সেইক্ষণ হইতে বৃটিশের উন্নতি। ভারত যত জীর্ণ, যত শীর্ণ, বৃটেন ততই শোভায় সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ। 'বিয়ের জল' বলিয়া একটি মেয়েলি কথা চলিত আছে। কথাটার গূঢ়ার্থ যাহাই হৌক, বঙ্গগৃহে বিনা সঙ্কোচে ও অবাধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃটিশের সৌভাগ্যবশে ভারতের সঙ্গে যে শুভদিনে, সুতহিবুকযোগে গাঁটছড়া বাঁধিতে পারিয়াছিল, তাহার পরমুহূর্ত্ত হইতেই "বিয়ের জলে" তাহার রূপ, তাহার শ্রী, তাহার বুদ্ধি, তাহার বিদ্যা, ধন, মান, মর্য্যাদা ভারে ভারে, শতধারে, বরষার বারিবৎ হইয়াছিল। পাঠিকারাণীর বিম্বাধরে হাস্যস্ফুরিত বিজুরী খেলিতেছে দেখিতেছি; প্রশ্নগুলি এই—কে বা বর, কে বা ক'নে।

বিবাহ হইল কোন মতে? দৈব? আসুর? পৈশাচ? হায়রে সেই ইতিহাস কেহ সহজ ও সরল ভাষায় লিখে না কেন? বৃটিশের ধনৈশ্বর্য্য, অভ্রভেদী দম্ভদর্প, অতুল্য রাজনীতিজ্ঞান, পৃথিবীর খবরদারীর মূলে যে এই ভারতবর্ষ নামক পরশ পাথরখণ্ড—এই অখণ্ডনীয় সত্য পৃথিবীময় সুপ্রচারিত হয় না কেন! অবশ্য জানে সবাই, শুনে সবাই, দেখেও সবাই; তথাপি সুপ্রচারের প্রয়োজন আছে। আর্কফলায় গাঁদাফুলবদ্ধ কথকঠাকুর হইতে থিয়েটারে সিনেমায় বৃটেনের "সেইদিন" আর "এইদিন" কথিত, অঙ্কিত, চিত্রিত ও প্রতিফলিত করিতে উদ্যোগী হইতে বিরত কেন, অনেক সময়ে আমি তাই ভাবি!

১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষে আবহাওয়া যখন অত্যুষ্ণ, নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর অনুকরণে তরুণ ভারত যখন কদমে কদমে অগ্রসর হইতেছে, তখন বৃটিশের নৌ-বাহিনী, সৈন্য-বাহিনীর, অস্ত্রশালায় বিদ্রোহ ঘটে। কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ—এক সঙ্গে "বৃটিশ বিনষ্ট হোক" রবে নিনাদিত। সহরের রাজপথে রক্তের নদী বহিয়া যাইতেছে; তরুণ ভারত রক্তস্নান করিয়া উল্লাসে মাতিয়াছে; মরণকে আমন্ত্রণ দিয়া আনিতে চাহিতেছে; খড়ের গাদায় আগুণ লাগিয়াছে, বায়ু অনুকুল, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত অগ্নি বিসর্পিত হইবার উপক্রম। নাড়ীজ্ঞানে বৃটিশ আনাড়ী নহে। ভারতের চির অচঞ্চল মানুষ চঞ্চল; বায়ু চঞ্চল, বুঝিবা জড় প্রকৃতিও চঞ্চল; ভারতে পুলিস চঞ্চল; কারখানায় কর্ম্মী চঞ্চল; চির অনুগত পদানত গুর্খাও চঞ্চল। ১৮৫৭ স্মৃতি চিরজাগ্রত। দম্ভভরে ও হাস্য সহকারে অবহেলা করিবার সাহস বৃটিশের আর হইল না। বিক্ষোভের তদন্ত স্বীকার করিল।

কালের কি বিচিত্র গতি। ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষ বৃটিশকে কুইট ইণ্ডিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছিল। মহাপাপ করিয়াছিল। ভারতবর্ষকে সেই মহাপাপের মহা-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। পঙ্গপালের অভিযানে শস্যক্ষেত্রের যে দশা ঘটে, বৃটিশের পাশবপ্রবৃত্তির অভিযানে ভারতেরও সেই দশাই ঘটিয়াছিল। বিহারের আইন সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া প্রবীণ সদস্য রামবিনোদ যেদিন সে কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, আইন সভার যদি চক্ষু থাকিত চক্ষুর জলে সে'ও ভাসিয়া যাইত। গুলী করিয়া মনে হইয়াছে যথেষ্ট হয় নাই; বিদ্রোহীর গৃহ অগ্নিদগ্ধ করিয়া মনে হইয়াছে, এমন বেশী কি হইল? ডিনামাইট দিয়া বস্তীর মৃত্তিকা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ পশু ও বৃটিশ মনুষ্যের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। বৃটিশ পশু নভেম্বর মাসের একুশে কলিকাতার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে রক্তের

নদী প্রবাহিত করিল; ২২এ নভেম্বর বৃটিশ-মনুষ্য লালদীঘির পথ মুক্ত করিয়া দিল। নেতাজীর আই-এন্-এদের কোর্ট মার্শালে ক্ষমা নাই বিঘোষিত করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত মামলা প্রত্যাহার করিল। বৃটিশ-পশু লাহোরে ও দিল্লীতে নাৎসী অনুকরণে বেল্‌সেন ক্যাম্প বসাইয়াছিল, বিদ্রোহীদের কামানের মুখে স্থাপিত করিয়া অনুপরমাণুতে পরিণত করিতেও পারিত, তাহা না করিয়া বৃটিশ-মনুষ্য বিদ্রোহের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। সাময়িক ইতিহাস অন্বেষণ করিলে বৃটিশের অন্তর্দ্বন্দ্বের বহু পরিচয় প্রত্যক্ষ করা যাইবে।

বোম্বাইয়ের নাবিক বিদ্রোহের পরে একটা তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল। বসিয়াছিল না বলিয়া, বসাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল বলাই বোধ হয় সঙ্গত হইবে। তদন্তের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে না দেওয়াই বোধকরি ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছাও পূর্ণ হইল না। তদন্তে প্রকাশ পাইল, নোঙরের একই দড়ি ভারতের কালা আদমী কালা হাতেও টানে, শ্বেতদ্বীপের শ্বেত হস্তও টানে। দড়ী এক, কাজ এক, উদ্দেশ্য এক—কিন্তু ন্যায়ের এমনই বিধান যে কালো যে বেতন পায়, শ্বেত পায় আটগুণ, কখনও দশ গুণ অধিক। জাহাজের একই চাকা কৃষ্ণ হস্তে ঘুরিলে যে মর্য্যাদা, শ্বেত হস্তধৃত হইলে মর্য্যাদায় আশমান জমিন ফারক। আরও কথা আছে। কালারা আসলে কম পাইলে কি হয়, ফাউ যাহা পায় তাহার যে তুলনা হয় না। পল্লীগ্রামে একটা কথা আছে, জ্বরে কি করে—পীলেয় মেরে দেয়, ইহাও তাহাই। ফাউ যাহা প্রাপ্তব্য ঘটে, তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি ত হয়ই, গরহজম, অপচার, অতিসার, এ সকলও নিত্য-নৈমিত্তিকের অন্তর্ভুক্ত। রাশনাম, পিতৃমাতৃনাম, জুতা, লাখি—অঙ্গের ভূষণ; "উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী" সম উঠিতে 'গোরু', বসিতে 'শূকর'! এই গূহ্য বৃত্তান্ত ১৯৪৫-৪৬এ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইবার পরে সকলে জানিতে পারিল বটে; কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালেই ব্যাভিচারের সুরু, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই! ঝকেঝকে তাঁবু, বিরাট বিশাল জাহাজ, তকৃতকে পোষাক, চক্‌চকে বোতাম, গালভরা পদ-পদবীর অন্তরালে পৈশাচিক বীভৎসতা ততদিন চলিয়াছে যতদিন ভারতবর্ষ বৃটিশের দাসত্ব-শৃঙ্খল সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছে। জালিওয়ানওলাবাগে মানুষ কামানের মুখে গো-সাপের মত বুকে হাঁটিয়াছে; কুইট ইণ্ডিয়ার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ধনপ্রাণ দিয়াছে; নারীর মান ইজ্জত লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়াছে, শ্মশানোপরি পিশাচের অট্টহাস্য শ্রবণ করিয়াছে। ধমণীর শীতল শোণিত উষ্ণ হইয়াছে, শিরায় শিরায় খরস্রোত বহিয়াছে। তথাপি

ভারতবর্ষ অবিচলিত হিমালয়ের মত অচল অটল গাম্ভীর্য্যভরে সাগরের পথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অহিংসকণ্ঠে আজও বলিতেছে, কুইট ইণ্ডিয়া! ভারত ছাড়।

সুভাষ এই অচল অটল অতিবৃদ্ধ হিমালয়ের উপর দিয়া প্রভঞ্জন বহাইয়া দিয়াছে। তাহার হিংসাতপ্ত উত্তেজনাপ্রবাহ ভারতবর্ষকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃটিশবিদ্বেষভরে সুভাষচন্দ্র বৃটিশের শক্তিমত্তার পীঠস্থান দিল্লীর লালকেল্লা অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই পাঁচশত বৎসরের পুরাতন জীর্ণ কেল্লাই আজ ভারতবর্ষের মানসনেত্রের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। সেই লালকেল্লার অভ্যন্তরে বিরাজিত বৃটিশত্বের ভিত্তি কাঁপিয়া গিয়াছে। আজিকার জয়হিন্দ ধ্বনিতে লালকেল্লার পাথর কাঁপে; পাথরের সঙ্গে বৃটিশত্ব কাঁপে।

৬

জার্ম্মেন গভর্ণমেণ্টের সহিত যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল তাহাকেই আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি বলিয়া মান্য করিতে পারি। চুক্তির কয়েকটি সর্ত্ত উল্লেখযোগ্য ত বটেই, স্মরণ যোগ্যও বটে।

সর্ত্তগুলি এইরূপ:

(১) জার্ম্মেন গভর্ণমেণ্ট সানন্দে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘকে ভারতীয়গণ-পরিচালিত ভারতবর্ষের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকার করিলেন।

(২) উভয় প্রতিষ্ঠানেরই একমাত্র উদ্দেশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন।

(৩) রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর যে যুদ্ধ, আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

(৪) জার্ম্মেন গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ সঙ্ঘকে মাসে মাসে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কর্জ্জ দিতে সম্মত হইয়াছেন। যুদ্ধান্তে এই অর্থ এক কালীন অথবা সুবিধামত কিস্তিতে পরিশোধনীয়।

সর্ত্তগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতির উপরই দুই গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র তখন হইতেই, সেই বিদেশে, সেই পররাষ্ট্রে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের কাঠামো প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যাঁহারা লিসটেনস্টেন এলিতে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের হেড কোয়াটার্স

দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, সেক্রেটেরিয়েট বটে! টিয়ারগার্টেনের সেই প্রাসাদ মধ্যে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে! শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, পর রাষ্ট্র, প্রচার বিভাগগুলির কর্ম্মব্যস্ততা বার্লিনের জার্ম্মেণ হেড কোয়ার্টাসের অপেক্ষা কম ছিল না! এইগৃহ হইতেই ভারতীয় প্রায় সমস্ত ভাষাতেই প্রচার কার্য্য পরিচালিত হইত; এখান হইতেই ইংরাজী ও জার্ম্মাণ ভাষায় "আজাদ হিন্দ" মাসিকপত্র প্রকাশিত হইত। আবার এই প্রাসাদই সৈনিক শিবির রূপে পরিচিত হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই প্রাসাদই লুক্সেমবার্গের রাষ্ট্র দূতাবাস ছিল।

আজাদ হিন্দ সেক্রেটারিয়েট নেতাজীর সৃষ্টি; তিনিই ইহার প্রধান পরিচালক। কৃষি গবেষণাগারে ঢুকিয়া দেখা গিয়াছে যে নেতাজী সেখানেও কর্ম্মে বিরত। শিল্প সংগঠনাগারেও নেতাজী। প্ল্যানিং—পরিকল্পনা বিভাগটি ত তাঁহার প্রাণ পুত্তলী। রেডিয়োয় কোন্ ভাষায় কোন দিন কোন বিষয় কথকতা হইবে তাহারও নির্দ্দেশ নেতাজী দিতেন। মাসিক পত্রের প্রবন্ধ নির্ব্বাচনেও নেতাজীর আগ্রহের অভাব ছিল না।

জার্ম্মেন জাতি অলস, কর্ম্মবিমুখ কিম্বা বিলাসী নহে। প্রত্যেকটি মিনিট তাহারা মহামূল্য জ্ঞান করে; অলসে সময়ক্ষেপ করা গোটা জাতিটাই পাপ বলিয়া মনে করে। এমন একটা কর্ম্মপ্রিয় কর্ম্মঠ জাতির নিকটও ভন মাঝোটা বিস্ময়কর মানুষ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। একটি মানুষ একাকী যে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ মনোযোগ দিতে পারেন কিরূপে ইহা ভাবিয়া ভন্ ট্রটের মত শীর্ষস্থানীয় কর্ম্মীও বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। ভন্ ট্রটের সহিত মাঝোটার বিশেষ সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। রেভারেণ্ড এণ্ডরুজ যেমন ভারতেবর্ষের স্বাধীনতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, ট্রট্ও তদ্রূপ। এণ্ডরুজও যথাশক্তি ভারতবর্ষের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ট্রটও তদ্রূপ। অধিকন্তু সুভাষচন্দ্রের সহিত ভন্ ট্রটের এক বিষয়ে আশ্চর্য্যজনক মতৈক্য ছিল। সুভাষচন্দ্র যেদিন আই-সি-এসী ত্যাগ করিয়া বোম্বায়ে পদার্পণ করিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 'হতাশা' লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তদবধি কায়মনে বিশ্বাস করিতেন যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ব্যতিরেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান সম্ভব নহে, ভন ট্রটও সমগ্র এসিয়া পরিভ্রমণানন্তর ঐ বিশ্বাসই অকুণ্ঠ-কণ্ঠে প্রচারিত করিতেন। যুদ্ধের শেষের দিকে ভন ট্রট কেন যে হিটলার বিরোধী দিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আজও জার্ম্মেণীর শিক্ষিত ও ভদ্র-লোকের নিকট

সমস্যা থাকিয়া গিয়াছে। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে হিটলারের প্রাণ নাশের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া ট্রটের ফাঁসী হয়। ভারতের স্বাধীনতা আজ যখন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, ভন ট্রট আজ জীবিত থাকিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

ফ্রান্সের বুকের উপর দিয়া হিটলার তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ বিজয় অভিযান পরিচালিত করিয়া ইয়োরোপের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কিরীটিনী সদৃশ ফ্রান্স অধিকার করিয়া কেন যে গ্রেট বৃটেনের উদ্দেশে তাঁহার দুর্ম্মদ বাহিনী চালিত করেন নাই, জার্ম্মাণীর নর নারীর নিকট তাহা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রেট বৃটেনকে ছাড়িয়া দিয়া কেন যে হিটলার রাসিয়ার উদ্দেশে ধাবিত হইলেন; এ কঠিন সমস্যারও সমাধান হয় নাই। কিন্তু সেইদিন হইতে হিটলারের বুদ্ধি বিবেচনা ও রণনীতির প্রতি জার্ম্মেনীর লোকের অবস্থা হ্রাস পাইতে সুরু করিয়াছিল। লোকে তখনই সঙ্গোপনে বলাবলি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই ভুলই হিটলারের পতন অনিবার্য্য করিবে। ভন ট্রটও এই কথা বলিতেন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমি হিটলারের সহিত নেতাজীর সাক্ষাতের কথা বলিয়াছি। সাক্ষাৎকারের সময়ে নেতাজী স্পষ্টভাষায় হিটলারকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য বহু সুখের ও সমৃদ্ধির কারণ হইয়াছে বলিয়া হিটলার স্বরচিত জীবন দর্শনে (মাইঁ কাম্প), লিখিয়াছেন, এখনও কি তিনি সেই মত পোষণ করেন ?*

হিটলার স্বীকার করেন যে তাঁহার মতের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তবে ইহাও স্বীকার করেন যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই তিনি ঐ কথাগুলি লিখিয়া ছিলেন। ইংলণ্ডকে তোয়াজ করিয়া তাহার বন্ধুত্ব লাভ করাই তখনকার দিনে জার্ম্মান রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এখন সে প্রয়োজন আর নাই। মাইঁ ক্যাম্পের পরবর্ত্তী সংস্করণ হইতে ঐ ছত্রগুলি বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু সে সুযোগ আর হইল না ; বোধ করি আর হইবেও না! একদিন হিটলারের মাইঁ ক্যাম্প পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় পুস্তক রূপে গণ্য হইত। বিক্রয়-তালিকায়ও দেখা গিয়াছে, মাত্র আর এক খানি পুস্তকের বিক্রয় সংখ্যা

* পৃথিবীর সকল দেশের চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই বৃটিশের অধীন ভারতের সুখ সমৃদ্ধির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাঠ করিয়া বিস্ময়ানুভব না করিয়া পারেন নাই। ভারতবর্ষের সুধী সমাজ ঐ মন্তব্য পাঠে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন ইহাও অত্যুক্তি নহে। মূলতঃ যে বৃটিশের নিধন কামনা সম্বল করিয়া হিটলারের রাষ্ট্র-নৈতিক অগ্রগতির সূচনা, মাইঁ কাম্পে সেই বৃটিশের সাম্রাজ্য নীতির প্রশস্তি, বিস্ময়ের বিষয় হইতেই পারে।

মাইঁ ক্যাম্পকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল। আজ আর মাইঁ ক্যাম্পের নামও শুনি না; আর যে তাহার সংস্করণের পর সংস্করণ বাহির হইবে তাহাও মনে হয় না।

জার্ম্মেন গভর্ণমেণ্টের সহিত সখ্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই সুভাষচন্দ্র সৈন্য শিক্ষা শিবিরটিকে আধুনিকতম শিক্ষাশিবিরে রূপান্তরিত করিলেন! তখন পর্য্যন্ত ৩,৫০০ সৈন্য এই শিবিরে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। জার্ম্মেনীতে pow অর্থাৎ প্রিজনার অফ ওয়ার—যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না এবং সেই সংখ্যার তুলনায় সাড়ে তিন হাজার আজাদী আশাতীত উন্মাদনা ও উত্তেজনার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ঐ সৈন্য শিক্ষা শিবিরের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে শিক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে যে শপথ গ্রহণ করিতে হইত, তাহাও ভারতীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতির ভিত্তির উপরে রচিত। সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও এইখানে লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে।

> ভারতবর্ষ ও ভারতের আটত্রিশ কোটী নর নারীর স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে সেই পবিত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি সুভাষচন্দ্র বসু জগদীশ্বরের নামে অঙ্গীকার করিতেছি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাহাতে যথাসম্ভব সহায়তা করিতে বিরত হইব না।

নেতাজীর আই-এন্-এ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজে ও তাঁহার আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টে জাতির কচ্ কচি ছিল না, ধর্ম্মের ভেদাভেদ ছিল না ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত সত্য। জার্ম্মেনীতেই এই সাম্যবাদ সর্ব্ব প্রথম সূচিত হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান শিখ ও খৃষ্টান একসঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। পাকশালার ভার ছিল মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত!

মেজর ক্রেপ ছিলেন এই শিবিরের অধ্যক্ষ। নেতাজীকে তিনি হিটলারের মত মান্য করিতেন এবং শিক্ষার্থিগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল পিতার তুল্য। জার্ম্মেন গভর্ণমেণ্ট স্বাধীন ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাকে "ধার" দিয়াছিলেন।

হিটলার সুভাষচন্দ্রের সহিত প্রতারণা করেন নাই। সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন না থাকিলে মেজর ক্রেপকে স্বপক্ষে পাইবার কোন সম্ভাবনাই সুভাষচন্দ্রের ছিল না। কারণ সুদক্ষ সমরশিক্ষক

বলিয়া যে কয় জনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, মেজর ক্রেপ তাঁহাদেরই একজন। হিটলার তাঁহাকেই আজাদ হিন্দ ফৌজে ঋণদান করিয়াছিলেন।

বার্লিনে আজাদ হিন্দ শিবিরাভ্যন্তরে সুভাষের মডেল রাষ্ট্র (গভর্ণমেণ্ট) যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, যখন রাষ্ট্রীয় বিভাগগুলি পূর্ণোদ্যমে কর্ম্ম করিতেছে, ঠিক সেই সময়েই সুভাষচন্দ্রকে বার্লিন ত্যাগ করিতে হইল। বার্লিনে অবস্থিত জাপানের রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওসিমার সহিত সুভাষচন্দ্রের সৌহার্দ্দ্য ছিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে বৃটিশের ভাগ্য বিপর্যয়ের সহিত উভয়েরই সমান আগ্রহ ছিল, সেই জন্য জেনারেল ওসিমার আজাদ হিন্দ শিবিরে আনাগোনা ক্রমশই ঘন ঘন হইতে লাগিল।

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আজাদ হিন্দ শিবিরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, সুভাষচন্দ্র রাসিয়ার রণাঙ্গন পরিদর্শনে যাইতেছেন এবং লেনিনগ্রাদ হইতে রোস্তভ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল রণাঙ্গন পরিভ্রমণান্তর বার্লিনে প্রত্যাগমন করিতে তাঁহার তিন চার মাস সময় লাগিতেও পারে। বিদায়ের প্রাক্কালে বিশ্বস্ত অনুচর ও সুহৃদ্বর্গের নিকট বিদায় লইবার সময়ে সুভাষচন্দ্রও সেই কথাই বলিয়া গেলেন, রাষ্ট্রের কার্য্য যেরূপ চলিতেছে সেইরূপই চলিবে, সৈন্য সংগ্রহ ও শিক্ষা যেমন অগ্রসর হইতেছে তেমনই হইবে।—"অদূর ভবিষ্যতে যে বিষম গুরু দায়িত্ব ভার গ্রহণের আহ্বান আসিতেছে আমরা যেন তাহা গ্রহণের যোগ্য হইয়া থাকিতে পারি। আমরা অপ্রস্তুত বলিয়া সুযোগ যেন আমাদের হাত ছাড়া না হয়।"

চার মাস পরে বার্লিনের আজাদ হিন্দ শিবির সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানিতে পারিল যে, নেতাজী বৃটিশ পরিত্যক্ত সিঙ্গাপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। পরে আরও জানা গেল যে, রাসিয়ান রণাঙ্গনে সুভাষচন্দ্র আদৌ যান নাই। বার্লিন হইতে বিমানে বোঁর্দো যান; বোঁর্দো হইতে আবিদ হাসান ও স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সবমেরিনে দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন।

বার্লিন পরিত্যাগ করিবার সময় সুভাষচন্দ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ সহচরগণের নিকট দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই—ইহাই রাষ্ট্রনীতি। জাপানের রাষ্ট্রদূতের সহিত আলোচনায় রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ সুভাষচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, দুর্ভাগিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের নূতনতম ও গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা বার্লিনে রাষ্ট্র স্থাপনের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার কার্য্যের ফলেই জীবনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হইতে পারে। কিন্তু বার্লিনে তখন সে গোপন

কথা প্রকাশের ফল সন্দেহজনক হইতেও পারে। বার্লিনের রাষ্ট্রনায়কগণ বাধা দিতেও পারেন। সুতরাং দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার নামোচ্চারণও করা হয় নাই। রাষ্ট্রনীতিতে গোপনীয়তার প্রয়োজন ছিল।

১৯৪৩ সালের ২১ এ অক্টোবর স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। দুইশত বৎসরের পরাধীনতার পরে ভারতবর্ষ নূতন দৃশ্য দেখিল; এক নূতন সঙ্গীত শুনিল; এক নূতন প্রেরণায় জাগিয়া উঠিয়া জয়ধ্বনি করিয়া গাহিল—জয় হিন্দ্।

৭

আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পরদিনই বৃটিশ ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিঘোষিত হইয়াছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রথমে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনের উদ্দেশে যাত্রা করিল এবং ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে রেঙ্গুন সহরে গভর্ণমেণ্টের একটি দপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হইল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ওয়ার-লর্ড হইলেও বেসামরিক গভর্ণমেণ্টেরও তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা। সমর-বিভাগ এবং বে-সামরিক বিভাগ দুই সুবৃহৎ বিভাগের কার্য্য পরিচালনার ভার তাঁহারই ওপর। এই সময়ে তিনি যে অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা বিরল কি-না তাহা অভ্রান্তরূপে বলিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে জাপানীরা তাঁহার কর্ম্ম পরিচালনায় ও পরিকল্পনার সুসম্বদ্ধতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে সমর শিবিরে সৈন্যবাহিনীর অগ্রগমণের আদেশ দিয়াই, দেখা গিয়াছে, বেসামরিক বিভাগের কারেন্সী অফিসে নেতাজী সশরীরে উপস্থিত হইয়াছেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই নেতাজী জানাইয়া দিয়াছিলেন যে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টে জাপানী মুদ্রা চলিতে দেওয়া হইবে না। জাপানের সহিত যত সৌহার্দ্দ্যই থাক্, রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় আজাদ হিন্দ সরকারের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। রাষ্ট্রে মুদ্রার একটি বিশেষ প্রভাব আছে। যাহার মুদ্রা তাহারই প্রাধান্য। সেই জন্যই নেতাজী নিজস্ব কারেন্সী প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ নেতাজীর পরিকল্পনা প্রথম অংশে ব্যাহত হইয়াছিল। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের কাগজ-মুদ্রা ছাপাইয়া আসিতে বিলম্ব হয়। নেতাজী নিরুপায় দেখিয়াই নির্দ্দেশ দেন, সাময়িক ভাবে জাপানী মুদ্রা

চলিতে থাকুক, আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের মুদ্রা চালু হইবামাত্র সমুদয় জাপানী মুদ্রা প্রত্যাহৃত হইবে। তাহাই হইয়াছিল।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্ক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের অনেকগুলি বড় বড় সহরে এবং ভারতের স্বাধীন মণিপুর অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের যে স্থান, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টে আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কেরও স্থান তদ্রূপ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

আজাদ হিন্দ সরকারে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল এ কথা আজ আর পৃথিবীর লোকের অবিদিত নাই। কিন্তু মানুষে মানুষে, অফিসারে অফিসারে, কর্ম্মীতে কর্ম্মীতে যে বিভেদ সকল দেশে সকল সুসভ্য গভর্ণমেণ্টেই প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়, নেতাজী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টে তাহারও মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের সৈন্য সামন্ত সমস্তই প্রাক্তন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের লোক। পূর্ব্বতন শিক্ষানুসারে সুপ্রিম-কমাণ্ডের খানাঘর, তন্নিম্নস্থ অফিসারের ভোজন কক্ষ এইরূপ উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত ধাপে ধাপে দফায় দফায় খানা-ঘর ও খানার তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীময় যাহা চলিতেছে এখানেও তাহাই চলিবে। এমন সময়ে নেতাজী স্বাক্ষরিত এক নির্দ্দেশ-নামা বাহির হইয়া তাঁহাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিল। শুধু কি তাঁহারাই বিস্মিত হইলেন? না। উচ্চ নীচ, বিজ্ঞ অজ্ঞ, পণ্ডিত মুর্খ, অফিসার কুলী, যে যেখানে ছিল, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

নেতাজীর নির্দ্দেশ এই যে আজাদ হিন্দ সরকার দরিদ্র ভারতবর্ষীয়দের রাষ্ট্র। তাঁহাদের ধন সম্পদ নাই, শোষণ করিবার মত জমিদারী নাই, শোষণ করিবার প্রবৃত্তিও নাই। ভারতবর্ষের মুক্তি কামনাই এই সরকারের মূলধন! ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সর্বাধিনায়ক হইতে পদাতিক পর্য্যন্ত সকলেরই কাম্য। এই গভর্ণমেণ্টে সকলেই এক। সকলের বেশ বাস হইতে খাদ্য-সামগ্রী সমস্তই এক হইতে বাধ্য। অতঃপর এই সকল বিষয়ে বিন্দুমাত্র পার্থক্যও থাকিবে না।

কাগজে কলমে অনেক ভাল ভাল কথা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা কিরূপ ভাবে পালিত বা রক্ষিত হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাহারা বৃটিশ রাজত্বে, বৃটিশ ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে এ সকল বিষয়ে তাহাদের প্রচুর

অভিজ্ঞতাও আছে। নেতাজীরও ইহা অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। পাছে সেই পূর্ব্ব সংস্কার এখানেও কার্য্যকর হইয়া উঠে, নেতাজী স্বয়ং সাধারণ রন্ধন-শালার খাদ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নেতাজীকে সাধারণ ভোজনাগারে সাধারণ রন্ধন শালায় প্রস্তুত খাদ্য সাধারণের সহিত বসিয়া খাইতে দেখিয়া অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। যদ্যপি কোনদিন কোন কারণে বাস-গৃহ বা শিবির ত্যাগ করিয়া ভোজনাগারে আসিয়া আহার্য্য গ্রহণের সময় করিতে না পারিতেন, গৃহে অথবা শিবিরে তাঁহার আহার্য্য প্রেরিত হইত, খাদ্য তালিকায় যে কয় পদই থাক্, নেতাজীকে বিশ্বাস করাইতে হইত যে, সাধারণ লোকও সেই কয় পদ খাদ্য পাইয়াছে, তবে নেতাজী খাদ্য মুখে তুলিতেন।

একস্থান হইতে শিবির অন্য স্থানে যাইতেছে অথবা একদল কর্ম্মচারীর বদলীর আদেশ হইয়াছে তাহারা ট্রেণে উঠিবে কিংবা নৌকায় চড়িবে, অকস্মাৎ অদ্ভুত দৃশ্য! নেতাজী সেইখানে স্বয়ং উপস্থিত। প্রত্যেকটি লোকের শারীরিক কুশল প্রশ্ন করিয়া তাহার কিট্ ব্যাগ পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে কে কবে কোন্ সর্ব্বাধিনায়ককে দেখিয়াছে? কিন্তু নেতাজীর নিকট এই কাজটি পবিত্রতম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইত। নেতাজী বলিতেন, আমিও আমার মাতৃভূমির উদ্ধার করিতে চলিয়াছি। ঐ মাইনার-স্যাপার যে, সেও তাহার মাতৃভূমির উদ্ধার করিতে চলিয়াছে। ওর ও আমার উদ্দেশ্যে যখন কোন বিভিন্নতাই নাই, তখন পোষাকে বা আহারেই বা পার্থক্য থাকিবে কেন?

কর্ম্মকারকদের ডাকিয়া গোপনে বলিতেন, ভাই, সকলকে সমান দেখিও।

একদিনকার একটি ঘটনা বলি। সে এক হাসপাতালের ঘটনা। পূর্ব্বে হাসপাতালটি বে-সরকারী পরিচালনায় পরিচালিত হইত। সম্প্রতি আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ইহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বাধিনায়ক পরিদর্শনে আসিয়াছেন, সকলেই তটস্থ। যাঁহারা সর্ব্বাধিনায়কের সঙ্গে থাকিয়া হাসপাতাল দেখাইয়া বেড়াইতেছিলেন তাঁহারা প্রধান গৃহটি পুঙ্খানুরূপে দেখাইয়াছিলেন এবং নেতাজীও সুব্যবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া মোটরে উঠিতেছিলেন, হঠাৎ পার্শ্বের একটা বাড়ীর বারান্দায় কয়েকজন শুশ্রূষাকারিণীকে দেখিয়া নেতাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ও বাড়ীটা কিসের?- শুনিলেন, আহত ও রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ায় ঐ বাড়ীটিতেও হাসপাতাল সম্প্রসারিত হইয়াছে। শুনিয়াই তিনি মোটর হইতে নামিয়া সেইদিকে চলিলেন। অধ্যক্ষ, মেট্রন,

ডাক্তার প্রভৃতিকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত দেখিয়া নেতাজী মৃদু হাস্যে কহিলেন, আপনাদের আর কষ্ট করিয়া আসিতে হইবে না। অমি একলাই যাইতেছি।

কথাগুলি মৃদুকণ্ঠে এবং হাসিয়া বলিলেও আদেশের আকারেই বাহির হইয়া আসিল এবং অবজ্ঞা করিবার সাহস কাহারই আর হইল না। নেতাজী একাই গেলেন।

ক্ষুদ্র গৃহ, মাত্র পাঁচ সাতটি বই রোগী নাই অথচ অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল তথাপি নেতাজী বাহির হইলেন না দেখিয়া অধ্যক্ষ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উপস্থিত হইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে চক্ষুঃস্থির হইবারই কথা!

অধ্যক্ষ নিকটে আসিতে নেতাজী বলিলেন, এই লোকটি এক ঘণ্টা যাবত জল জল করিয়া কাঁদিতেছিল, কেহ তাহার পানে ফিরিয়াও চাহে নাই। এ ঘরে জলও ছিল না, আমি ঐ ওদিকের ঘর হইতে জল আনিয়া দু'বার দিয়াছি, তবুও ওর তৃষ্ণা মিটে নাই; এই দেখুন, তৃতীয় বার লোকটি কতখানি জল খাইয়া ফেলিল, দেখুন।

অধ্যক্ষ সাধারণ ভাবে কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তার পূর্ব্বেই নেতাজী অন্যের অবোধ্য ভাষায় বলিলেন, আমার ইচ্ছা করে, আমিই ইহাদের সেবা করি।

বলিতে বলিতে নেতাজীর চক্ষু হইতে এক বিন্দু বারি অধ্যক্ষের চোখের সম্মুখেই রোগীর হাতের উপরে ঝরিয়া পড়িল।

লোকটা তিন গ্লাস জল খাইয়া তৃপ্ত হইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর মরণেও আমার দুঃখ নাই।

নেতাজী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, মরণের কথা কেন ভাই? তুমি সারিয়া উঠিয়া যে কাজ বাকী রহিয়াছে, তাহাই করিবে।

লোকটি চক্ষু মুদিয়া বলিয়া উঠিল, বাঁচিব না তাহা আমি জানি; তবে দুঃখও আর নাই। নেতাজী নিজের হাতে জল দিয়াছেন, এই ত আমার স্বর্গ।

নেতাজী আরও কিছুক্ষণ বসিয়া তাহার সহিত আরও কয়েকটি কথা বলিয়া, উঠিবার সময় বলিলেন, ভাই আশীর্ব্বাদ করি সুস্থ হও, ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখিয়া মরিতে হয়—মরিও।

লোকটি অবিচলিত বিশ্বাস ভরে কহিল, নেতাজীর মুখেই আমি স্বাধীন ভারতের প্রফুল্লতার ছাপ দেখিয়াছি। এখন মরিলেও দুঃখ হইবে না।

নেতাজী বাহিরে আসিয়া অধ্যক্ষকে বলিলেন, হতভাগাদের একটু দেখিবেন।

অধ্যক্ষ আবার কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, নেতাজী বলিলেন, উহারা জাপানীর হাতে প্রিজনার অফ ওয়ার ছিল, তখন যত কষ্টই থাক্, অভিযোগ করিবার কিছুই ছিল না। কাহার বিরুদ্ধেই বা অভিযোগ করিবে ? তখন যত কষ্টই থাক্, মুখ বুঝিয়া সহ্য করিতেই হইত—মনে করিত কোন কষ্টই ওদের ছিল না। পরে মাতৃভূমির আহ্বানে প্রাণ দিতে আসিয়াছে, প্রাণ দিবে সে ত জানি ; ও-ও মরিবে আমরাও মরিব। মরিবার সময় স্নেহযত্নের আশা কেহই করে না, কিন্তু রোগে একটুখানি শুশ্রূষার কামনা থাকে বৈ কি !

আবার চোখে জল দেখা দিল, অধ্যক্ষ কোন কথাই আর বলিতে পারিলেন না, নেতাজী মোটরে উঠিতেই গাড়ী ছুটিল।

পরের দিন সহস্র রকমের কর্ম্মে লিপ্ত হইলেও সেই রোগীটির কথা নেতাজীর মন হইতে লুপ্ত হয় নাই। অপরাহ্ণের দিকে শরীর রক্ষীকে সংবাদ আনিতে পাঠাইলেন, সংবাদ আসিল, আজ প্রত্যূষে তাহার জীবনাবসান হইয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নেতাজী কোন কথা বলিলেন না। কোন কাজেও হাত দিলেন না। তারপর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, বলিলেন, আহা, প্রত্যূষে যদি সেখানে যাইতাম !

কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া সংবাদবাহী শরীর রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি মাটী দেওয়া হইয়া গিয়াছে ?

শরীররক্ষী কহিলেন, হাঁ।

নেতাজী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, কোথায় সমাধিস্থ করিয়াছে খবর লইও, আমি তাহার সমাধি পার্শ্বে উপাসনা করিয়া আসিব।

নেতাজীর চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা গোপন করিতেই তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

আশ্চর্য্য নহে যে, পিতা পুত্রকে যেমন, মা সন্তানকে যেমন, গুরু শিষ্যকে যেমন ভালবাসেন, পুত্র পিতাকে, সন্তান জননীকে, শিষ্য গুরুকে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, বন্ধু বন্ধুকে, সখী সখীকে, প্রণয়ী প্রণয়িনীকে যেরূপ প্রীতি করিয়া থাকেন, আজাদ হিন্দ সরকারের মানুষ মানুষী নেতাজীকে ভালবাসিয়া, ভক্তি করিয়া, প্রীতির প্রেমসিংহাসনে বসাইয়া অন্তরের কোমল ও উচ্চ বৃত্তি নিচয়ের পরিতৃপ্তি বিধান করিয়াছিল। এক নেতাজীর মধ্যেই তাহারা পূজার, প্রেমের ও প্রীতির অবদানের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইয়াছিল।

কাজেই আশ্চর্য্য হইবার কোনই কারণ নাই যে, নেতাজীকে লইয়া গান, নেতাজীর সম্বন্ধে গাথা, নেতাজীর কথা, নেতাজীর গল্প হাজারে হাজার রচিত, গীত ও প্রচারিত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাশ ভুবন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে।

একখানি অতীব মধুর অপিচ বীরত্বব্যঞ্জক গীত আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন, ভক্ত যেমন, রত্ন সিংহাসনে গৃহদেবতাকে অধিষ্ঠিত করিয়া হৃদয় মুক্ত করিয়া ভক্তি অর্ঘ্য ঢালিয়া দেয়, স্বাধীনতাকামী মানুষগুলি স্বাধীনতার পূজারীর উদ্দেশে নিঃশেষে শ্রদ্ধার ডালি উৎসর্গ করিয়াছে।

সুভাষ জি, সুভাষ জি !

সুভাষ্ জি সুভাষ্ জি উও জান্-এ-হিন্দ আগয়ে।
হো নাজ জিস্‌পে হিন্দ্‌কো উও শান্-এ-হিন্দ আগয়ে॥
কলি, কলি, কলি, কলি, পে অন্দলীব্ চ্যা চহি
গলি, গলি, গলি, গলি, হ্যা খল্‌ক-এ আম্ গা রহি—
সুভাষ্ জান্-এ-হিন্দ্ হ্যা, সুভাষ্ আন্ এ-হিন্দ্ হ্যা
সুভাষ্ শান্-এ-হিন্দ হ্যা, সুভাষ্ কান্-এ-হিন্দ হ্যা
গমো কি বদলিয়া খুলি চমন্ কে ফুল হর্ কলি,
হঁসি হঁসি খুশী খুশী ব-নাজ-এ-শওক্ গা রহি
খুশী কা দস্তুর্ আগয়া, নিশাত্ বন কে ছা গয়া
এশিয়া কা আফ্ তাব্ এশিয়া পে ছা গয়া
উও আন্-এ-হিন্দ্ লায়েঙ্গে, উও শান্-এ-হিন্দ্ লায়েঙ্গে
দুশ্‌মনো কি ফৌজ পর্ উও ক্যাহর্ বন্ কে ছায়েঙ্গে

এই একটি নহে, পার্ব্বত্য-নদীতটে যেমন বিচিত্র বর্ণেরও অভিনব আকারের উপলখণ্ড সমূহ স্বচ্ছ বারি হিল্লোলে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে, নিঝর্রিণীর গানে প্রেরণা দান করে, স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দিকে দিকে নেতাজী প্রশস্তি ঝঙ্কৃত হইত। বুঝি আজও সে ঝঙ্কার থামে নাই ; কান পাতিয়া শুনিলে শুনা যায়, বুঝি বা দেখাও যায় সে স্বর্গীয় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আজও বংশীরবে অজগরের মত ভারতের, এসিয়ার মনুষ্যকে মুগ্ধ মোহিত করিতেছে। বুঝি অনন্তকাল ধরিয়া সে সঙ্গীত পরাধীন মানুষের কাণে আশা ও বিজিত মানুষের প্রাণে প্রেরণা জোগাইবার জন্যই বাঁচিয়া থাকিবে ও ধ্বনিত হইবে।

চালচিত্র

আমার প্রবন্ধ নিচয়ের পাঠিকা ও পাঠকগণের নিকট আমেরী সাহেবের নাম অপরিচিত নহে। চার্চ্চিল পালিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের প্রতি কিরূপ সদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, তাহাও কাহারও অজানা নাই। মিঃ লিওপোল্ড আমেরী চার্চ্চিল-আমলে (তাহার পূর্ব্ব হইতেই) ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। যুদ্ধান্তে বিগত নির্ব্বাচনে, চার্চ্চিল দল (ভারতবাসীর ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান পর্য্যাপ্ত নহে; 'দলের' অনুবাদ তাহারা 'গ্যাং' করিয়াছে।) ফৌত হইয়া গিয়াছে, আমেরী সাহেবেরও ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উপর মাতব্বরী ও মুরুব্বিয়ানার অবসান হইয়াছে। তাঁহার খড়ম খোওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তিনি খড়মের বগলো দু'টি পায়ে আঁটিয়া খট্ খটাইতে ক্লান্ত নহেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের প্যারীতে গিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, গান্ধী একটি আশ্চর্য্য মানুষ। একাধারে সাধু, বিনয়ী, জনপ্রিয়, সদাচারী রাজনৈতিক দলপতি; আবার পুরাপুরি অটোক্র্যাট। অটোক্র্যাট্ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এই: "একছত্রাধিপতি"।

কিন্তু গান্ধী কি সত্যই অটোক্র্যাট?

কিন্তু আমি এই প্রশ্নের উত্তর নাই বা দিলাম! গান্ধী-দর্শন, গান্ধী সাহিত্য, গান্ধী-কর্ম্মপদ্ধতি আজ পৃথিবীর সম্পত্তি; বিশ্ববাসীর তাহাতে সমাধিকার। কাজেই ঐ প্রশ্নের উত্তর আমি না দিলেও চলিবে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আমার বিস্তারিত কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন আছে। মল্লিখিত আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের বিগত কয়েক অধ্যায়ে ইচ্ছায় হৌক, অনিচ্ছায় হৌক, অবধান অথবা অনবধান বশতঃই হৌক জাঁকজমক ও চাকচিক্যের আভরণ ভেদ করিয়া যে মানুষটি মানুষের মানস নয়নে প্রতিবিম্বিত, তাহাকে অটোক্র্যাট বলিতে বাধা কি? হিটলারের অটোক্রেসী, মুসোলিনীর অটোক্রেসী, জাপানীর রাজতান্ত্রিক অটোক্রেসী, অথবা বৃটিশের ডিমোক্রেটিক আটোক্রেসী সুভাষচন্দ্র (এবং কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ সদস্যমাত্রই) অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতেন, ইহা ভারতবর্ষে কোন লোকেরই অজানা নাই; কিন্তু এই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিলে, কিছুদিন পর্য্যন্ত অটোক্র্যাট ডিক্টেটারের পরিচালনাধীন রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সুভাষচন্দ্রও অস্বীকার করেন নাই। স্ব-রাজ্য অর্থ স্ব স্ব রাজ্য হইলে স্বেচ্ছাচারিতাই একছত্রাধিকার বিস্তার করিতে পারে। ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

কিন্তু, সে কথা যাক্। ব্যক্তিগত ক্ষমতা লোলুপতার কথা হইতেছিল, তাহাই হৌক।

ক্ষমতা প্রিয় কে নহে? আমার ক্ষুদ্র সংসার রাজ্যে আমার হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। আমার মন্ত্রণা পরিষদ আছে, মন্ত্রীও হয়ত আছেন, মন্ত্রণা সভাও যে না বসে, এমন নহে; কিন্তু আসল ক্ষমতা আমার আয়ত্ত্বাধীন। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা নিবারণ জন্য ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কেবল মনুষ্যালয়ে কেন, অরণ্যে জীবজন্তু পশু পক্ষীর মধ্যেও ক্ষমতা লোলুপতা পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন, তাঁহাদের ঈশ্বর, যাঁহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং প্রকৃতি দেবীতে আস্থাসম্পন্ন, সেই প্রকৃতি দেবীরও ইহা অনভিপ্রেত বলিয়া মনে করা যায় না। ঈশ্বর কাহাকেও মেধাবী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি সম্পন্ন করিয়া গঠন করেন; আবার কাহাকেও ক্ষীণজীবি, অল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বল করিয়া গঠন করেন। প্রবল দুর্ব্বলের উপর অধিকার বিস্তার করিতে বাধ্য। প্রাকৃতিক নিয়মও ইহার সহায়তা করিয়া থাকে।

কাব্যে পাঠ করা গিয়াছে যে, ব্যাঘ্র যতদিন নর রক্তের স্বাদ না পায় ততদিন তাহার শোণিত পিপাসা থাকে না। মানুষ একবার ক্ষমতার স্বাদ অনুভব না করা পর্য্যন্ত তাহার ক্ষমতা লোলুপতা জন্মে না। কথাটা ঠিক নহে। এখানেও সেই ঈশ্বর অথবা প্রকৃতি কাহাকেও ক্ষমতা অর্জ্জনের ক্ষমতা দিয়া তৈয়ার করিয়াছেন; কাহাকেও বা বশ্যতা স্বীকারের ধাতু দিয়া গড়িয়াছেন। যাহার যে উপাদানে নির্ম্মাণ তাহার কার্য্যে সেই উপাদানের ছাপ পড়িবেই।

সুভাষ কটকের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া একান্ত বালক কালেই স্কুলের (বা ক্লাসের) লীডার হইয়া 'মর্য্যাদা' আদায় করিয়া লইয়াছিল। তাহার সহপাঠি তাহার অভিন্নহৃদয় বন্ধুবর্গ লেখকের নিকট বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সুভাষ তখন পুরা সাহেব। আচারে ব্যবহারে কণামাত্র স্বাদেশিকতার বালাই ছিল না। ইহাই স্বাভাবিক। ডিষ্ট্রীক্ট কোর্টের উকীল হইলেও সুভাষের পিতা জানকীনাথ বসু মহাশয়কে তখনকার দিনে কটকের লোকও ধুতি চাদরে হামেসা দেখিয়াছে কি না তাহা মনে করিতে পারে না। সুভাষের কি স্কুলের, কি বাড়ীর, পোষাক পুরাদস্তুর সাহেবী, নিজেকে সে অপর সকল হইতে সম্মানজনক ব্যবধানে রাখিতে অভ্যস্ত। স্কুলে পঠনীয় ও শিক্ষনীয় সমস্ত বিষয়েই তাহার অসামান্য অধিকার।

জানকী বাবুকে লোকে 'জানকী সাহেব' বলিত, কটকের লোক আজও তাহা ভুলিতে পারে নাই।

কথাটা, বড় হাসির কথা। আমি কলম ধরিয়াই হাসিতেছি এবং আমার রচনা পাঠকালে আমার পাঠিকার স্ফুরিত বিম্বাধরে হাসির লহরীলীলা আমার মানসমুকুরে অবলোকন করিতেছি। আরও হাসি আসে।

সুভাষ পুরা সাহেব—অবশ্য বয়স কম, তাই ছোট সাহেব বলাই ভাল। ট্রাউজারের ভাঁজ তির্য্যক, টাই টাইট্, কামিজের হাতা চক্ চকে, কোর্ট ফিট, এ সব আগেই বলিয়াছি; লেখাপড়ায় ভাল তাহাও বলিয়াছি। বলি নাই কেবল তাহার জীবনের আদর্শটা কি? এখন সেইটাই বলিব? আপনারা স্মরণ রাখিবেন, ম্যাট্রিকের তখনও দু'বৎসর দেরী আছে, বয়স ১৩। সেই বয়সে আদর্শ কি খাড়া হয়? আমার বিশ্বাস, হয়। অন্ততঃ আমার হইয়াছিল। আমি সেই বয়সেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলাম, বিদ্যাসুন্দর রচয়িতার পরবর্ত্তী সংস্করণ হইব। কার্য্যকালে কুম্ভকার হইলাম। সুভাষ, দ্রুপদ রাজার সভায় রক্ষিত মীনাক্ষির মত, বাঙ্গলার এ্যাডভোকেট জেনেরালই তাহার চরম লক্ষ্য স্থির করিয়াছিল। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের রামানন্দ স্বামীর কথাগুলাকে একটু একটু রদ বদল করিয়া বলা যাইতে পারে যে, শত এ্যাডভোকেট জেনারেল······

আমার কিশোর বয়স্ক পাঠকের মুখ দেখিয়াই আমি অনুমান করিতেছি তিনি ভাবিতেছেন, তিনি সুভাষ বোস হইবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। ভাল তিনি তাহাই হৌন। কিন্তু তরুণী পাঠিকার মৃদুমন্দ হাসি যে লোককে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছে। তিনি কি চাহেন? তাই ত! বলা বড় কঠিন। নারীর অন্তর আর সমুদ্রের তল নাকি একই পদার্থ! তাই যদি হয়, ক্ষীণ লেখনীসর্ব্বস্ব লেখক সে রত্নাকর তলে প্রবেশ করিবে কিরূপে? কিম্বা না, হাসি ত নয়, ও যে জ্যোৎস্নার আলো, তাহাতে সবই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে কিন্তু সে গুড়ে যে বালি! অপর্ণা দেবীর পক্ষে শিবের গলায় বরমাল্য দোলান সম্ভব হইয়াছিল বটে কিন্তু সুভাষ লক্ষ্য হইলে ভাগ্যে চির একাদশী। সে কাহিনী স্থানান্তরে বলিব।

তখনকার দিনে (এখনও নয় না কি?) সর্ব্বপেক্ষা যাহার এইরূপ প্রাধান্য, সম্মান তাহারই প্রাপ্য। সুভাষ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সযত্নে রক্ষা করিত, এবং সহাধ্যায়িগণও সসম্ভ্রমে দূরে অবস্থান করিলেও, হায় রে! এই সুভাষই একদিন আই-এন্-এ-র মাইনার স্যাপার (কুলী মজুর) দের সঙ্গে বসিয়া ঘাসের রুটি ও ভিজা ছোলা ছিবাইতেও দ্বিধা করিল না। সুভাষের নিকট অবজ্ঞা বা উপেক্ষা কেহ পাইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। তবে সকলের সহিত হলায় হলায় গলায় গলায় না হওয়া যদি দাম্ভিকতা এবং অপরাধ হয়, তাহা হইলে সে অপরাধী

বৈ কি! জগন্নাথ চৌধুরী ও চারু ছায়া সুভাষ কটকের স্কুলে কাহাকেও মনুষ্যজ্ঞান করিত বলিয়া শুনি নাই। জগন্নাথ দাশ উড়িষ্যার ভৃঙ্গারপুরে ধনাঢ্য ভূম্যধিকারীর বংশধর। স্কুলে সেও' 'প্রতিভার' পরিচয় দিয়াছিল। জগন্নাথ এখন ইউরোপে কোথায় অধ্যাপনা কার্য্য করেন বলিয়া শুনি।

এবং চারু গাঙ্গুলী ছাড়া সে সময়ে তাহার তৃতীয় বন্ধু ছিল কি না সন্দেহ। চারু পরে ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্স জজ হৌক আর যাহাই হৌক, তখন যে সুভাষ তাহাকে বন্ধু করিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ বোধ করি দুইজনেই ভাল ছেলে, ফার্ষ্ট এণ্ড সেকেণ্ড; চারুর বাবা ও সুভাষের বাবার মধ্যে অন্তরঙ্গতা ছিল; এবং চারুর চেহারাটাও প্রিয়দর্শন পর্য্যায়ের বহির্ভূত ছিল না। চেহারার প্রসঙ্গে একটা হাসির গল্প মনে পড়িয়া গেল। অনেকেরই বোধ হয় জানা আছে, পঠদ্দশায় সুভাষ ইউনিভার্সিটির সামরিক শিক্ষা বিভাগে যোগ দিয়াছিলেন। সামরিক শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে যে দুইচার জন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহার ছিল তাহাদের সকলকে 'কোরে' যোগ দিবার জন্য উৎকট পীড়াপীড়ি করিতেও দেখা গিয়াছে। এই 'কোর' যে আই-এন-এর সুপ্রিম কম্যাণ্ডিঙের বীজ বপণ করিয়া দিয়াছিল এ কথা তখন কেই বা কল্পনা করিয়াছিল? মেজর দবিরুদ্দিন আমেদের ভ্রাতা ওমরাদ্দিন আমেদ প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিতেন, খোদা আমাকে মারিয়া রাখিয়াছেন। নহিলে আমি মার্চ্চ ভাল করি, প্যারেডেও আমার ভাল নাম, অথচ আমার প্রমোশন হয় না! আর ঐ সুভাষ যে এক পা ফেলে ত অন্য পা তোলে না, ও পা পড়ে ত অন্য পা ওঠে না, কিন্তু ঘন ঘন হয় তার প্রমোশন, হরদম 'মেনসন'! সুভাষের লাল টুকটুকে সুন্দর চেহারা ওর পরেই সবার নজর! আর আমায় খোদা মারিয়াছেন, আমাদের দিকে কেহ চাহিয়াও দেখে না। খোদা আমাকে মারেন, সুভাষকে তোলেন।

চারুর সহিত সুভাষের অন্তরঙ্গতার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে। ভালয় মন্দয়, আলোকে অন্ধকারে, কঠোরে কোমলে, গঙ্গায় যমুনায় অন্তরঙ্গতা নয়নানন্দকর হয়—বৈপরীত্য বশতঃ; ভালয় ভালয়, আলোকে আলোকে কঠোরে কঠোরে আন্তরিকতাও শোভন ও সঙ্গত এবং প্রীতিপ্রদও বটে! সুভাষও ভাল ছেলে, চারুও ভাল ছেলে। সুভাষ যদি এক শতর মধ্য একশত পাইত, চারু অষ্টনব্বইয়ের নীচে নামিত না। কটকের র‍্যাভেন্সা স্কুলে একবার সত্য সত্যই এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। ইংরাজীতে সুভাষ পাইল একশ', চারু অষ্টনব্বই। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকগণ বিশ্বাস করিতেও নারাজ যে

পরীক্ষার খাতার নম্বর ম্যালেরিয়া জ্বরের মত থার্মোমিটারের শীর্ষদেশে উঠিতে পারে! প্রথমে কাণাঘুষায় পরে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বের অপবাদ প্রচারিত হইল। পরীক্ষক লোকটি বোধ হয়, কৃষ্ণচন্দ্র সেন, পরে তিনি রায় সাহেব হইয়াছিলেন। স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট খাতা দু'খানি পেশ করিয়া বলিলেন, আপনাকে খাতা দু'খানা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতেই হইবে। আমার অন্যায় হইয়া থাকিলে, শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত রহিলাম। হেড মাষ্টার খাতা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিলেন; অভিযোগ ফাঁসিয়া গেল; অপবাদ খণ্ডিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, একশ'র বেশী দিবার উপায় নাই তাই; না হইলে আমিই, উহাদের দু'জনকেই, আরও কিছু কিছু নম্বর দিতাম।

সুভাষ স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য (আভিজাত্য বলিব কি ? বলি না, দোষই বা কি ?) বজায় রাখিয়া চলুক না কেন, জগন্নাথ ও চারুর সহিত নিজেকে অসঙ্কোচে ও অকপটে মিশাইয়া দিয়াছিল এবং উত্তরকালে এই নৈকট্য শিথিল না হইয়া দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। চারু অর্থোডক্সীর গহ্বরে পড়িয়া কালাপানি পার না হওয়ায় সুভাষ অত্যন্ত রুষ্ট ছিল। একবার কেম্ব্রিজ হইতে এই চারুকে পত্র লিখিতে লিখিয়াছিল, "তুমিই শুধু রইলে পড়ে"! তবে সুভাষ এ কথাও লিখিয়াছিলেন, শুধু বিলাতে নয়; বিলাত হৌক, আমেরিকা হৌক যেখানেই হৌক, দেশ ছাড়িয়া বিদেশে না আসিলে শিক্ষা কখনই সম্পুর্ণ হয় না।

সুভাষের আর একটি বৈশিষ্ট্য সেই বালককালেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই "বৈশিষ্ট্যের" স্বরূপ সকলে বুঝিতে না পারিলেও, ইহা যে ভগবদ্বিষয়ক "কিছু" ইহা বিনা দ্বিধাতেই লোকে মানিয়া লইতেন। নাস্তিকতা তখনও শিকড় গাড়িতে পারে নাই! সুভাষকে ঈশ্বর-সাধক ভাবিয়া কেহ আনন্দ বোধ করিত; কেহ বা একটু ভয় পাইত। একথা ঠিক যে, কেহই হাসিয়া উড়াইয়া দিত না। সে যাই হৌক, সুভাষের অন্তরঙ্গদ্বয় বলেন যে, ঈশ্বর প্রেম ও স্বদেশপ্রেম যুগপৎ সুভাষের অন্তর প্রদেশে প্রবাহিত হইত। কথঞ্চিৎ ধীরতার সহিত পর্যালোচনা করিলেও তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বর প্রেমই ক্রমশঃ স্বদেশ প্রেমের সহিত মিলিত হইয়া, উভয় নদীর সঙ্গমে সাগর সঙ্গম সৃজন করিয়াছিল কি-না তাহাও আলোচনার বিষয় বটে। ঈশ্বর সাধনায় রামদাস বাবাজী ও রামকৃষ্ণ মিশনের যোগেশ্বরানন্দের প্রভাব কতখানি কার্য্য করিয়াছিল তাহার পরিমাণ করিবার চেষ্টা আমি করিব না; তবে এই দুই সাধকের একেরও কটকে আগমন ঘটিলে সুভাষকে অনন্যকর্ম্ম হইয়া পড়িতে দেখা

যাইত। সুভাষের নিকট কোন্‌টি অধিক কাম্য ছিল, তাহা বলা দায়। ম্যাট্রিক পরীক্ষান্তে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া ঈশ্বরের সন্ধানে হরিদ্বারে—হয়ত বা আরও দূরে গিয়াছিল, সে ত জানা কথাই এবং সেখানে 'মছলি খাতা বাংগালী' বলিয়া উপেক্ষিত না হইলে সুভাষ স্বদেশ সাধনায় ফিরিত কি না তাহাও বলা কঠিন।

না। আমরা বালক কালের কথা বলিতেছিলাম। ঘোর সাহেব সুভাষের পরিবর্ত্তন হইল কখন্? এ কথার উত্তর দিতে হইলে একটু ঘুর-পথে যাইতে হয়। স্বদেশ প্রেমের আগে ভগবৎ প্রেম সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। সেই বয়সে (১২ অথবা ১৩, কিংবা ১৪) ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয় কিনা, হইলেও তাহার আকৃতি প্রকৃতি ও গতি কিরূপ হইয়াছিল এই সকল বিবরণ দেওয়া কঠিন। ঈশ্বর প্রেম বাহ্যিক বস্তু নহে; ঈশ্বরের জন্য কাহার কতখানি আকুলতা ও ব্যাকুলতা, তাহা মানুষের চেহারা দেখিয়া নিরূপণ করা যায় বলিয়া আমার মনে হয় না।

তবে সে সময়ে কটকে যে কয়টি শিক্ষিত ভদ্র পরিবার (বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী) বাস করিতেন, সেই সকলের ছেলে-ছোকরারা সবাই জানিত যে, সুভাষ কৌশিক বস্ত্র পরিয়া নিত্য প্রভাতে পূজা অর্চ্চনা করে। সুভাষ যে সদ্‌গুরুর সন্ধানে কিশোর বয়সেই গৃহত্যাগ করিয়াছিল তাহা ত আজ সর্ব্বত্র সর্ব্বজনবিদিত সত্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুত্থানের পর বাঙ্গালী যুবক সমাজে ঈশ্বরাধনার একটি বিশিষ্ট রূপ বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। সুভাষের ঈশ্বরোপাসনার মূলে যে বিবেকানন্দের প্রভাব না থাকিতে পারে এমনও নহে!

"চিন্তয় মম মানস হরি
চিদঘন নিরঞ্জন।"

বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী গীতি গীত হইলে সুভাষ তথায় ও তন্মুহূর্ত্তে তন্ময় হইয়া পড়িত।

সুন্দর, সুকুমার, সুগৌর কিশোর সুভাষ ক্লাসে বরাবর প্রথম। ছাত্র মহলে 'ফার্ষ্ট বয়ের' মর্য্যাদা নিতান্ত অবজ্ঞেয় নহে। তাহার উপর সুভাষ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ; সুভাষের সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য ও অসাধারণ অধিকার। সুভাষ ছাত্র-সমাজের আলোচ্য বিষয়—টক অফ্ দি 'স্টুডেন্টস্ কমিউনিটি।' কিন্তু সুভাষ মেলা মেশায় বড় খুঁত খুঁতে; স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সদা সযত্ন! কাজেই তাহার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা নিতান্তই কম। বন্ধু বান্ধব কম হইলে কি হয়? ভক্তের সংখ্যা অগণিত।

ভক্তবৃন্দ দূর হইতে, অজ্ঞাতে, নীরবে ভক্তি করিয়াই তৃপ্ত। সমস্ত ক্লাশ তাহার আনুগত্য করিতে প্রস্তুত। কাজেই সুভাষ লীডার।

ক্লাসের ডিবেটিং সোসাইটির বিজ্ঞাপনই হৌক আর যাহাই হৌক, ভাষায় যাহারই প্রকাশ তাহাই সুভাষ লিখিবে, ইহার ব্যতিক্রম হইবার নহে। একবার একটা গুরুতর ও অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রস্তাব লিখিবার দরকার হয়। রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী সেটি রচনা করিয়া দেন। সুভাষের তাহা মনঃপূত হইল না। সে রচনার কিয়দংশ কাটিয়া স্ব-রচনা সন্নিবেশিত করিল। ইহাতে বিস্মিত হইল না এমন লোক একটিও রহিল না কিন্তু সুভাষ অবলীলাক্রমে এই অসম সাহসিকতা প্রদর্শনে বিরত রহিল না। গোপাল গাঙ্গুলী মহাশয়কে সে জানিত; শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম সোপানে তাঁহার অধিষ্ঠান, তাহাও জানিত; গোপাল বাবুর ইংরাজী লাট সাহেব (উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র লাট তখনও হয় নাই!) মান্য করিবে জানিয়াও আত্মপ্রত্যয়শীল বালক তাহার উপর কলম চালাইতেও দ্বিধা করিল না! যাহারা উভয় রচনা দেখিয়াছিল, শুনিয়াছি তাহারা সুভাষের স্পর্দ্ধাকে স্তুতি না করিয়া পারে নাই। এই আত্মপ্রত্যয়, নিজের উপর অসামান্য দৃঢ় বিশ্বাস কি উত্তরকালে প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদে ভারতবাসীর নয়ন মনকে অভিভূত—কভু বা বিভ্রান্ত, করে নাই? সুভাষ লীডার!

গান্ধীজীর মনোনীত পট্টভি সীতারামিয়ার দ্বারা যুদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তী কালের রাজনীতি সুপারিচালিত হইতে পারে না, ইহা কি সেই আত্মপ্রত্যয়েরই এক অভিব্যক্তি নহে? মনে রাখিতে হইবে যে, সুভাষ লীডার!

ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য আন্দোলন দ্বারা ভারতের কাম্য স্বাধীনতা অর্জ্জনের আশায় আস্থাবান থাকিলে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই জীবন তুচ্ছ, সর্ব্বস্ব নগণ্য বিবেচনা করিয়া বিপদসঙ্কুল পথে ছদ্মবেশে দেশ হইতে দেশান্তরে গিয়া হিংস্র সংগ্রামে লিপ্ত হইতেন না! এইখানে, এই প্রসঙ্গে নেতাজীর একটি "অর্ডার অফ দি ডে" ঘোষণাবাণীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে দোষ কি? কিন্তু মনে রাখা দরকার যে সুভাষ সেখানেও লীডার। সুপ্রীম কমাণ্ডার!

"ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে বিরাট সংগ্রাম ভারতবর্ষীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহার গুরুত্ব অস্বীকার না করিয়াও আমরা বলিতে চাই যে আমরা—ভারতবর্ষের বাহির হইতে—তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা করিতে চাই। তাঁহারা সেখানে সংগ্রাম করুন, আমরা এখানে যুদ্ধ পরিচালিত করি। বৃটিশের উচ্ছেদ করিতে হইলে ভিতরে বাহিরে দুর্ম্মদ যুদ্ধ

করিতে হইবে।" এখানেও সেই অবিচল আত্মপ্রত্যয়! অহিংস সত্যাগ্রহে সন্দেহ প্রকাশ!! ইহা কেবলমাত্র সুভাষেই সম্ভব! স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সুভাষ জন্ম হইতেই লীডার!

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাশ কটকের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া ছাত্রগণ এই ঋষিকল্প শিক্ষকের সান্নিধ্যে উপনীত হইল। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, বেণী বাবুর পানে সুভাষ ও তাহার বন্ধু চারু তদ্রূপ আকৃষ্ট হইল। বেণীমাধব দাশের চরিত্র-মাধুর্য্য, বিনয়মণ্ডিত অনমনীয় দৃঢ়তা, অভ্র-ভেদীহিমগিরি সম প্রতিভাত হইতে লাগিল। বেণীবাবু কুম্ভকার ভাল। সুগঠিত মৃৎ পাত্রে সুপরিকল্পিত চিত্র অঙ্কন করিলেন। জমি ছিল উর্ব্বরা, অববাহিকার বারিধারা ভূমিতল রসসিক্ত রাখিয়াছিল। ঈশ্বর প্রেমের প্রথম সোপান হিসাবে দেশ প্রেমের বীজ বপণ হইল। সুভাষের চক্ষুর সম্মুখে এক অপরিচিত, অজ্ঞাত, ও অদৃষ্টপূর্ব্ব জগত উদ্ঘাটিত হইল। সুভাষ মনে প্রাণে স্বদেশী হইয়া উঠিল। তাহার পোষাক আষাকও নূতন রূপ ধারণ করিল।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!"

নূতন জগতই বটে! ঈশ্বর চিন্তায় যে আবেশ, যে সম্মোহন, স্বদেশ ভারতবর্ষ চিন্তায় সেই আবেশ, সেই উন্মাদনা। ভগবানের ধ্যানে যে আকুলতা, এই বৃক্ষলতা গিরি নদ নদী নগর নগরী মানুষ মানুষী জীবজন্তু সমৃদ্ধ বিশাল বিরাট ভারতবর্ষকে মা মা—জননী জন্মভূমি মা বলিয়া ডাকিতে সেই আকুলতা, জিহ্বা জড়াইয়া আসে, নয়ন মুদিয়া যায়, চোখে জল আসিয়া পড়ে! সুভাষের পক্ষে সে এক অভিনব অনুভূতি! সুভাষের ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের একাংশে ঈশ্বর, অপরাংশে স্বদেশ অধিষ্ঠিত হইল। তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা তাহার হৃদয়কে বিরাট ও বিশাল করিয়াই গড়িয়াছিলেন; তাই সংঘর্ষ ঘটিল না। বাঙ্গালীর মেয়ে যেমন তাহার হাঁড়ী কলসী পাতাচর্চ্চরী-ছেলে-বৌ-মেয়ে-জামাই নাতী নাতনীর সংসারও পাতে, তাহার পুন্যি পুকুর শিবঠাকুরের ব্রতও করে, বিরোধ হয় না, একের জন্য অপরটি অবহেলিত হয় না, সুভাষের অন্তরে ঈশ্বর ও স্বদেশের যৌথ কারবার স্থাপিত হইল, দ্বন্দ্ব বিবাদ হইল না।—সুভাষ লীডার!

কটকের উড়িয়াবাজারে চারুদের পড়িবার ঘরে নদীয়া জেলার এক গণ্ড-গ্রামবাসী ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট কিশোর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া বাসা বাঁধিল। নদীয়া কলিকাতার সন্নিকটে অবস্থিত; কলিকাতার অনেক খবর নদীয়ায় যায়;

কলিকাতার অনেক লোকের খবরও নদীয়ার লোকে রাখে। এই যে ম্যালেরিয়া-পীড়িত কৃষ্ণ ও কৃশকায় কিশোরটি কটকে আসিয়া উঠিল, তাহার ঝুলিতে "ডিঃ গুপ্ত", "বি কে পাল" ছিল কি-না জানি না, কলিকাতার বহু দেশকর্ম্মীর ইতিবৃত্ত দ্বারা ঝুলিটি সমৃদ্ধ ছিল। উড়িয়াবাজারের সেই ঘরের ভিতরে বসিয়া সে যখন যাত্বকরের 'লয়া লয়া খেলে'র মত একটির পর একটি ইতিকথার আবরণ উন্মোচন করিতে লাগিল, তখন তাহার দর্শকত্রয় (শ্রোতৃত্রয় বলিব কি ? সুভাষ, চারু ও জগন্নাথ !) তাহাদের অজ্ঞাতসারেই যাত্ন হইয়া গিয়াছে। দেশাত্মবোধের যে ক্ষেত্র বেণী মাধব দাশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উড়িয়াবাজারের এই ঘরে বসিয়া নদীয়া জেলার সেই কিশোর তাহাতে যে তরু রোপণ করিল, তাহাই উত্তরকালে মহামহীরূহ রূপ ধারণ করিয়া পরাধীনতার আতপতাপক্লিষ্ট ভারতবাসীকে পান্থ-পাদপের মত সান্ত্বনা দিয়াছে। সুভাষের জীবন নাট্যের প্রথম অঙ্ক হইতে কটকের উড়িয়াবাজারের চারুর ঘর ও নদীয়ার এই জ্বরো রোগীটিকে বাদ দিলে নাটক পঞ্চমঅঙ্কে পরিপূর্ণাঙ্গ হইত বলিয়া মনে হয় না। এই নদের চাঁদটির নাম, হেমন্ত সরকার। হেমন্ত বেণীমাধব দাশ মহাশয়ের সুপারিশপত্র লইয়া, চারুর পিতা গোপাল গাঙ্গুলী মহাশয়ের গৃহে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছিল। বেণী-বাবুর মুখে সুভাষের কথা শুনিতে শুনিতে হেমন্ত সুভাষকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাশ মহাশয়ের কন্যার পরিচয় দিই। শ্রীমতী বীণা দাশ, যিনি আমাদের কলিকাতার মহিলা এম এল এ, তিনি বেণীবাবুর কন্যা। স্থানান্তরে "অন্য পরিচয়ও দিব।

আজ আমি (শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার) অকুতোভয়ে একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে এই বেণীবাবুর সংস্পর্শ, এই মহচ্চরিত্র মানুষটির সান্নিধ্য সুভাষচন্দ্র পাইয়াছিলেন বলিয়াই আমরা নেতাজী পাইয়াছি ; নহিলে এ্যাডভোকেট জেনেরাল সুভাষ, জজ সুভাষ, বড় জোর ভাইসরয়ের কাউন্সিলার সুভাষই মিলিত। বিবেকানন্দ পরমহংসদেবে যে সম্পর্ক, সুভাষে বেণী বাবুতে সেই সম্পর্ক, ইতিহাসে লিখিত থাকে, ইহাই আমি চাই।

সুভাষের কিশোর বয়সের বন্ধুবর্গের মধ্যে জগন্নাথ আর চারু ছাড়া আরও একজনের প্রভাব তাহার উপরে অসামান্য আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল বলিয়াছি ! সেই বন্ধুটির নাম হেমন্ত সরকার। উত্তরকালে হেমন্তও দেশ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে অকূলে কূল পাইয়াছে সত্য কিন্তু অস্থিপঞ্জর ভগ্ন, জীর্ণ হইয়া গিয়াছে ! সুভাষ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া

কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ পড়িতে আসিল। চারু কটকে র‍্যাভেন্সা কলেজেই পড়িয়া রহিল। সুভাষের অনুক্ষণের সঙ্গী চারুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি এই প্রথম। চারুর স্থান হেমন্ত কতকটা পূরণ করিল। হেমন্ত, সুভাষ ও চারুকে সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত পরিচিত করাইয়া দিল। সুরেশ বন্দ্যো প্রভৃতি তখনকার দিনে স্বদেশ-সাধকদিগের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্নি স্বাভাবিক নিয়মেই সুভাষে অনুপ্রবেশ করিতে লাগিল। স্বদেশ-প্রেমকে বাস্তবরূপ দান করিবার যে কামনা ও আকাঙ্ক্ষা অন্তরে ফল্গু সম প্রবাহিত হইতেছিল, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকেই মূর্ত্ত করিয়া দিলেন। সুভাষের দেশপ্রেম নবীন তেজে, নবীন গরিমায় জ্বলিয়া উঠিল। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি, এই সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের শ্রমিক বিভাগে কার্য্য করিয়া যশঃস্বী হইয়াছেন এবং ১৯৪৭ সালে নূতন বঙ্গ গঠিত হইলে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় "শ্রম" বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

আই-এর পরীক্ষার ফল সুভাষের ভাল হয় নাই। কেন ভাল হয় নাই সে কথা বলা কঠিন। তবে যাহারা বাল্যকাল হইতে সুভাষের পরীক্ষার ফল লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট ইহা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। অন্য যে-কোন ছেলের এই দশা ঘটিলে লোকে মনে করিত (হয় ত বা বলিত) যে বিদেশের ছেলে সহরে আসিয়া বিগড়াইতে সুরু করিয়াছে। সহরের প্রলোভনে মস্তিষ্ক অবিচলিত রাখা মফঃস্বলের বালকের পক্ষে সাধ্যাতীত। কিন্তু সুভাষের সম্বন্ধে এ কথা কেহ বলা দূরে থাক্—মনেও ঠাঁই দিল না। চাঁদে কলঙ্ক আছে, এতদূরে থাকিয়াও আমরা কলঙ্কের বিন্দুটি চাক্ষুষ করিয়া থাকি, কিন্তু সুভাষ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র, কলঙ্ক কালিমা তাহার ত্রিসীমানায় পশিতে পারে নাই। সুভাষ তাহার ঈশ্বর ও তাহার দেশকে লইয়াই মগ্ন ছিল। তাহাকে বিভ্রান্ত বা বিচলিত করিবার অন্য কোন উপাদানই তাহার গতি-পথ অতিক্রম করে নাই।

প্রেসিডেন্সীতে বি, এ, পড়িবার সময় ওটেন্ নাটকাভিনয়। এই নাটকের প্রস্তাবনায় আমি এমন একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি যে-কথাটির সহিত নাট্য-বর্ণিত উপাখ্যানের সাদৃশ্য ত নয়ই, বরং সম্পূর্ণ বিরোধই পরিলক্ষিত হইবে। আমি আগেও বলিয়াছি যে, ওটেন নাট্যের নায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্র অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; প্রচলিত কাহিনীও তাহাই বটে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র স্বয়ং নাটকবর্ণিত ঘটনা অস্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাও আমরা শুনিয়াছি। এই ঘটনাটি আনুপূর্ব্বিক বলিতে হইলে একখানি পরিপূর্ণাঙ্গ চালচিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন

হইয়া পড়ে। চালচিত্র শব্দটির ইংরাজী ভাষ্য কি হইবে? ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড শব্দটি পরিচিত বটে কিন্তু চালচিত্র অধিকতর সুপরিচিত। জগজ্জননী দুর্গাঠাকুরাণীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশে চালচিত্র কতখানি সহায়তা করে বলিতে পারিব না তবে জগন্মাতার বোধন বা অকাল বোধন চালচিত্র বাদ দিয়া কোনটিই হয় না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

ওটেনের মুখের অর্গল ছিল না। ওটেন যেন পুলিস সাহেব। অথবা বাঙ্গালাদেশের প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেব। উদাহরণ আরও সুসমঞ্জস হইতে পারে যদি আমার রাজনৈতিক মনোভাবসম্পন্ন পাঠক ১৯৪০ হইতে ১৯৪৬ পর্য্যন্ত কায়েদে আজম জিন্নাকে স্মরণ করেন। হিন্দু বা কংগ্রেসের 'রাশ নাম' না ধরিয়া তিনি 'জল' গ্রহণ করিতেন না। আকথা কুকথা যেন তাঁহার জলপান। একবার কলেজের (তৃতীয় বার্ষিক, বি-এ) ছেলেরা ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। ওটেন সাহেব তাহার উক্তি প্রত্যাহার ও দুঃখ প্রকাশ এবং ত্রুটী স্বীকার না করিলে ছেলেরা কলেজ-ক্লাসে ফিরিবে না। ধর্ম্মঘট বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এমন কি সরকারী বৃত্তিভোগী ছাত্রগণও—বৃত্তিনাশের আশঙ্কা সত্বেও ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছিল। দুই দশটি হিন্দু মুসলমান ছাত্র ব্যতিরেকে কেহই ক্লাসে ঢুকে নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজের দিগ্বিজয়ী অধ্যাপকগণের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালীও ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক্ষণে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালী ছাত্রবর্গ ধর্ম্মঘট করিয়া তাঁহাদের নিকট সহানুভূতি ও সমর্থন প্রত্যাশা করিয়াছিল। একজন প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার যে সাহস, তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। ছাত্র-সমাজের সহিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সংযোগের সংবাদ বড় পাওয়া যায় না। বরং তিনি তাঁহার গবেষণাগারে গভীর গবেষণা লইয়াই আত্মসমাহিত এই কথাই আমরা জানি কিন্তু এই ধর্ম্মঘটের সময়ে প্রেসিডেন্সীর ছাত্রগণ যদি কাহারও নিকট সমর্থন পাইয়া থাকে, তবে ঐ আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কাছেই পাইয়াছে। সেদিনের সেই ছেলেরা আজও—আজ তাহারা বৃদ্ধ না হৌক, নিকট-বার্দ্ধক্য, প্রবীণ ত বটেই!—সাতিশয় বিস্ময়ে বলে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে কেন বিরূপ হইলেন তাহা আমরা ভাবিয়া পাই নাই।

ওটেন সাহেব দন্তে তৃণধারণ করিয়া অসঙ্গত উক্তি প্রত্যাহার, ত্রুটী স্বীকার ও দুঃখ প্রকাশ করিলেন; ধর্ম্মঘটও ভাঙ্গিল। কিন্তু 'স্বভাব না যায় ম'লে ইল্লৎ

না যায় ধুলে'। কিছুদিন পরে আবার একটা বেফাঁস বলিয়া বসিল। ছেলেরা প্রতিবাদ করিল! ওটেন রাজার জাতি, রাজকর্ম্মচারী—দম্ভে ও ঔদ্ধত্যে লর্ড কিচেনারেরও উপরে যায়। জন বুলের বুল-ডগি গোঁ! অঙ্গার শতধৌতেন......

ছেলেরা ভাবিতে লাগিল, এ রোগের ঔষধ কি?

যীশুখৃষ্ট এক সহস্র নয় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে গত হইয়াছেন; শ্রীচৈতন্যও ন্যূনপক্ষে পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বেকার লোক; মহাত্মা গান্ধীর নাম তখনও ভারত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে ধ্বনিত হয় নাই। ছেলেরা সর্ব্বরোগনির্ম্মূল-কারক ঠোকন্-টনিকের ব্যবস্থা করিল। লাঠ্যৌষধির তুল্য মহৌষধি যে নাই তাহা কে না স্বীকার করিবে? স্থির হইল, অমুক ঘণ্টার পর অমুক ঘণ্টায় ওটেন যখন সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া অমুক ক্লাসে যাইবে, সেই সময়ে সিঁড়িতে সেই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রোগাম পাকা, চিকিৎসক প্রস্তুত। সুভাষ বার বার অফিস ঘরে উঁকি মারিয়াছিলেন—ওটেন আসিয়াছে কি-না! এখনও আসিল না কেন! আসিয়াছে, বাঁচা গেল। কি করিতেছে? বই দেখিতেছে! কখন নামিবে ইত্যাদি, ইত্যাদি! আমি জানি না হয়ত সুভাষের উপর খবরাখবর রাখিবার ভার ছিল। কিম্বা হয়ত চিত্তাবেগ তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সে যাহাই হৌক, ইহারই ফলে সুভাষচন্দ্র ধরা পড়িলেন। কলেজ অফিসের বেয়ারা সাক্ষ্য দিল, এই বাবুটি হুই সাহেবের খোঁজ করুচ্ছন্তি। সে কথা পরে বলিব।

অপারেশন স্যকসেসফুল! ওটেন তাহার দেশী ভাষায় যীশুকে স্মরণ করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। ছেলেরা যে যেখানে পারিল, চম্পট পরিপাটি! হিন্দু হোস্টেল পাশেই, বহু ছাত্র সেইখানে জমায়েৎ হইল; সকলেই, সৎ, সাধু ও ভালমানুষ।

মিঃ জেমস্ প্রিন্সিপ্যাল। আয়েডিন্টিফিকেসন প্যারেডের হুকুম দিলেন। চারিদিকের গেট বন্ধ, তালা পড়িল। সুভাষ হোস্টেলে ছিল কিন্তু প্যারেডের সময় তাঁহাকে পাওয়া গেল না। সুভাষের বন্ধু হেমন্ত পর্য্যন্ত অবাক্, সুভাষ গেল কোথায়? পরে জানা গিয়াছিল, প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া সুভাষ স্থানান্তরগমনে বাধ্য হইয়াছিল। গোলমালের মধ্যে কিছু বিচলিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নহিলে হোস্টেল সংলগ্ন মাস্ প্রিভিতে ভদ্রসন্তান ঢুকিয়া পড়িবে কেন? হিন্দু হোস্টেলে ছাত্রগণের শৌচাগারও ছিল, তাহা সত্বেও তিনটা কলেজ-স্কুল-হোস্টেলের ভৃত্যবর্গের টানা-পায়খানায় সে ঢুকিয়া পড়িল কেন? সাময়িক উত্তেজনা অথবা মানসিক উৎকণ্ঠা ভিন্ন আর কি হেতু থাকিতে পারে?

সুভাষ স্বয়ং শিব হইয়া (শিব একজন নামজাদা ফিজিসিয়ান চিকিৎসক) ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিল কিনা বলা যায় না ; এবং 'শ্রেণী সনাক্তে' সনাক্ত না হইলেও অফিস বেয়ারার সাক্ষ্যের বলে তাঁহার 'যাবজ্জীবন' দণ্ড হইল। সুভাষচন্দ্র রাষ্টিকেটেড হইলেন। বিনা দোষে দণ্ড হইল কিনা তাহাও বলা শক্ত। তবে স্বহস্তে কুকর্ম্মটি (কু না সু ?) না করিলেও দলে যে ছিলেন তাহাতে ত কোনই সন্দেহ নাই। সম্পূর্ণ বিনাদোষ বলা যায় না। 'এডিং' ও 'এবেটিং' আইনের চোখে অপরাধ নিশ্চয়ই ! তবে কথা, লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইল কি-না ! কিন্তু, গুরুদণ্ড যদি হইয়াই থাকে, তাহাতেই বা কি ! বৃটিশ-বিদ্বেষানলে ওটেন-নাটক যে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল, ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ পাইবেন না, তাহা নিশ্চয় বলা যায়।

রাষ্টিকেটেড হওয়ার ফলে আত্মীয় স্বজনগণ মধ্যে নিরাশার ঝটিকা প্রবাহিত হইল। যাহাকে আমরা সচরাচর প্রমিস্ (প্রতিভা ?) বলি, সুভাষ তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে ; কাজেই মনোভঙ্গ হওয়াই স্বাভাবিক।

সুভাষের পিতৃবন্ধু, কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত শিক্ষাবিভাগের পদস্থ বহু ব্যক্তির সহিত সুপরিচয় ছিল। তিনি সুভাষকে একদিন ওটেন প্রসঙ্গে চিকিৎসকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সুভাষ অজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সুভাষচন্দ্র মিথ্যা কথা বলিবেন ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না। যাহাই হৌক, ওটেন নাট্যের নায়ক হিসাবে তাঁহার যে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি তাহা ঘুচিবার নহে ; ঘুচিয়া কাজও নাই। তবে একটা কথা ঠিক। সুভাষচন্দ্র নির্দ্দোষ না হইলেও এডিং ও এবেটিঙের অপরাধের তুলনায় রাস্টিকেশন-শাস্তি কি একটু বেশী কঠোর বলিয়া মনে হয় না ? তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে বৃটিশ-বিদ্বেষ জমাট্ না বাধিলে সুভাষচন্দ্র সার্থক হইতে পারেন না। তাই আমাদের বিবেচনায়, "ঈশ্বর যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।"

গাঙ্গুলি মহাশয় কলিকাতায় স্যার আশুতোষের শরণ লইলেন। আশুতোষ আশুতোষই বটেন ! বলিলেন, কোন কলেজ যদি তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে চায়, আমি তাহাতে মত দিব। ইউনিভার্সিটির পক্ষ হইতে কোন বাধা উপস্থাপিত না হয়, তাহা আমি করিব। বাঙ্গলাদেশে এত বড় কথা বলিতে এক আশুতোষই পারিতেন। অতঃপর গাঙ্গুলী মহাশয় কলেজে কলেজে ঘুরিতে লাগিলেন। কটকের র‍্যাভেন্সা কলেজ আঁৎকাইয়া উঠিল; বাপ্‌রে ! আরও অনেকে চক্ষু কপালে তুলিল।

স্কটিশ কলেজের আকু´হার্ট সাহেব অধ্যক্ষ। স্কচ্ পাদরী—নামেও, কাজেও। বলিলেন, আমি ভর্ত্তি করিয়া লইব। এমন একটা ভাল ছেলের জীবন নষ্ট হইবে : সে কোন কাজের কথাই নহে।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের চেষ্টা সার্থক হইল ; তিনি কটকে খবর দিতে চলিলেন। সুভাষ তখন কটকে।

কটকে ছাত্র সমিতি হইয়াছে, পাঠাগার হইয়াছে, ব্যায়ামাগার পুরা দমে চলিতেছে। সুভাষ সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বাধ্যক্ষ। কলেজে পড়াশুনার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে তখন জাতি গঠনে মনঃসংযোগ করিয়াছে। সুভাষের গায়ের জোর ছিল না; হাতে-পায়েরও জোর এত কম যে ব্যায়ামাগারের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়াও একটি বারের তরে প্যারালাল বারের একটা হাতায় হাত দিবার তাখতও তাঁহার হয় নাই। ড্যাম্বেল, ট্রপিজ এসকলে দূর হইতেই সে নমস্কার করিত। ড্রিল ও ড্রয়িংকে তাঁহার বড় ভয়।

ড্রিলে ভয় এই কথা আমি বারবার বলিয়াছি ; অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে ড্রিল করিতেও দেখা যাইতেছে। ওটেন-নাকটকাভিনয়ের পরে যখন 'ব্রজের খেলা সাঙ্গ করিয়া' সুভাষ কটকে আসিয়া জাতি সংগঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন, তখন এক বিরাট যুব সঙ্ঘ গঠন করিয়া প্রতিদিন সামরিক কায়দায় (ইহাই ত ড্রিলের অপর নাম) কটক হইতে বহুদূর বারাং ও নারাজের পার্ব্বত্য অরণ্য পর্য্যন্ত মার্চ্চ করিতেন। সেদিন 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' লিখিত হয় নাই ; তাই "কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ ? আমরা মুছাব কালিমা তোমার" গাহিয়াই বঙ্গজননীকে প্রবোধিতে হইত।

তারপর, ইউনিভার্সিটি কোরের কথা আমি আগেই বলিয়াছি। আরও একটি অধ্যায় আছে। শৈলেন গাঙ্গুলী নামক এক বন্ধুকে সুভাষ 'ধরে বেঁধে' ৪৯ বেঙ্গলী রেজিমেন্টে পাঠাইয়া দিয়াছিল। শৈলেনও যাইবে না, সুভাষও ছাড়িবে না। রাজপুত রমণীরা নাকি তাহাদের কাপুরুষ স্বামীগুলাকে যুদ্ধে না গেলে, তাহাদের জন্য রুটি বানাইতে নারাজ হইত! এমন কি, বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিত। শৈলেন গাঙ্গুলীর বেঙ্গলী রেজিমেন্টে যোগদান করিয়া মোশাপাটমিয়ার যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে ততখানি কঠোরতা সুভাষকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল কি-না তাহার এবং ততটা অধিকার একের উপর অন্যের ছিল কি না তাহা আমি বলিতে পারিব না বটে তবে সুভাষের প্ররোচনা নহিলে শৈলেন যে যুদ্ধে না গিয়া গাঁজায় বুঁদ হইয়াই থাকিত, তাহা ত চোখেই দেখিতে

পাইতেছি। শৈলেন গাঁজা খায় এখবর আমি পাই নাই, তবে গাঁজা বেচে তাহা জানি। আমাদের সমাজে খাওয়া ও বেচা প্রায় একই কথা। নহিলে 'মামা' হইয়াও শুঁড়ী অপাংক্তেয় কেন ?

এই সময়কার একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছি। সুভাষ যখন অত্যন্ত বালক, স্কুলের ছাত্র, সেই সময়ে রোগীর সেবা, মৃতের দাহ এবং এবম্বিধ কার্য্যে তাহার অসামান্য আসক্তির সংবাদ আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি। আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে, বিতাড়িত হইয়া আসিয়া কটকে বসিয়া জাতিগঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত কটকের জনসাধারণের সহিত সুভাষ নিঃসম্পর্কীয় ছিলেন, ইহাই আমার খবর। আমার বিশ্বাস, সত্য আমার দিকে।

সেদিনের ঘটনাটি বলি। ক্লাব হইতে হৌক আর পাঠাগার হইতেই হৌক, 'নেতাজী' তাঁহার দলবল সহ গৃহের পথে চলিতেছিলেন। পথিপার্শ্বস্থ এক জীর্ণ গৃহ হইতে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিতেছিল। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে বাঙ্গালীর বিলাপ ধ্বনিতে একই সুর ধ্বনিত হয়; একই বার্ত্তা প্রচার করে। হঠাৎ সেইদিন সুভাষের কৌতূহল জাগিল, কে মরিল, কি রোগে মারা গেল, বিস্তারিত সংবাদ জানিতে বাসনা জাগিল। ভিতরে গিয়া জানা গেল, বসন্তে গৃহস্বামীর পুত্র-বিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু ইহাই শেষ নহে! বসন্তে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কেহই শব বহন করিতে রাজী হইতেছে না, বসন্ত ব্যাধির সংক্রমণের ভয়। সুভাষ তাঁহার দলবল সহ শব বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া দাহ করিলেন। সে বছর বসন্ত মহামারীর রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, কটকে বহু লোকের মৃত্যু হয়। এক সময়ে অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, এক বাড়ীতে যতগুলি লোক সকলেই রোগাক্রান্ত; 'কে কাহার মুখে জল দেয়' তাহার ঠিক নাই। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এই সময়ে তাঁহার দল সেবা কার্য্য করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তির সুযোগ পাইয়া সুভাষচন্দ্র কটক পরিত্যাগ করিলেন। বি, এ, পরীক্ষার ফল ভালই হইল এবং এম, এ, পড়িতে উদ্যোগ আয়োজন হইবার পূর্ব্বেই অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে যাইতে হইল। সিভিল সার্ভিসে মাত্র ৮ মাসের চেষ্টার ফলে সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই জানেন; রচনার গুণানুসারে ইংরাজের দেশে ইংরাজীতে তাঁহার স্থান সর্ব্বাগ্রে হইয়াছিল,

ইহাও কাহারও অজানা নাই কিন্তু পরীক্ষা দিয়া আসিয়া তাঁহার মনোভাবটা কিরূপ তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতেই অনুমিত হইবে। ফিটস্ উইলিয়াম হল, কেম্ব্রিজ হইতে ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২০ সালে এই পত্র লিখিত।

"আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে—আমার ভাল হয় নাই। পাশের তো কোন আশা নাই-ই—এমন কি ভাল নম্বর পাইব এরকম আশা করিতেও পারি না।"

ইহা ত আশাব্যঞ্জক ভাষা নহে; এই পত্রের ছত্রে ছত্রে শব্দে শব্দে অক্ষরে অক্ষরে নিরাশা ঝঙ্কৃত। এই দ্বিধা সুভাষের চরিত্রের সহিত খাপ খায় বলিয়া মনে হয় না; আবার অবিশ্বাস করারও উপায় দেখি না। আমার মনে হয়, সুভাষ মনে মনে—অতি গোপনে—আপনারও অজ্ঞাতসারে, সাফল্য অপেক্ষা অসাফল্যই কামনা করিতেছিল। বাল্যকাল হইতে আত্মপ্রত্যয় এতই অধিক পরিমাণে তাঁহার ছিল যে, মাত্র ৮ মাস কাল মধ্যে আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে তাঁহার দ্বিধা হয় নাই; হয়ত এমনও হইতে পারে যে সাফল্যেও তাঁহার সন্দেহ ছিল না, তখনি তাঁহার অন্তরের গহনের অভিলাষ সন্দেহের আকারে উক্ত পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। এই অসাফল্যকে—যদিই সে আসে—কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও সুভাষের স্থির করা ছিল। সেই প্ল্যান সে চারুকে একখানা চিঠিতে লিখিয়াছে।

"I have not yet been able to decide what course, in the event of my failure in the I. C. S. I should go in for further specialisation. I have got to reconcile two considerations. I should choose the subject in which I can do the gratest amount of work and the subject on which I can depend for a living."

"আই-সি-এস্ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে কি যে করিব, কোন্ বিশেষ পরীক্ষার জন্য তৈরী হইব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। যাহাই ঠিক করি না কেন, দু'টি বিষয় ভাবিবার আছে। কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে অধিক মাত্রায় কাজ করিতে পারিব এবং জীবিকা উপার্জ্জন করাও সম্ভব হইবে, ইহাই এখন বাছিয়া লইতে হইবে।"

তবে জীবন তরণীখানি যেন অনির্দ্দেশ্য ভাবে অজানা স্রোতে, অজ্ঞাত দেশে ভাসিয়া না যায়, সে বিষয়ও চেতনার অভাব তাঁহার ছিল না।

যাক্, সুভাষচন্দ্র সম্মানের সহিত পাশ করিলেন কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার জন্য

অন্য পথ নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, স্বর্ণশৃঙ্খলের সাধ্য কি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখে? যে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গম একদিন নীলনভোমণ্ডলে, মেঘের মাঝে, রৌদ্রের কিরণে, কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তরে ঝঞ্ঝা বিদ্যুত বজ্রের সঙ্গে বিহার করিবে; গহনে বিপিনে পুলিনে, নলিনে, প্রান্তরে কান্তারে, পর্ব্বতে কন্দরে স্বাধীনতার কলগীতি গাহিয়া বেড়াইবে; দেশ হইতে দেশান্তরে, সাগর হইতে মহাসাগরে, বিপদ হইতে মহাবিপদে, জীবনে মরণ যাচিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম করিয়া বেড়াইবে, তাঁহাকে বাঁধিবে, তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবে কে? রত্নাকরগর্ভেও হেন রত্নরাজি নাই তাঁহাকে ফিরাইতে পারে?

নহিলে কি তুচ্ছ কারণে যে আই-সি-এস্ চাকুরী সুভাষচন্দ্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা যে কত তুচ্ছ কত অকিঞ্চিৎকর কে তাহা অস্বীকার করিবে? বারুদের স্তূপ সজ্জিত ছিল, একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা। পরীক্ষা পাশের পর আর একটা পরীক্ষা (ছোট খাট) দিতে হইত। তাহার পাঠ্য হিসাবে একখানি প্রাইমার ছিল। প্রাইমারের এক স্থানে ছিল INDIAN SYCE IS DISHONEST. ভারতীয় সহিস অসাধু। স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে কথাটা যে খুব দোষণীয় তাহা বলা যায় না; আবার ভারতবর্ষের সমস্ত নিম্নজাতীয় লোককে অসাধু পর্য্যায়ভুক্ত করাও অন্যায়, ইহাও বুঝিতে পারি। কিন্তু এটা এমন একটা 'মারাত্মক' ব্যাপার নহে যে, দাঁড়িপাল্লায় আই, সি, এসের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে।

পরীক্ষক সঙ্ঘ সুভাষের সহিত একমত যে ঐ ছত্রটি না থাকাই উচিত ছিল এবং ঐ প্রাইমারের ভবিষ্য সংস্করণে ছত্রটি যাহাতে বিলুপ্ত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেও তাঁহারা প্রতিশ্রুত; কিন্তু এ বৎসরও ঐ প্রাইমার স্পর্শ করিব না, সুভাষের এই অভিমতের সহিত তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না। সুভাষের জিদ অটুট রহিল। আই-সি-এস্ না ছাড়িয়া আর উপায় নাই। যে জিদ একদিন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবে সেই জিদ, সাপের জিহ্বায় বিষের মত অনন্তকাল ব্যাপ্ত!

চাকরীতে ইস্তফা দিয়া ফিট্স উইলিয়াম হলে (প্রবাসে সুভাষের বাসস্থান) ফিরিয়া আসিতে, হলের প্রভোষ্ট বলিলেন "I was suprised that an Indian could give up an appointment in the I. C. S. I was sorry that you gave up the job over a trifling matter. But I am glad that a man of your calibre has been freed from



নো-ম্যান্স ল্যাণ্ডে 'জিয়াউদ্দিন'

the shackles of service." "একজন ভারতবর্ষীয় লোক যে আই-সি-এস্ চাকরী ছাড়িতে পারে ইহা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম! এত তুচ্ছ কারণে চাকরী ছাড়ায় আমি দুঃখিত তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমার মত প্রতিভাসম্পন্ন লোক যে চাকরীর শিকলে বাঁধা পড়িলে না, ইহাতে আমি আনন্দিত!"

"কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন।
ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন।
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,

* * *

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর।

* * *

আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।

* * *

ওরে অগাধ বাসনা অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই,
জাগিয়াছে সাধ চরাচরময়,
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।

* * *

আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে কোন্ দেশে—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান;
উদ্বেগ অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।"

কিন্তু সুভাষের নিজের মনের ভাবটা তখন কিরূপ? আমি তাঁহার হাতের লেখা, সেই তারিখের একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"তুমি জান একবার (Otenisationএর জন্য) কর্ত্তব্যের অহ্বানে জীবন তরী ভাসিয়ে দিয়াছিলাম। [এখানে সুভাষ স্বীকার করিতেছেন দেখিতেছি যে, ওটেনকে ঔষধ প্রয়োগ ব্যাপারে তিনি চিকিৎসকেরই ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। তাই মনে হয় না কি? অবশ্য এমনও হইতে পারে যে, পাঠ্য জীবনের প্রায় দু'টি বৎসর নষ্ট হওয়ার কারণেই এই আক্ষেপ বা অনুতাপ?—লেখক।] ভগবান সেই তরীকে রম্য উপবনে উপনীত করালেন যেখানে power, prosperity, wealth (ক্ষমতা, সমৃদ্ধি ও অর্থ) সবই আমার করতলগত হলো। কিন্তু আমার হৃদয়ের অন্তরতম স্থল থেকে আহ্বান আসচে যে এসবে আমার আনন্দ নাই। আমার একমাত্র আনন্দ সাগরের উর্ম্মিমালার সঙ্গে নেচে বেড়াতে।" কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য এই ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সুভাষচন্দ্রের জীবন-তরীর!

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গই বটে।

সুভাষের অভ্যন্তরে ভস্মাচ্ছাদিতকায় যে সন্ন্যাসী বালককাল হইতে আশ্রম গড়িয়া, ধুনি জ্বালাইয়া ঈশ্বরাধনায় বসিয়াছিলেন, সিভিল সার্ভিসের স্বর্ণদণ্ডেও তাঁহার নির্লোভ। চারু যখন লিখিল, "ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, I. C. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও!" তখন সুভাষ লিখিলেন—"ভগবানের নিকট যদি আমার জন্য প্রার্থনা কর তাহা হইলে অনেক উচ্চ জিনিষ আছে যাহার জন্য প্রার্থনা করিতে পার। তুচ্ছ পরীক্ষা পাশের জন্য কেন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে?"

অন্য একখানি পত্রে প্রার্থনীয় বস্তুর (উচ্চাভিলাষ) তালিকাও দিয়াছেন।

"যদি কখনও আমার জন্য প্রার্থনা কর তাহা হইলে প্রার্থনা করিও যেন নীচতা ও স্বার্থপরতা আমার মনকে কলঙ্কিত না করে। তাহা হইলে, আমি জীবনে সুখী হইব এবং আমার জীবনের কর্ত্তব্য করে যেতে পারব। মানুষের সব দুর্ব্বলতা ও দোষের মূল হচ্ছে এই দুইটি দোষ—নীচতা ও স্বার্থপরতা।"

সমগ্র ভারতের স্বার্থ, চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থ—ভারতের পরাধীনতা বিলোপের স্বার্থ, ভারতবাসীর পরবশ্যতা বিমোচনের স্বার্থ যদি স্বার্থ-পরতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে সুভাষের অপেক্ষা বড় স্বার্থপর ত এযুগে—একালে—এ শতাব্দীতে—এ পৃথিবীতেও দেখি না।

চাকরী ছাড়িয়া ত দেওয়া হইল ; কিন্তু "future plan" ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পন্থা কি ?

"একবার মনে হচ্ছে গান্ধীর কাছে যাব। একবার মনে হচ্ছে, কবির নিকট বিশ্বভারতীতে থাকবো। একবার মনে হচ্ছে Journalist হবো। একবার বা মনে হচ্ছে সন্ন্যাস নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবো।"

এ সেই সেইদিনের মনের কথা, যেদিন আই-সি-এস-স্বর্ণ নিগড় ছিন্ন হয়। সেইদিন সেই ক্ষণে মন যাহা চাহিয়াছিল, সবই করিয়াছে ; সবই পাইয়াছে। গান্ধীজীর প্রভাব যে কত বড়, তাহা লিখিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে—মণি-কোঠায় সুভাষের স্থান সেইদিন জানা গিয়াছিল যেদিন নীড়চ্যুত পক্ষীশাবকটিকে পক্ষীমাতার মত বক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া স্নেহে, প্রেমে, সান্ত্বনায় ক্ষতের বেদনা কবি নিঃশেষে মুছিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজী হইতে জওহরলাল পর্য্যন্ত সবাই যখন ত্যাগ করিয়াছে, সমগ্র ভারত বাঙ্গলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, সেই দুর্দ্দিনে সেই দুর্য্যোগে কবির প্রসারিত বক্ষের স্নেহ-প্রস্রবণ ব্যতিরেকে সম্বল আর কি ছিল ?* আর সন্ন্যাস গ্রহণ ? শঙ্কর, বুদ্ধ, শিবাজী, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, গান্ধী ও সুভাষের সন্ন্যাসে ভারত পবিত্র। রামকৃষ্ণ মিশন যত বৃহৎ, যত সুদূর বিস্তৃতই হৌক, সুভাষের পক্ষে তাহা নাতিবৃহৎ! সুভাষ 'মিশন' গড়িয়াছেন, এই বিপুলা পৃথ্বীময়। মালয়ে দেখ, সুভাষের মিশনের পতাকা ; ব্যাঙ্ককে দেখ, জাভায় দেখ, ভারতে দেখ, ব্রহ্মে দেখ, পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত পরাধীম দেশে, পরাধীন জাতিসমাজে দেখ, দেখিবে সুভাষ! বাতাসে সুভাষ, মানসে সুভাষ, বাসনায় কামনায় সুভাষ! ভারতের ত কথাই নাই ; ভারত সুভাষময়!

"যদি বুঝিতাম আমার দেশে, আমার ভারতবর্ষে স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম চালিত হইতেছে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট তাহা হইলে আমি কখনই আমার দেশ, আমার ভারতবর্ষ, আমার স্বজনগণকে ছাড়িয়া এই বিপদসঙ্কুল অনিশ্চিতের মধ্যে ছুটিতাম না। কখনই আমি মৃত্যুর মুখে ছুটিতাম না।

"যখন বুঝিলাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশের উচ্ছেদ সাধনে সক্ষম হইবে না, তখনই আমি মৃত্যুর মুখে ছুটিলাম।

* কৌতুহলী পাঠিকা ও পাঠক বিস্তারিত বৃত্তান্ত আমার "আজাদ হিন্দের অঙ্কুর" নামক গ্রন্থে পাঠ করিতে পারিবেন।—লেখক।

"যেদিন বুঝিলাম যে, সংগ্রাম ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে চলিতেছে, ভারতের বহির্ভাগ হইতে তাহাকে সাহায্য করিলে সেই সংগ্রাম শক্তিশালী হইতে পারিবে, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে, সেইদিন, আমি আমার দেশ, আমার আযৌবনের কর্ম্ম-স্থল, আমার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলাম।

"ভারতের অভ্যন্তরে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতেছে বাহির হইতে তাহাতে সহায়তা করা কঠিন। কতটুকুই বা করা যাইতে পারে? কিন্তু এখন তাহার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। অক্ষশক্তি প্রহারে প্রহারে বৃটিশকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে; বৃটিশের দম্ভ, বৃটিশের মর্য্যাদা আজ ধূলায় লুটাইতেছে। তাই আমাদের কাজ এখন সহজ হইয়াছে।"

১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরের জনসভায় সুভাষচন্দ্র ঐ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন—

"কেন দেশ ছাড়িলাম? সেই কথাটাই আপনাদের কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে বলিব। আপনারা ত জানেন, যেদিন বিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। ১৯২১ সালে বিদ্যালয় বর্জ্জন করিয়াছি সেই দিন হইতেই সংগ্রামে নিযুক্ত আছি। বিগত দুই যুগাধিক কাল ধরিয়া যতগুলি আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছে, যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। তা' ছাড়া ভারত সরকার বাহাদুর যখনই ইচ্ছা করিয়াছেন, বিনা বিচারে—কেবলমাত্র সন্দেহে নির্ভর করিয়াই আমাকে হয় কারাগারে, না-হয় অন্তরীণে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—কি অহিংস কি হিংস্র ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত আমার সংযোগ ছিল, এখনও আছে।"

ইচ্ছায় হৌক, অনিচ্ছায় হৌক, গভর্ণমেণ্ট আর কাহারও কাছে পা'ক আর নাই পা'ক, আমার কাছে একটা প্রশংসাপত্র পাইতে পারে। অহিংস আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের সংযোগের সংবাদ ত সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু হিংস্র আন্দোলনও যে তাঁহার নিকট অরুচিকর ছিল না গভর্ণমেণ্টের এই যে বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের বলে তাহারা ১৯২৪ সালে তরুণ সুভাষচন্দ্রকে কর্পোরেশনের চীফের আসন হইতে ঘাড় ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া ব্রহ্মের মান্দালয়ে অন্তরীণে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, দেখা যাইতেছে যে তাহাদের বিশ্বাস ভ্রান্ত নহে! তখন হয়ত সুভাষচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে হিংস্র আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন না ইহা ঠিক কিন্তু তাঁহার অন্তর যে 'রক্তরাগরঞ্জিত'

ছিল গভর্ণমেণ্ট যদি তাহা অনুমান করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া থাকে, তাহা হইলে আর যাহাই করুক, ভুলভ্রান্তি করে নাই। বৃটিশ খয়রাতি কারবার করিতে ভারতে আসে নাই ; সে আসিয়াছে শোষণের উদ্দেশ্যে। শোষণ করিতে হইলে শাসন করিতে হয়, অশাসনে শোষণ চলে না। তাহার সেই শোষণ কার্য্যের বিরুদ্ধতা সে সহ্য করিবে কেন ? কাজেই সুভাষকে তাহার শত্রু বলিয়া যে মুহূর্ত্তে জানিতে পারিয়াছে, তখন হইতেই সে কারাগার ও অন্তরীণের ব্যবস্থাপত্র রচনা করিয়া রাখিয়াছে। বৃটিশের টিকটিকি গিরগিটি সম্প্রদায়েরও প্রশংসা করিতে হইবে। সুভাষের অন্তর যে বৈষ্ণবের অন্তর ছিল না, নরমুণ্ডে নরশোণিতের অর্ঘ্য সজ্জিত করিয়া শাক্ত জননী মহামায়ার পূজার আয়োজন যে সুভাষের অন্তরেরই বাসনা, দুই যুগ পূর্ব্বেও তাহারা তাহারই সন্ধান পাইয়াছিল। ধন্য বৃটিশের টিকটিকি, গিরগিটিকুল! তোমাদের অগম্যস্থান নাই, তোমাদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই, তোমাদের অজ্ঞাত চিন্তাও নাই !

সাধু উত্তমচাঁদ কাবুলে সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য ১৭৫৭ সালে সিরাজদ্দৌলাকে কেহ আশ্রয় দেয় নাই। সেদিন পাপিষ্ঠ মীরজাফরের পামর আত্মজ মীরমদনের কবল হইতে সিরাজকে রক্ষা করিতে পারিলে বঙ্গের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য শ্রী ধারণ করিত।

ইংরাজ-বণিক কায়মনে সিরাজের নিধন কামনা করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে সিরাজকে হত্যা করিবার সাহস বোধ করি সেদিন সেই জালিয়াৎ ক্লাইভেরও ছিল না। সে কাজ নরাধম মীরজাফর ও তাহার পুত্র মীরনের দ্বারা সাধিত হয়, ইংরাজ বণিক তাহাই চাহিয়াছিল ; তাহাই হইয়াছিল। মীরনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমস্ত ভারতবর্ষ দুই শত বর্ষ ধরিয়া করিয়াছে।

সাধু উত্তমচাঁদ মীরন নহেন। বিদ্রোহী বীরকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, নির্য্যাতন, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার একশেষ সহিতে হইয়াছে ; তথাপি কম্পিত নহে, সাধুর অন্তর। ভবিষ্যদ্বাণী করা শোভা পায় না তাহা আমি জানি ; তবু বলিতে ইচ্ছা হয় যে, সুভাষ প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ সরকারের স্মৃতি যদ্যপি ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলে এই নরোত্তম ব্যক্তিও মানুষের মনোমন্দিরে আসন প্রাপ্ত হইবেন।

উত্তমচাঁদ লিখিত বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সুভাষচন্দ্র রাশিয়ার উপরই সমধিক ভরসা করিয়াছিলেন ; কিন্তু যে কারণেই হৌক,

রাশিয়ার আশায় বামে ছুরী হইয়া পড়ে। অত্যাচারী জারের কবলমুক্ত রাশিয়া জনগণের অধিকারের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে ; পৃথিবীর নির্য্যাতিত জনগণের সহিত তাহাদের সমবেদনা ও সহানুভূতির এত গাল গল্পই শোনা যায়, এমন কি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাশিয়া সক্রিয় সহায়তা দানেও কুণ্ঠিত নহে, শুনি ; অথচ সুভাষের মত স্বাধীনতাকামী দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যাধ্যক্ষকে হাতে পাইয়াও ভারতবর্ষের নিপীড়িত জনগণের প্রতি বাস্তব সহানুভূতি প্রদর্শনের কোন চেষ্টাই করিল না কেন, ইহা এক সমস্যা বটে! এই প্রসঙ্গে একটা হাসির কথা মনে পড়িয়া গেল। দিল্লীতে, ১৯৪৬ সালের মে মাসে যখন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স দুইজন সহকর্ম্মী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষীয় জননেতৃবর্গের সহিত রাজনৈতিক আপোষ মীমাংসার আলোচনা করিতেছেন, সেই সময়ে সেই দিল্লীতে, লর্ড পেথিক লরেন্সের কাণের পাশে, মুস্লিম লীগ বক্তৃতার কামান দাগিতেছিলেন। লর্ড পেথিক লরেন্স সে বাক্য-কামান গর্জ্জনে কাঁপিতেছিলেন কি না জানি না।

“দিল্লী-প্রাসাদ-কূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার তন্দ্রা যেতেছে ছুটে”

কি-না তাহাও বলিতে পারি তবে অনেকে যে প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া বাঁচিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত আছি। স্যার ফিরোজ খাঁ নূন নামে এক মান্যগণ্য বদান্য ব্যক্তি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, বৃটিশ যদি মুস্লিম লীগকে উপেক্ষা বা অনাদর করিতে সাহস করে তাহা হইলে আমরা (মুস্লিম লীগ) আমাদের প্রতিবাসীর শরণ লইব। মনে থাকে যেন এই প্রতিবাসী জার্ম্মানীর গর্দ্দানা লইয়াছে, বড় যে সে লোক নহে। এবং প্রতিবাসীর আস্তানাও অধিক দূর নহে ;—পাশাপাশি, এক পাহাড়ের পাঁচিলটি মাত্র ব্যবধান।

গল্পের আরম্ভ যখন বলিলাম, শেষটাও বলিতে হয়। এত ঘনঘন কামান গর্জ্জন শুনিয়াও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছে তাহা করিতে কেবল ইংলণ্ডের এইচ, এম, জি (HIS MAJESTY'S GOVERNMENT) কেন, যে কোন ভদ্রলোকেরই ভদ্রতায় বাধিত। স্যার ফিরোজ খান নূন টেবিলে বসিয়াছেন, সানকিতে খানা দেওয়া হইয়াছে, খানাও কি যেমন-তেমন ? রাজবাড়ীর খানা, বুঝিতেই পারিতেছেন, চর্ব্বচুষলেহ্যপেয়ে সুসমৃদ্ধ। নূন সাহেব নুলোটি বাড়াইয়াছেন, গ্রাস মুখে তুলিবার উপক্রম দেখিবামাত্র লর্ড পেথিক লরেন্স ও বড়লাট ওয়াভেল শশব্যস্তে সানকিগুলা সরাসরি সরাইয়া ফেলিলেন। ‘জিভের জল জিভে রয়ে

গেল, চোখে বহে গেল দরিয়া।' হায় স্যার ফিরোজ খান নূন! কোথায় বা প্রতিবাসী রাশিয়া, কোথায় বা কে! কাকস্য পরিবেদনঃ।

গল্পটার আর একটু বলিতে হইতেছে। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের একাংশ কংগ্রেস বর্জন করিয়াছিল। সেই একাংশে ছিল, ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন। কংগ্রেস এই অংশ বর্জ্জন করিতেছে জানিবামাত্র মুস্লিম লীগ সেই অংশ সাদরে স্বীকার করিয়া লয়। বড় আশা, ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্টটি একক মুস্লিম লীগই গঠন করিবে। গাছে কাঁঠাল, গোঁফে ফুলেল তেলের যখন বন্যা বহিয়া যাইতেছে, ঠিক সেই সময়ে বড়লাট ও মন্ত্রীমিশন প্ল্যানখানাই বাতিল করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, শিব-হীন যজ্ঞ করিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মত নির্লজ্জেরও চক্ষু-লজ্জা হইয়াছিল। কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন করিলে আর যাহাই হৌক, শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইত না। লীগ-প্রেমিক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এটুকু বুদ্ধি ছিল, তাই প্ল্যানই বাতিল হইল। লীগ ও তস্য নায়ক কায়েদ আজম বড়লাট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রাশ নাম ধৃত করিলেও, রাগ পড়িল কংগ্রেস ও হিন্দুর উপর। হিন্দুকেই শত্রু বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিল। অদূর ভবিষ্যতে যেদিন এই অপমানের প্রতিশোধ লইল, সেদিন সে আগুনে (একদিনে না হৌক, এক সপ্তাহ মধ্যে) অর্দ্ধলক্ষাধিক হিন্দু নরনারী ও শিশু কীট-পতঙ্গের মত লীগের প্রতিহিংসানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল। এই দাবাগ্নি প্রথম প্রজ্জ্বলিত হয়, আমাদের এই কলিকাতা সহরে। ক্যাবিনেট মিশন বিদায়ের তিন চার মাস পরে। ১৬ই আগষ্ট তারিখে।*

রাশিয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়াই সুভাষচন্দ্র ইটালী ও জার্ম্মানীর শরণ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেনঃ অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেই ইটালীর দূতাবাসের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। এখানেও সেই কথা! শত্রুবিনাশ মুখ্য উদ্দেশ্য! উদ্দেশ্য সফল করাই লক্ষ্য। উত্তমচাঁদ বলিয়াছেন, সুভাষচন্দ্রের কাবুলে অবস্থান কালে এক একটি দিন বিফলে যাইত আর তিনি (সুভাষচন্দ্র) অস্থির হইয়া পড়িতেন। প্রায় দেড়মাস কাবুলে উত্তমচাঁদের গৃহে অবস্থিতির পর ১৯৪১ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখের বেলা ৯টার সময়ে সুভাষচন্দ্র 'এলায়েস' জিয়াউদ্দিন কাবুল ত্যাগ করিলেন। বাঙ্গলার সুভাষ – ভারতের সুভাষ ও কাবুলের জিয়াউদ্দিন আপাততঃ 'এলায়েস' ক্যারাটিন নাম ধারণ করিয়া ইটালীর দূতের সহিত

---

* মৎপ্রচিত "আমাদের বাঙ্গলা" গ্রন্থে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ও বঙ্গ বিভাগের পরিপূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।—লেখক।

অজানা অচেনা পথে আর একবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষায় দূরযাত্রা করিলেন।

আমাদের বাল্যকালে রুশ জাপানের যুদ্ধের সময়ে আফগানিস্থানের পথের পানে চাহিয়া ভারতবর্ষের কল্পনাকুশলী জনগণ ভারতমিত্রের আগমন সম্ভাবনায় কালাতিবাহিত করিতেন। রূপকথার রাজপুত্র পক্ষীরাজ পৃষ্ঠে অরোহণ করিয়া কোন্ পথে আসিয়া নির্য্যাতিতা রাজকুমারীকে উদ্ধার করিবেন অহোরাত্র 'রাজকুমারী'র সেই ধ্যান জ্ঞান হইয়া থাকিত। কাবুলের কে সে ত্রাণকর্ত্তা ভয়ত্রাতা উদ্ধারকারী আসিয়া বৃটিশকে খেদাইয়া আমাদিগকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবেন কল্পনা-বিলাসিগণও তেমনই ধ্যানস্তিমিত শিবনেত্রে তাহাই চিন্তা করিতেন। কিন্তু রূপ-কথার রাজপুত্রীর উদ্ধার সাধন হইয়া থাকিলেও আমাদের উদ্ধার সাধন করিতে কোনও পথেই কেহ আসিল না। কাবুলের কথা উত্তরকালে আলোচনার বিষয় হইয়াছিল বটে; কিন্তু পরিত্রাতার আগমন চিন্তা আদৌ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লার ইয়োরোপে ভ্রমণ, তাঁহার রাজ্যচ্যুতি, ভিস্তিপুত্র বাচ্চাই সাকোর সিংহাসনারোহণ, জনবিক্ষোভ ও যুদ্ধ এবং অবশেষে নাদির শাহের আগমন—কিছুকাল যাবৎ ভারতবর্ষের শিরোবেদনার যথেষ্ট উপকরণ সরবরাহ করিয়াছিল। তারপর কাবুল বিস্মৃতির অতল তলে সমাধিস্থ হইয়াছিল। কাবুলের সহিত আমাদের আর এক রকমের সম্পর্ক ছিল। "লুপিয়া লেওয়াও।" সেই হিং জাফরাণ সুরভিত আজন্মের ধূলি ধূসরিত ঢল ঢলে পায় জামা কাল কুরতা ও দীর্ঘ পাগড়ি পরিহিত 'দুর্গন্ধে প্রাণ-যায়' কাবুলীওয়ালাকে মিলের ফটকে, অফিসের দরজায়, গৃহস্থের অঙ্গনে যখন দেখিতাম, পাড়ার কুকুর যাহার পিছু লাগিত, রাজ্যের ছেলে সম্মানজনক ব্যবধান হইতে ছিন্ন পাদুকার উপঢৌকন লইয়া সাধ্য সাধনা করিত, যে কাবুলিওলা "লুপিয়া" পা'ক না পা'ক, সুদ পাইলেই সন্তুষ্ট হইঁত, নতুবা লাঠির আঘাতে মেদিনী বিকম্পিত করিত, সৌভাগ্যক্রমে অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে মনোমদ=নয়নলোভা সেই মূর্ত্তি লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গলাদেশ হইতে রক্তবীজের বংশ বিলোপ হওয়ায়, ১৯৩৭ সালের বঙ্গদেশীয় গভর্ণমেন্ট—যাহা ফজলল হক্ মন্ত্রীসভা বলিয়া পরিচিত ছিল,—বাঙ্গালীর ধন্যবাদ দাবী করিতে পারেন। সে কথা থাক্। সুভাষ-চন্দ্র এই কাবুলের পথ ধরিয়া বার্লিনে গিয়াছেন যে দিন হইতে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেইদিন হইতে আবার কাবুলের পানে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সংবাদটি, কাবুলে সুভাষচন্দ্র বসু ওরফে জিয়াউদ্দীনের আশ্রয়দাতা

সাধু উত্তমচাঁদই প্রকাশ করেন। সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দেওয়ায় উত্তমচাঁদকে অশেষরূপে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাঁহার ব্যবসায় জাহান্নামে গিয়াছে; ধন-সম্পত্তি ধ্বংস কবলিত। আজ তাঁহাকে উদরান্নের জন্য ফকিরের বেশে প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে।

কিন্তু তাহাতে দুঃখ কি! ভারতমাতার বরেণ্য সন্তান সকলেই নিঃস্ব, সকলেই ফকির। ফকিরের রাজা ফকির, গান্ধীজী! চিত্তরঞ্জন দাশ ফকির! রাজচক্রবর্ত্তী মতিলাল নেহেরু ফকির। রাজাধিরাজ জওহরলাল ফকির। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, মহত্ত্বে, প্রতিভায় সাহানশাহ বাদসাহতুল্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদও ফকির। সর্দ্দার প্যাটেল ফকির। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ফকির। সুভাষচন্দ্রও ফকির। তাঁহার আশ্রয়দাতা ফকির হইবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য কি থাকিতে পারে?

গান্ধীজী ভারতবর্ষের জন্য নূতন সঙ্গীত রচনা করিলেন; নূতন গানে নূতন সুর সংযোজিত হইল; নূতন সুরে যন্ত্রের নূতন তার বাঁধা হইল। নূতন গান নূতন যন্ত্রে নূতন সুরে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নূতন ভাবের বন্যা বহাইল। তাহাতে—

"রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্যধন
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন!"

বার্লিন হইতে সুভাষচন্দ্র একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—উত্তম চাঁদ, নমস্তে! আজ সারা ভারতবর্ষ সুভাষের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতেছে, 'উত্তমচাঁদ, নমস্তে'। সুভাষচন্দ্র আরও বলিয়াছিলেন, আপনি আমার জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। ভারতবর্ষও তাহাই বলিতেছে, ভারতও চিরকৃতজ্ঞ। সুভাষ বলিয়াছিলেন, এ জীবনে আপনার কথা ভুলিবার নহে। আমরাও বলি "নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি।"

রাশিয়ার রহস্য মেঘলোকের মত আমাদের নিকট দুর্জ্ঞেয়, অবোধ্য। আমার কমিউনিস্ট বন্ধুবর্গ মল্লিনাথের ভূমিকা অভিনয় করিলে ভাল করিতেন; কিন্তু বোধ করি তাঁহাদের নিকটও রহস্য রহস্যাচ্ছন্নই থাকিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় কমিউনিস্টগণের নিকট রাশিয়াই ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন ধারণা; তাঁহারা বলুন আর নাই বলুন, ভাব দেখিয়া বুঝি, 'রাশিয়া করেছি সার'। কিন্তু ভারত-দরদী রাশিয়া যে ভারতের সহিত সখ্যতা সূত্রে বদ্ধ হইবার এত বড় সুযোগ হেলায় উপেক্ষা করিল কেন, তাহা বুঝিবার মত রাজনীতিজ্ঞান আমার ভাণ্ডারে নাই, তাহা

আমি মুক্তকণ্ঠে অকপটে স্বীকার করি। তবে একটা কথা বুঝি। বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া আদৌ অংশ গ্রহণ করিবে কি-না; করিলেও কতটুকু অংশ লইবে তখন পর্য্যন্ত তাহা অস্থির অবস্থাতেই ছিল। "যস্মিন্ পক্ষে জনার্দ্দন" সেই পক্ষের জয় হইবে রাশিয়া তাহা জানিয়াও তখন পর্য্যন্ত কোনও পক্ষাবলম্বন করে নাই। বৃটিশের সহিতও তাহার সন্ধি; জার্ম্মেণীর সহিতও সন্ধি। বৃটিশ বুদ্ধিমান, রাশিয়ার তেলা মাথায় তেল ঢালিতে কার্পণ্য করিল না! দুর্বুদ্ধি জার্ম্মেণী, সুপ্ত সিংহকে খোঁচাইয়া তুলিল। সুপ্তোত্থিত পশুরাজ (ভল্লুক বলিব কি ?) হুঙ্কার ত্যাগ করিল। বিশ্বযুদ্ধ গুরুতর রূপ ধারণ করিল।

সুভাষচন্দ্রকে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো হইয়া যাইতে হইয়াছিল। রাশিয়া ইচ্ছা করিলে তখনও ভারতের বিপ্লবী প্রতিনিধি শ্রেষ্ঠের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে পারিত; কিন্তু দেখা যায়, রাশিয়া সে চেষ্টা হইতেও বিরত ছিল। অগত্যা অত্যন্ত অনিচ্ছা সহকারেই সুভাষকে অক্ষশক্তির আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে রাশিয়া তাঁহাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিবে। রাশিয়ার দূতাবাস একরকম 'না' করিয়া দিলেও তিনি আশা ছাড়েন নাই। যখন বুঝা গেল, রাশিয়ার সহায়তা লাভের কোনও আশাই নাই, তখন বলিতেছেন—

> 'ইটালীয়গণ আমাকে সাহায্য করিতে রাজী শুনিয়া আমি আনন্দিত হইতেছি বটে; কিন্তু আমার মনে সুখ নাই। রোম অথবা বার্লিন কোনদিনই আমাকে সুখী করে না। কিন্তু উপায়ই বা কি! তাহারা যখন 'না'ই করিল, তখন মন্দের ভাল হিসাবে বার্লিনেই যাই।'
>
> যাত্রা করিবার সময়েও আশা!
>
> 'এখনও যদি রাশিয়া আমাকে গ্রহণ করে আমি ইটালীয়গণকে ধন্যবাদ দিয়া মত ও পথ বদল করি।'
>
> যখন 'কুরিয়ার' (সহযাত্রী ইতালীর দূত) আসিয়াছে, তখনও মনোভাব অপারবর্ত্তিত রহিয়াছে। বার্লিন অথবা রোমে ত যাওয়া যাক, তারপর সেখান হইতে রাশিয়ার কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার সুযোগ করিয়া লইব।'

এমন কি, কাবুলে সুভাষচন্দ্রের আশ্রয়দাতার সহিত কথোপকথনে এই ইচ্ছাও প্রকাশ পাইয়াছিল যে, অক্ষশক্তির সাহায্য না লইয়া ছদ্মবেশে গোপনে রাশিয়ায় প্রবেশ করিতেও সুভাষের দ্বিধা ছিল না। অনধিকার প্রবেশের ফলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে তাহাও জানিতেন; তবে এই ভরসা ছিল, কারাগারের

'খাতায়' সুভাষচন্দ্র বসু নাম দেখিবামাত্র রুশ-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সাগ্রহে মুক্ত করিয়া লইবেন। শেষ পর্য্যন্ত এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই; সুভাষবাবু ইটালীর কুরিয়ারের সঙ্গে কাবুল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাবুলে অন্ত-রঙ্গগণের নিকটে তাঁহার নাম ছিল জিয়াউদ্দীন। মোটরে উঠিবার সময় নাম হইল, কারাটাইন। ১৮ই মার্চ্চ ১৯৪১ বেলা ৯টার সময় আজন্মবিপ্লবী বৃটিশ-বিদ্বেষী, ভারতের জনগণ-মন-অধিনায়ক কারাটাইন (সুভাষচন্দ্র বসু) কাবুল ত্যাগ করিলেন। যদিও ইটালীয়গণ তাঁহার যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছে, পাসপোর্টও তাহাদের দ্বারা সংগৃহীত এবং কুরিয়ার তাহারাই পাঠাইয়াছে কিন্তু তাহাতেও ইটালীর অপেক্ষা জার্ম্মাণীর প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। তিনজন সহচর (কুরিয়র) মধ্যে দুইজন জার্ম্মেণ, একজন ইটালীয়ান। দুইজন জার্ম্মেণের মধ্যে একজন ডক্টর ওয়েলার। কূটনীতিতে ডক্টর ওয়েলার বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহার বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। এরূপ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সহচর হিসাবে প্রেরণের উদ্দেশ্য বুঝিতেও বিলম্ব হয় না। কারাটাইন যাহাতে ইটালীতে বাসা না বাঁধিয়া বার্লিনেই নীড় রচনা করে, জার্ম্মাণীর তাহাই ছিল গূঢ় অভিপ্রায়। তাহাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল। কারাটাইন ২৮এ মার্চ্চ নিরাপদে বার্লিনে অবতরণ করিয়াছিলেন।

পরদিন, ২৯এ মার্চ্চ বার্লিনের পররাষ্ট্র কার্য্যালয় হইতে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি সহ নিম্নবর্ণিত সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ—

> "ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান নেতা এবং ভারতীয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি কিছুদিন পূর্ব্বে অভাবিতরূপে ভারত হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। ২৮এ মার্চ্চ তিনি নিরাপদে বার্লিনে পৌছিয়াছেন।"

জার্ম্মেণীর ভাগ্যবিধাতা হের হিটলারের আত্মজীবন চরিতে ও তাঁহার পরবর্ত্তী একাধিক বক্তৃতা ও বিবৃতি পাঠে জানা যায় তিনি ইংরাজ-শাসিত ও শোষিত ভারত-বর্ষের স্বাধীনতার কামনাকে প্রীতির চক্ষুতে দেখিতেন না। ভারতবাসী বৃটিশের পদছায়ে ভালই আছে এবং বৃটিশের আশ্রয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু বৃটিশ-বিদ্বেষী ও বৃটিশের ধ্বংসকামী সুভাষচন্দ্রকে সাগ্রহে ও সানন্দে কবলিত করায় স্বতঃই মনে হয় না কি যে, তিনি মুখে যাহাই বলুন, লেখনীদ্বারা যাহাই লিখুন, ভারতবর্ষ যে বৃটিশের পদতলে সুখী নহে, ভারতবাসীরা অত্যন্ত অসুখী তাহা হিটলারের অজানা ছিল না। ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর অসন্তোষ ও বৃটিশ উচ্ছেদের বাসনার সম্পূর্ণ

সুযোগ লইবার প্রবল আগ্রহই সুভাষচন্দ্রকে স্বাধিকার মধ্যে আনয়ন করিবার প্রেরণা দিয়াছিল।

জার্ম্মেণী ও ইটালী অক্ষপক্ষের দুই সরিক হইলেও পরস্পরের মধ্যে সখ্য ছিল না ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। ইহা স্বাভাবিকও বটে! জার্ম্মেণীর তুলনায় ইতালী দুর্ব্বল, তুচ্ছ ও নগণ্য। জার্ম্মেণী ইটালীকে কার্য্যোদ্ধারের পন্থা হিসাবে দলে রাখিতে পারে কিন্তু সমানে সমানে যে হৃদ্যতা হয়, তাহার সম্মান দিতে পারে না। যুদ্ধকালের সবিশেষ সংবাদ যাহাদের মনে আছে তাঁহারা ইহাও স্মরণ করিতে পারিবেন যে, ইটালী যখন পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিয়া জার্ম্মেণীর ও হিটলারের ঘাড়ে ভারী বোঝার মত হইয়া পড়িতেছিল তখন আপদকে স্কন্ধ হইতে নামাইতে পারিলে বাঁচেন এমন কথা বলিতেও হিটলার বিরত থাকেন নাই।

রাশিয়ার যুদ্ধের প্রথমার্দ্ধে হিটলারের রক্তাক্ত বিজয় অভিযান যে ভাবে রাশিয়াকে দলিত পিষ্ট করিয়া চলিতেছিল তাহাতে মাই ক্যাম্পে লিখিত সুখ ও শান্তি পূর্ণ ভারতবর্ষকে বৃটিশের অধিকারচ্যুত করিবার অভিসন্ধি যে হিটলারের ছিল না এমন কথা আদৌ বলা যায় না। শেষার্দ্ধে ভাগ্যচক্র বিপরীত পথে বিঘূর্ণিত না হইলে, শান্তিপূর্ণ ভারতবর্ষকে অধিকতর শান্তি ও সুখী ভারতবাসীকে অধিকমাত্রায় সুখদান করিতে, যে-পথে কুরিয়র সাথে কাবাটাইনকে আনয়ন করা হইয়াছিল সেই পথে ভারতবর্ষে প্রবেশে হিটলার যে কালবিলম্ব করিতেন না তাহা অনুমান করিতেও কষ্ট হয় না।

বৃটিশের সুশাসনে যেসকল ভারতবাসী সন্তুষ্ট নহে এবং বৃটিশ উচ্ছেদ জন্য হল্লা করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে 'গরমাগরম' দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাপত্র প্রদানে বিশ্বব্যাধিবিশেষজ্ঞ হিটলার যে তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার মত মূর্খ ও দানব প্রকৃতি-বিশিষ্ট রাজনীতিকের দ্বারাই সম্ভব। নিতান্ত মূঢ়, বাস্তব বিরোধী ও স্বপ্নবিলাসী বাতুলই বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববিজয় ও রাজ চক্রবর্ত্তিত্ব কামনা করিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে! অত্যন্ত রূঢ় আঘাতেই হিটলারের স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়াছে। যে কারণেই হৌক বৃটিশের বিরুদ্ধতা করিবার বাসনা হিটলারের ছিল না, মাই ক্যাম্পে তাহা প্রাঞ্জল ভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল কিন্তু ঘটনাচক্রে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যখন বাধিলই তখন বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মরকতমণি ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি প্রধাবিত হইবে না, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বৃটিশ মহাসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষ মাইনাস্ করিলে যে জল ও স্থল বাকী থাকে তাহার প্রতি সুনজর আর যে দিক না কেন, বিশ্বজয়াভিলাষী হের হিটলার যে

ক্ষীর ত্যজি নীরের জন্য লালায়িত হইবে না তাহা বাল-পাঠ্য শিশুবোধের পাঠকও বুঝিতে পারে।

লোকে বলে, ডান্‌কার্কের পতন ও মূর্চ্ছার পরে, হিটলার বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ না করিয়া ভুল করিয়াছিল এবং এই মারাত্মক ভুলের উপর আর একটা সাংঘাতিক ভুল করিল, রাশিয়া আক্রমণ করিয়া।

আমরা যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞ নই। মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে কি হয় বলা যায় না, তবে অন্যবিধ যুদ্ধ যে আমাদের ধাতসহ নহে তাহা অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। হিটলার ভুল করিয়াছিল ইহা আমরাও স্বীকার করি। তবে ইহাও মনে হয় সে বৃটিশকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিল। রাশিয়াকে পরাভূত করিয়া আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ অভিযান সুপরিচালিত করিতে পারিলে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ তাহার অধিকার না করিলেই চলিত। ময়ূর সিংহাসন হইতে কোহিনূর হীরকখণ্ডটি অপসৃত হইলে ময়ূর সিংহাসনে অধিবেশন করিয়া সাজাহাঁ বাদসাহ তাজমহল সৃষ্টির কল্পনা করিতেন না বলিয়াই আমাদের অনুমান হয়। ভারতবর্জ্জিত বৃটিশ সাম্রাজ্য আর বারিবিহীন তালপুকুর একই 'পদার্থ'!

বার্লিনে অবস্থান কালে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন ইহা জানিতে পারা গিয়াছে। ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, বার্লিন হইতে রাশিয়ার সহিত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু চেষ্টা বর্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। রাশিয়ার সহিত সদ্ভাব বন্ধনের চুক্তি থাকা সত্ত্বেও হিটলার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মস্কো, তথা সোভিয়েট-রাশিয়ার সহিত সুভাষচন্দ্রের সৌহার্দ্দ্যের আশা অতলে ডুবিল।

সে আশা অতলে তলাইয়া গেলেও সুভাষ হাল ছাড়িলেন না। বার্লিনে থাকিয়াই তিনি শক্তি ও সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন এবং রুশ-জার্ম্মেণ যুদ্ধে রাশিয়াকে যখন পরাজয়ের পর পরাজয় বহন করিতে হইতেছে তখন সুভাষ বার্লিনে থাকিয়া দিন গুণিতেছেন। রাশিয়ার পতন হইলে রাশিয়ার মধ্য দিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত পথে ভারত প্রবেশের আশাও যে না ছিল, এমনও নহে! সেই আশাতে ভর করিয়া, জার্ম্মেণী বা ইটালীর প্রত্যক্ষ সাহায্যে বঞ্চিত হইলেও নিরুৎসাহ না হইয়া পূর্ণোদ্যমেই ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সংগঠন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সিঙ্গাপুর হইতে ভারতীয়গণের নিকট হইতে আহ্বান আসিল। সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মদেশ হইতে বৃটিশ বিতাড়িত হইয়া, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। বেত্রাহত কুক্কুর যেমন লাঙ্গুল সংগোপন করিয়া পলায়ন করে, বৃটিশের সেই অবস্থা। জাপানীদের বর্ব্বর আচরণে ভারতীয়গণ জর্জ্জরিত। স্বদেশীয়গণ নির্য্যাতিত হইয়াছে সুভাষের পক্ষে সেই সংবাদই যথেষ্ট। কিন্তু আরও চিত্তাকর্ষক সংবাদ আসিয়াছিল।

সিঙ্গাপুর, মালয় ও সন্নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহের অধিবাসী—স্থানীয় ও ভারতীয়গণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করিয়াছে। জাপান-প্রবাসী রাসবিহারী বসু লীগের নেতৃত্ব করিতেছেন বটে; কিন্তু ভারতীয়গণ একাত্মমনে সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি কামনা করে।

সুভাষ এই সুবর্ণ সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুভাষচন্দ্র সাব-মেরিণযোগে বার্লিন হইতে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে পাইবার জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উভয় পক্ষেরই সমান যত্ন ও সমান আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পাণ্ডবপক্ষ প্রীতির বশে অনায়াসেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কৌরব পক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহাকে স্বপক্ষে না পাইলেও কৌরবগণ তাঁহার সহায়তায় বঞ্চিত হয় নাই। রণপণ্ডিত ও সমরকুশলী মহামানব শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু কুরুক্ষেত্র মহাসমরে জয়লাভ করিবার পক্ষে যে পাণ্ডবদিগের সহিত তিনি সশরীরে সংযুক্ত হইয়াছিলেন সেই পাণ্ডবগণের জয় সম্পর্কে যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই লোক নিশ্চিন্ত ও নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণঃ যস্মিনপক্ষে জনার্দ্দনঃ

সুভাষচন্দ্রকে পাইয়া হিটলারেরও আশা ও উল্লাসের অবধি নাই। পাণ্ডব পক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে পাইয়া যে কারণে উল্লসিত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তখনকার রীতি অনুসারে, তখনকার মানুষের মনের গঠনানুসারে ধর্ম্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল বটে তবে তাঁহার বুদ্ধি ও পরামর্শের প্রয়োজনও যে বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল, মহাভারতে তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। হিটলার সুভাষচন্দ্রের বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিলেও সুভাষের বৃটিশ-বিদ্বেষকেই পুরামাত্রায় কাজে লাগাইয়া বৃটিশকে পরাস্ত ও পর্য্যুদস্ত করিতে পারিবে ভাবিয়াই উল্লসিত ও উৎসাহিত হইয়াছিল। কিন্তু সুভাষকে কাজে লাগান যে নিতান্ত সহজ নহে, তাহা হিটলারেরও অজানা ছিল না। ন্যূনাধিক দুই শতাব্দীপূর্ব্বে বৃটিশ যেদিন

বাঙ্গলা দেশে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়াছিল সেদিন মীর্জ্জাফরাদি দেশাঙ্গরকে যত সহজে কাজে লাগাইতে বৃটিশ সমর্থ হইয়াছিল, হিটলার দুঃস্বপ্নেও ভাবে নাই যে সুভাষকে সেই ভাবে আপনার স্বার্থ সাধনের কাজে লাগাইতে পারিবে। হিটলারের সে বুদ্ধিটুকু ছিল। বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজ তখন বাঙ্গলার সিংহাসনে; মীর্জ্জাফর সিরাজের পরিষদ মাত্র। সে চাহিয়াছিল, বৃটিশ যুদ্ধ করিয়াই হৌক, অথবা কৌশল প্রয়োগ করিয়াই হৌক সিরাজকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া তাহাকে সিংহাসন দান করিবে। বৃটিশ তাহাকে 'আশা' দিয়াছিল; সে'ও গোপনে সিরাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতক সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মীর্জ্জাফরও তাহাই লাভ করিয়াছিল। হিটলার জানিত সেই একই বাঙ্গলার মাটীতে সৃষ্টি হইলেও, ধাতু ভিন্ন। মীরজাফর ভারতের ইতিহাস মসীমণ্ডিত করিয়া মরিয়াছে, ভারতকেও হত্যা করিয়াছে। সুভাষ ভারত ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করিতে আসিয়াছে, ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রই তাঁহার কামনা। সুভাষ মরিবে; কিন্তু ভারতকে মারিবে না।

সুভাষচন্দ্র বোস সশরীরে বার্লিনে উপস্থিত জানিয়াও বহুদিন হিটলার তাঁহাকে আহ্বান করিলেন না। যে সমস্ত ভারতীয় উচ্চস্তরে সংবাদ বিনিময়াদির কার্য্যে রত ছিলেন তাঁহাদের পক্ষে হিটলারের এই অবহেলা ও ঔদাসীন্য অল্প বিস্ময় উদ্রেক করে নাই। সুভাষ বোসের ব্যক্তিত্ব, রোমাঞ্চকর অভিযান, ও সর্ব্বোপরি সুভাষের দুরন্ত বৃটিশ বিদ্বেষ কি হিটলার জ্ঞাত ছিলেন না? ভারতবর্ষই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি, মরকতমণি এবং ভারতে বৃটিশ বিদ্বেষ যে দাবানলসম প্রজ্জ্বলিত তাহাও কি হিটলার অবগত ছিলেন না? ভারতবর্ষ চ্যুত করিতে পারিলে বৃটিশের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহাও কি এই দুর্দ্ধর্ষ সমর-নায়ক হিটলার বুঝিতেন না? সেই হৃদপিণ্ড উৎসাদন কার্য্যে সুভাষচন্দ্র বোসের সহায়তা যে অতীব মূল্যবান তখনকার দিনে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা হিটলার কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেন না?

ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গিয়াছে, হিটলারের জার্ম্মেণী আজ অতল তলে শায়িত হইয়াছে, গো-ভাগাড় শকুনী গৃধিণী যে-ভাবে গবাদি পশুর শব লইয়া ফাঁড়া ছেঁড়া করে আজ পৃথিবীর শক্তিশালী বিজয়ী পক্ষগণ জার্ম্মেনীকে সেই ভাবেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ করিতেছেন এবং জার্ম্মেণী যাহাতে কোনও দিন শক্তি অর্জ্জন করিয়া স্বাবলম্বী না হইতে পারে তজ্জন্য প্রাণপণ যত্নে বিধি বিধান আরোপিত করিতেছেন সত্য কিন্তু একদিন যে হিটলার জগতের ত্রাস হইয়া বিশ্বের বিস্ময়, ভয় ও পূজা

আহরণ করিয়াছিলেন তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীর ইতিহাস-বেত্তারা আজ যত কালীই তাহার নামের উপর নিক্ষেপ করিতে থাকুন, হত-রঙ্গ-ব্যঙ্গ সহযোগে তাহাকে নস্যাৎ করিতে চেষ্টা করুন, ইতিহাস এই সত্যও গোপন করিতে পারিবে না যে, প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময়ে যে হিটলার জার্ম্মেণীর সৈন্যদলে ছিল একটা নগণ্য পদাতিক মাত্র, উত্তর কালে সেই ব্যক্তিই জার্ম্মেণীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব অর্জ্জন করিল (১৯৩৩) ও তারপরে সমগ্র ইয়োরোপ—অর্দ্ধ পৃথিবীর উপরে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হইল এবং পৃথিবী বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার বুদ্ধি, তাহার কৌশল, তাহার কূটনীতির নিকট নতি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই অসাধারণ বুদ্ধিমান, কূটনীতিবিশারদ রাজনীতজ্ঞ হিটলারেরও নাৎসী-অভিযানের সহিত ভারতীয় নেতা সুভাষ বোসের সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিতে অনেক চিন্তান্বিত দিবস ও বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বার্লিনে বাস করিলেও হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইতে প্রধাবিত হন নাই।

সুভাষচন্দ্রের উদগ্রীব-অধীরতার সহিত আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। একবার কোনও কারণে (এরূপ কারণ অহরহ ঘটিত) সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের কাউন্সিলারীতে এবং কংগ্রেস দলের দলপতিত্বে ইস্তফা দিয়া বাড়ীতে বসিয়া আছেন—সহকর্ম্মিগণ প্রথম চোটে খুব ধরাধরি করিয়া 'মান ভঞ্জন' করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে বিদায় লইয়াছেন। কয়দিন তাঁহারা কেহ আসেন নাই, একটা ফোন করেন নাই, একখানা পত্রও লিখেন নাই। সুভাষচন্দ্রের সে কি অস্থিরতা! সিঁড়িতে কাহারও পদশব্দ হইবামাত্র তিনি উৎকর্ণ হইয়া উঠিতেন; নীচে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিলে উদ্বিগ্ন হইতেন। কাহারও অসুখ হইল না-কি হইল, ইন্দু বিদ কি রাঁচি চলিয়া গেল, মৃগেন মজুমদার মরশুমে মাতিল না-কি, দুশ্চিন্তার ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে না দেখিয়াছে কে? হাতের পাশে টেলিফোন থাকিত, ফোন করিয়া খবর লইতে বাধাই বা কি ছিল? সকলেই বিশ্বস্ত, অনুগত, পরম ভক্ত, ফোন করিলে তাহারাই ধন্য মানিত; কিন্তু না, সংযম রক্ষা করিতেই হইবে। এক দিনের কথা আমার মনে আছে, করপোরেশনের 'গল্প' করিতে করিতে, যাহাদের সম্বন্ধে সংযম অভ্যাস করিতেছেন তাহাদেরই এক জনের নম্বর চাহিয়া ফেলিয়াই অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে, ক্ষিপ্রহস্তে ফোন নামাইয়া দিলেন। সংযম রক্ষিত হইল। সেই ঘটনা মনে ছিল বলিয়াই এখন মনে হইতেছে, হিটলার সম্পর্কে সংযম রক্ষা হয়ত এই ভাবেই সুভাষচন্দ্রকে

করিতে হইয়াছিল। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র গঠনে দিনেকের বিলম্বও যে দিনান্তে তাঁহাকে পীড়িত করিয়া যাইত, তাহাতে কি কোন সন্দেহ কাহারও থাকিতে পারে? গান্ধী-ভারতে গান্ধীজীর সহিত বিচ্ছেদ কি ঐ অধীরতাবশঃতই হয় নাই? সুভাষ বার্লিনে আসিয়াছেন, বার্লিনে অবস্থিতি করিতেছেন, রাশিয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বার্লিনকেই আশ্রয় করিয়াছেন, বার্লিনই ভরসা; অথচ বার্লিনে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাইতে হইলে হিটলারের অনুকম্পা ব্যতিরেকে তাহা অসম্ভব। সেই হিটলারের সান্নিধ্য যে কতদূর কাম্য তাহাও কি আবার বলিয়া বুঝাইতে হইবে? কিন্তু কামনা যত উগ্র ও ব্যগ্রই হৌক, গায়ে-পড়া হইবার ইচ্ছা সুভাষের হইতে পারে না। সংযম পালন অবশ্যকর্ত্তব্য।

কিন্তু 'কাল বহে যায়', সুভাষচন্দ্রও দীর্ঘকাল অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া কাল হরণ করিতে পারেন না।* তিনি এই সময়ে একটি প্রেস্ কনফারেন্সে তাঁহার অভিলাষ ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। জার্ম্মান রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় প্রেস কনফারেন্সের দিন ধার্য্য হইল। জার্ম্মান দূতাবাসের একটি অংশ ইহাই চাহিতেছিলেন। ভনট্রট এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন; সুভাষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে তাঁহারা হিটলারের গোচর করিতে পারেন এবং উদ্দেশ্যের সাম্য ঘটিলে পরস্পরকে সাহায্য করিতেও বাধা থাকিতে পারে না। এই সময়ে যে সকল ভারতীয় জার্ম্মানীতে ছিলেন, তাঁহারা বলেন, জার্ম্মানীর পদস্থ কর্ম্মচারী ও নাগরিক মাত্রেই সুভাষ বোসের সহিত সমন্বয় সাধনের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেন তেন প্রকারেণ সুভাষ বোসকে জার্ম্মানীর সহিত সহযোগিতা সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলে জার্ম্মানীর উপকার সাধিত হইবে ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল। নাৎসী জার্ম্মেনীতে হিটলার ব্যতিরেকে অপর কাহারও প্রতিমূর্ত্তি অথবা বক্তৃতা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান লাভের সম্মান আশা করিতে পারিত না; কিন্তু সরকারী নির্দ্দেশ ব্যতীতই সুভাষচন্দ্র বোসের ফটো, তাঁহার জীবন-কাহিনী ও ভারত হইতে পলায়নের কল্পিত সরস বৃত্তান্ত বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় মর্য্যাদাসূচক স্থান পাইতে লাগিল। নাৎসী জার্ম্মেনীর অলিখিত কঠোর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও, কোন সংবাদপত্রই তিরস্কৃত অথবা শাস্তি প্রাপ্ত হন্ নাই। ইহাতে কি ইহাই অনুমান হয় না যে, কঠোর ও দুর্দ্দান্ত নাৎসী সরকার জার্ম্মেনীর জনমতের বিরুদ্ধতা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন

* আবার বাধা দিবার লোকেরও অভাব ছিল না। বার্লিনের এরিষ্টোক্রেসী বৃটিশ বিদ্বেষী বোসকে প্রীতির চক্ষুতে দেখিতেন না। এই সম্ভ্রান্ত সমাজের মন বরাবর বৃটিশের অনুরাগী ছিল।

নাই, নিজেদের মনের গোপন ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য ছিল বলিয়াই। যেদিন প্রথম সুভাষচন্দ্রের আগমন বৃত্তান্ত সম্বলিত সচিত্র সংবাদ বার্লিনে বাহির হইয়াছিল, সেদিনের কাগজ নাকি গরম কেকের মত খোলা হইতে নামিতে তর সহে নাই। ডানকার্কের খবরও ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিক ছাড়াও জার্ম্মেনীর রাষ্ট্রদূত, সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষ ও একজন শস্ত্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বোস কি বলেন তাহা জানিবার আগ্রহ তাঁহাদের এমনই প্রবল হইয়া ছিল যে, সাংবাদিক সম্মেলনের বৃত্তান্ত সংবাদপত্রে পাঠ করিতে যেটুকু সময় অপেক্ষা করিতে হয় ততটুকু ধৈর্য্য ধারণ করাও যেন কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। এ কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া রাখিতে হইতেছে যে, ঐ কয়জন নাৎসী নায়কের নিকট সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠান প্রভৃত সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজাদী সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিবার ভার সুভাষচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বিদেশে জার্ম্মেনী, জাপান ও মধ্যএসিয়ার যতগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন বার্লিনে অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতাটি প্রথম বক্তৃতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

যেদিন হইতে রাষ্ট্রীয় চেতনা হইয়াছে সেইদিন হইতেই যে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্য-কলাপে লিপ্ত হইয়াছেন এবং তাহারই ফলে বৃটিশের কারাগারে জীবনের অধিকাংশ কাল সমস্ত যৌবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন ভূমিকায় এই কথা কয়টি বলিয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা প্রচেষ্টার একটা মোটামুটি আভাষ দান করিয়া বলিলেন,

"কিন্তু আমি নিশ্চিত মনে করি যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলন করিলেই যথেষ্ট হইবে না; এখন বৃটিশকে ভিতরে ও বাহিরে একসঙ্গে আঘাত হানিতে হইবে। বৃটিশ ভারতের অভ্যন্তরে অত্যন্ত শক্তিমান, তাহাকে ভিতরে বাহিরে আঘাত না করিলে আমাদের কামনা সিদ্ধ হইবে না। মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের ভিতরে যে আন্দোলন করিতেছেন করুন—যদিও বেশীদিন তাঁহারা আন্দোলন চালাইতে পারিবেন না তাহা আমি জানি; বৃটিশ তাঁহাদিগকে শীঘ্রই কারারুদ্ধ করিবে তাহাও আমি জানি: আমি চাই ভারতবর্ষের বাহির হইতে প্রচণ্ড আঘাত হানিতে। আমার বিশ্বাস,

কি ভিতরে কি বাহিরে এমন একজন ভারতবাসীও আজ নাই যে না ভারতের স্বাধীনতা কামনা করে। আমি তাঁহাদের সহায়তা পাইয়াছি, আরও পাইব, যতই দিন যাইবে ততই তাঁহারা অগ্রসর হইয়া আসিবেন, আমরা সকলে মিলিয়া এই চরম মুহূর্ত্তে চরম আঘাত হানিব।

"এই আশা বক্ষে লইয়াই আমি দেশত্যাগ করিয়াছি। পদে পদে ধরা পড়িবার আশঙ্কা, প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনের আশঙ্কা, সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছি—আমার স্বপ্ন, আমার স্বাধীনতার স্বপ্ন সফলতা লাভ করিবে নিশ্চিত বুঝিয়া এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

"কিন্তু একটা কথা আমি এইখানে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া রাখিতে চাই—আমরা গুপ্ত ঘাতক নহি; আমরা আততায়ীর মত আক্রমণ করিবার ইচ্ছাও রাখি না। আমরা, যাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সীমা-রেখার বাহিরে বাস করিতেছি তাহারা বৃটিশের অধীন নহে। বাস্তবপক্ষে তাহারা কোনও রাষ্ট্রেরই অধীন নহে। আমরা স্বাধীন—ভ্রাম্যমান স্বাধীন মানুষ। আমরা আমাদের জন্মভূমি, মাতৃভূমি, ভারতবর্ষকে বৃটিশের শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চাহিতেছি।

"আমরা বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিব; আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিব। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি যদি, তাহা হইলে জননী জন্মভূমির শৃঙ্খল মোচন করিব; আর যদি বিধাতার সেই ইচ্ছাই হয়, আমরা পরাস্ত হই, তাহাতেই বা কি আসে যায়? পৃথিবীর পবিত্রতম ব্রত উদযাপন করিতে গিয়া মৃত্যু বরণ করার চেয়ে শ্লাঘ্য মরণ, গৌরবের মরণ আর কি হইতে পারে?

"তাই আমরা ভারতীয় বন্ধুগণকে আমি যোদ্ধৃবেশ পরিধান করিতে বলি, অস্ত্র গ্রহণ করিতে বলি, শস্ত্রবিদ্যা অর্জ্জন করিতে বলি এবং জার্ম্মেনী, জাপান, ইতালী যেমন আমরাও তেমনই বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করি। এই কার্য্যে যদি জার্ম্মেনী, ইতালী ও জাপান প্রভৃতি শক্তিধর রাষ্ট্রের সহায়তা আমরা লাভ করিতে পারি, আমাদের ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিব। বৃটিশ আমেরিকার সাহায্য লইতেছে, আমেরিকা কানাডার সাহায্য লইতেছে, বৃটিশ অষ্ট্রেলিয়ার সাহায্য পাইতেছে; এমন কি অনিচ্ছুক ভারতবর্ষকে অর্ডিনান্স বলে বাধ্য করিয়া ভারতেরও ধনজন-সম্পদ নিজের কাজে লাগাইতেছে। অক্ষপক্ষকেও দেখা যায়, এক রাষ্ট্র অপর এক মিত্র রাষ্ট্রের সহায়তা লইতেছে। ইহা রণশাস্ত্রসঙ্গত।

"আমাদের উদ্দেশ্য যে মহত্তর, পৃথিবীর ইতিহাস সে কথা লিপিবদ্ধ করিতে

বাধ্য হইবে; আমাদের কার্য্যও যে মহত্তর, পৃথিবীর লোক সে কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। আমরা কোন দেশের স্বাধীনতা হরণ করিতে যাইতেছি না, আমরা কোন স্বাধীন রাষ্ট্রকে পরাধীন করিবার বাসনাও রাখি না। আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে যাইতেছি। বৃটিশের নাগপাশ হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে চলিয়াছি। স্বাধীনতা মানুষের অধিকার। বৃটিশ ছলে, বলে, কৌশলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করিয়া ভারতবর্ষের উপর বৃটিশের স্বেচ্ছাচার পরিচালিত করিতেছে; আমরা স্বাধীনতাকামী ভারতীয়গণ বৃটিশের স্বেচ্ছাচারের অবসান ঘটাইতে চাহিতেছি। আমাদের আশা আছে পৃথিবীর যে সমস্ত স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র স্ব স্ব রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই মহা আহবে লিপ্ত হইয়াছেন আমরা তাঁহাদের সাহায্য পাইব। আমরা গুপ্তচর বা গুপ্তঘাতক নহি, আমরা যোদ্ধা, যুদ্ধ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিব। জননী জন্মভূমি আমাদের সহায়! ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আমাদের পাথেয়।"

সভান্তে সেই গৃহমধ্যেই আজাদহিন্দ ফৌজ দলের কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। স্বদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীমাত্রেরই হৃদয়ে সজীব ও সক্রিয় ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু আজ যেন সেই আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শস্ত্রধর মূর্ত্তিতে রণাঙ্গনের উদ্দেশে ধাবিত হইল।

সেই দিনেরই সান্ধ্য-সংস্করণের সংবাদপত্রগুলি সুভাষ বোসের সুদীর্ঘ বক্তৃতা বক্ষে ধারণ করিয়া জার্ম্মেনীকে সচকিত করিয় তুলিল। সুভাষ বোসকে সহজেই কাজে লাগাইয়া ভারত হইতে বৃটিশের উৎসাদন সম্ভব ভাবিয়া যাহারা আশ্বান্বিত ছিল তাহাদের যেমন মনোভঙ্গ হইবার কারণ ঘটিল আবার যাহারা কিরূপে সুভাষ বোসকে কাজে লাগাইতে পারা যায় তাহারই গবেষণা করিতেছিল তাহাদের পক্ষে পথ সুগম হইয়া পড়িল।

ইহার কয়েকদিন পরে হিটলারের সহিত সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। স্বাধীন রাষ্ট্রের নায়ককে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয় হিটলার সেই ভাবেই সুভাষচন্দ্রকে গ্রহণ করিলেন এবং কয়েকদিন পরেই সুভাষচন্দ্রকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে সম্বর্দ্ধিত করা হইল। নাম হইল হিজ এক্সেলেন্সি মাঝোটা।

এইখানে একটু কূটনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। একটি স্বাধীন দেশ অথবা স্বাধীন রাষ্ট্র অপর একটি স্বাধীন দেশে অথবা স্বাধীন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত করিতে পারে। যে দেশ অথবা যে রাষ্ট্র স্বাধীন নহে,

সে দেশ অথবা সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের অধিকার থাকে না। হিটলার সুভাষচন্দ্রকে হিজ এক্সসেলেন্সি সুভাষ বোস, এ্যামব্যাসেডার অফ ইণ্ডিয়া বলিয়া সম্বর্দ্ধিত করিবামাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। স্বাধীনতা যদি স্বীকৃত হইল, তাহা হইলে জার্ম্মেনীর সহিত ভারতের রাষ্ট্রগত বিভেদও আর রহিল না। জার্ম্মেনীর নিকট জাপান, আমেরিকার নিকট বৃটিশ অর্থ, অস্ত্র, অন্যবিধ সাহায্য বিনা দ্বিধায় লইতে পারে, ভারতবর্ষেরও (আজাদহিন্দ ফৌজের) সেই অধিকার জন্মিল। তাঁবেদার রাষ্ট্র অথবা আজ্ঞাবহ তল্পীদার দল বলিয়া বিবেচিত হইবার যে অপমান, তাহাও ঘুচিল। সুভাষচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য (বা টেক্‌নিক্ এইখানেই)।

জার্ম্মানী অথবা জাপান ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশকে বিতাড়িত করিয়া দিক্, এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হৌক, সুভাষ পরিকল্পনায় এই প্রস্তাবের যে গৌরব সে গৌরবও ভারতবর্ষের ; গ্লানিও ভারতবর্ষের। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারিলে ভারতবাসী ধন্য হইবে ; মরিতে হয় ভারতবাসীই মরিয়া অমর হইবে। সুভাষ টেক্‌নিকের মাপ কাঠি দিয়া বিচার করিলে বৃটিশের ভারত প্রবেশ চিরদিন নিন্দিত হইবার যোগ্য। ভারতে গৃহশত্রু প্রস্তুত করিয়া তাহাদেরই সাহায্যে ছলে ও কৌশলে (বলে নহে !) ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল ; আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট স্বীয় পরাক্রমবলেই ইম্ফলে তাহার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল।

আজ মনে পড়ে বৃটিশের প্রচার-পত্র কমিউনিষ্টদের মুখ দিয়া সুভাষচন্দ্রকে বিভীষণের কালী, মির্জ্জাফরের আলকাৎরায় কলঙ্কিত করিতে কি দুরন্ত প্রচেষ্টাই না করিয়াছিল ? বৃটিশের সাধা বুলি কমিউনিষ্টরা কত সহজেই না কপচাইয়া বেড়াইয়াছিল ? কিন্তু হায়, প্রভু ভৃত্যের সকল যত্নই বিফল। উষা প্রকাশে ধরণীর অন্ধকার যেমন নিঃশেষে অপসৃত হইয়া বিশ্ব আলোকিত করে সুভাষচন্দ্রের কীর্ত্তির কিরণজালে ভারতও প্রভাসিত হইয়াছে।

সম্প্রতিকার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের তাৎপর্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমাদের ভারতবর্ষে বিদেশী কোন রাষ্ট্রেরই দূতাবাস ছিল না ; ভারতবর্ষও কোন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করিতে পারিত না। ভারতবর্ষ বৃটিশ ষ্টীমার-অঙ্গে লগ্ন গাধাবোট বলিয়াই বিবেচিত হইত ; ভারতের নিজস্ব স্বত্তা ছিল না। কিন্তু ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীনে ইন্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবার পরে, পণ্ডিতজী একদিন বেতার বক্তৃতায় পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। ভারতবর্ষ বৃটিশের পাশমুক্ত তখনও হয় নাই সত্য কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার

ভিত্তিতেই ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ায় ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রের অনুরূপ আচরণ করিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে। দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পাইয়া কয়েদী যেমন ক্ষিপ্রহস্তে জেলের পোষাক আষাক বর্জ্জন করিয়া ক্ষৌর-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সহজ মানুষ হইতে চাহে, ভারতবর্ষও ক্ষিপ্রগতিতে তাহার দাসত্বের চিহ্ন সমূহের অবসান ঘাটাইতে চাহিতেছে। মিস্টার আসফ আলি আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন; এখন তিনি আমেরিকার ওয়াশিংটনে। চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ফরাসী দেশের জন্য রাষ্ট্রদূত নিয়োগ হইয়াছে। রাসিয়ায় শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাষ্ট্রদূতের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের আয়োজন পুরাদমেই চলিতেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্যতম সাধক, স্বাধীন ভারতের স্বপ্নপূজারী জওহরলালজী বিশ্বের সম্মুখে স্বাধীন ভারতের মনোরম চিত্র সংস্থাপনে আত্মসমাহিত চিত্তে তপস্যায় রত।

কিন্তু এখানে সুভাষচন্দ্র সর্ব্বাগ্রগণ্য। সেই রণ-তাণ্ডব ও বিশ্বপ্রলয়ঙ্কর অস্ত্র ঝনাৎকারের মধ্যে, জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়াও স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূতাবাস স্থাপিত হইয়াছিল; দিকে দিকে প্রেরণাপূর্ণ বাণী প্রেরিত হইয়াছিল। ভক্ত যেমন প্রতিমা-পূজায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ত্রুটীও রাখে না, সুভাষচন্দ্রও তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে ত্রুটীশূন্য, নির্দ্দোষ করিয়াছিলেন। নতুবা সে দুর্দ্দান্ত আহবের মাঝে শিক্ষাসংস্কৃতি বিভাগ স্থাপিত হইতে পারিত না।

সেই কথাই এখন বলিব।

ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, আমরা ভারতের সন্তান। ভারতের সহিত আমাদের মাতা ও পুত্রের সম্পর্ক। মা'র দুঃখ আমরা দূর করিব। এ পবিত্র দায়িত্ব আমাদের; এ ভার অন্যকে দিতে পারিব না।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী গায়ক ও শ্রোতৃসমাজে এই গানটির খুবই চলন ছিল:

"যমুনে! এই কি তুই সেই যমুনে
প্রবাহিনী?"

গ্রামোফোন রেকর্ডেও বোধ হয় একাধিক গায়ক-গায়িকার কণ্ঠেও ঐ গানটি গ্রথিত হইয়াছিল। নিতান্ত বালক বয়সেও এবং 'স ঋ গ ম প ধ নি' র একটি অক্ষরও না জানা থাকিলেও যেদিন আগ্রার তাজমহলের পশ্চাদ্দিকের

চত্বর হইতে সর্ব্বপ্রথম, মুমূর্ষু যমুনা নদীটি দেখিলাম, ঐ গানটিই অন্তরে গুঞ্জরণ করিয়া উঠিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, এই সেই যমুনা? এই যমুনাকে কেন্দ্র করিয়া এত কাব্য উৎসাহিত হইয়াছিল কাব্যরসরসিকগণ এই কালিন্দী যমুনাকে শ্রীকৃষ্ণের মহিষী আখ্যায় আখ্যাত করিয়া মহৎ সম্মানে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সাজাহান বাদশাহ তাঁহার স্বপ্নের সুররাজ্য এই যমুনাতটেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন! সেই যমুনার এই দশা!

আজ কলিকাতা করপোরেশনের কথাতেও ঐ ভাবের একটা সন্দেহ জাগে: এই কি সেই করপোরেশন? "সাবাস্ আটাশের" করপোরেশন আমরা দেখি নাই। ম্যাকেঞ্জি আইনের প্রতিবাদে একদিন এক সঙ্গে আটাশ জন কমিশনার পদত্যাগ করিতে পারেন আজিকার করপোরেশন দেখিয়া তাহা কল্পনা করাও কঠিন; কিন্তু ঘটনা এমনই প্রত্যক্ষ যে, নাট্যকার নাটক লিখিয়া, অভিনেতা সেই নাটক অভিনয় করিয়া দেশময় তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। পেইন্ সাহেবের করপোরেশনও আমরা দেখি নাই। শুনিয়াছি সে করপোরেশনে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল পান করিত। তবে আমরা চিত্তরঞ্জন দাশের করপোরেশন দেখিয়াছি। দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া তরলিত হেম কাঞ্চন-জঙ্ঘা দেখিয়া যেমন মনে হয়, নয়ন সার্থক, জন্ম সার্থক হইয়া গেল, স্বরাজ্য-দল অধিকৃত কলিকাতা করপোরেশন দেখিয়াও তদ্রূপ মনে হইয়াছিল, কোন দুঃখ নাই, নাই বা দেখিলাম "সাবাস্ আটাশ," নাই বা দেখিলাম, পেইন, এলেন, নাই বা দেখিলাম, নাই বা দেখিলাম বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের মানসনেত্রের করপোরেশন! বিন্দুমাত্র ক্ষোভও আর নাই, যাহা দেখিলাম, তাহাতেই ধন্য মানিতেছি। পুরীতে নীল সমুদ্র দেখিয়া একবার বা একদিন নহে, বারম্বার ও চিরদিন বলিয়াছি, "আহা কি দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না!" ভারত মহাসাগর আরও বড়, আরও বিশাল, আরও মহান এবং তাহা দেখিতে পাই নাই ভাবিয়া দুঃখে ম্রিয়মান ত হই নাই! বঙ্গোপসাগর দেখিয়াই দেখা সফল হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন দাশ করপোরেশনের মেয়র; সুভাষচন্দ্র চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। চিত্তরঞ্জন দাশ আধুনিক কালের উন্নততর রণনীতির অনুসরণে কলিকাতায় বেস্ (base) স্থাপিত করিয়া এই বেস্ হইতে সমগ্র ভারতে তাঁহার স্বরাজ্য সংগ্রাম পরিচালিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিগত বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকানরা ভারতবর্ষকে বেস্ করিয়া জাপানীদের বিরুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ করিয়া জাপানের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। এই ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার দৈত্য-

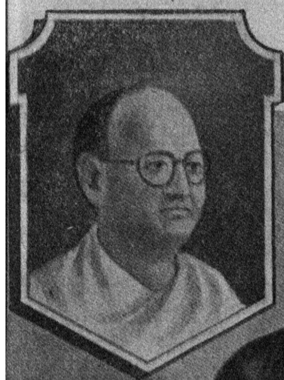
দানবাকৃতি প্লেনগুলাকে দুই তিনখানা গিল্ডার ভর্ত্তি যুদ্ধোপকরণ অথবা পঙ্গপালের মত সৈন্যসামন্ত লইয়া ভারতবর্ষের স্থল, জল ও অন্তরীক্ষ প্রকম্পিত করিতে কে না দেখিয়াছে ? চিত্তরঞ্জন দাশও কলিকাতা করপোরেশন-বেস্ হইতে সমস্ত ভারতবর্ষে স্বরাজ্য বিস্তারের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাও কে না দেখিয়াছে ? অনেকের সঙ্গে আমরাও তাহা চাক্ষুষ করিয়াছি।

করপোরেশনের কর্মচারী, কণ্ট্রাক্টার, ঠিকাদার, কাউন্সিলার, অফিসার, দাশ মহাশয়ের সকলকেই দরকার। সামগ্রিক যুদ্ধে সমগ্রকে একসূত্রে বাঁধিতে হয়; একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে হয়। স্বরাজ্যদলের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, নব চেতনায় প্রবুদ্ধ সেই উজ্জ্বল দিনগুলির পরিপূর্ণাঙ্গ আলেখ্য না হৌক, একটি খসড়া অঙ্কনের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

মেয়র পদ যেমন নূতন, মেয়রের জন্য তেমনই নূতন ঘর, নূতন আসবাব, নূতন আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে। সংবাদপত্রে মেয়রের কামরার চিত্র বাহির হইতেছে; সৌখীন ও সম্ভ্রান্ত সমাজের নরনারী করপোরেশনের মেয়রের ঘরের সাজসজ্জা দেখিতে আসিতেছেন। সেকালের রাজা মহারাজা অথবা বাদশাহ নবাবগণ যখন সভাগৃহে বা দরবারে আসিতেন, নকীব ফুকারিত। মেয়র কাউন্সিল চেম্বারে প্রবেশ করিবার কালে সেক্রেটারী 'নকিব' হইয়া মেয়রের আগমন বিঘোষিত করে। এই সকল নূতন নূতন আদব-কায়দার খবর খবরের কাগজে ও লোকের মুখে মুখে সহরের সর্ব্বত্র অভিনব ও অভূতপূর্ব্ব পুলক সৃষ্টি করিতেছে।

পুরাতন কমিশনাররা প্রায়শঃ নিশ্চিহ্ন হইয়াছেন, নূতন নূতন লোক কাউন্সিলার হইয়া আসিয়াছেন; পুরাতন বহু কর্ম্মচারী বিদায় লইয়াছেন; নাম-জাদা ও প্রতিষ্ঠাবান কণ্ট্রাক্টাররাও আর সুবিধা হইবে না ভাবিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। 'দেশ সেবা' ব্রত লইয়া নূতন নূতন কর্ম্মচারী আসিয়াছে; 'দেশের সম্পদ বৃদ্ধির' মহান ও পবিত্র আদর্শে উজ্জীবিত হইয়া নূতন নূতন কণ্ট্রাক্টার আমদানী হইয়াছে। খদ্দরের বাহার দেখে কে ? ঠিকাদার, হয়ত নারিকেল কাঠি—অর্থাৎ শতমুখীর মোরব্বা সরবরাহ করা তাহার কাজ, সে'ও খদ্দরে বিভূষিত না হইয়া করপোরেশন বিল্ডিঙে প্রবেশ করে না। সরবরাহকারীর খদ্দরে অনাদর প্রকাশ পাইলে ঝাঁটার কাঠির (বাণ্ডিলে না হৌক) বরাতে আগুন লাগিয়া যাইবে!

কেন জানি না, করপোরেশনের একটা 'চিরকেলে' নাম ছিল আজও আছে, 'দু পয়সা করিবার পক্ষে' স্থানটি অত্যুৎকৃষ্ট। ১৯২৪ সালের পূর্ব্বে কমিশনারদের



অক্ষপক্ষোদ্দেশে

'ক্যারাটাইন্'

সংখ্যাও কম ছিল এবং সমাজের একটু উচ্চস্তর হইতেই তাঁহাদের আগমন ঘটিত। নূতন আইনে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। খদ্দরের ভেক্ ও খঞ্জনীতে চিত্তরঞ্জন কি জয় বোল্ তুলিয়া বহু কাল্কা যোগী দীর্ঘজটার শুভাগমন হইয়াছে। অরক্ষিত ছোলার ক্ষেতে সদাক্ষুধাতুর অজ রাজকুলের আনন্দ দেখে কে? কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার যুদ্ধকেন্দ্র (base)টিকে ভাগ্যান্বেষীর গো-চারণ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইতে দিতে নারাজ। সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের মত বিরাট কুতবমিনার সদৃশ পুরুষ প্রধানকেও 'তিতিবিরক্ত' ও 'ঝালাপালা' হইয়া পদত্যাগের হুম্কি দিতে আমরাও দেখিয়াছি। কুলের কথা সব বলিতে পারিব না, বলা উচিতও নয়; তবে সাধু সজ্জনগণ যে নিজেরাই সন্ধান করিয়া বুঝিয়া লইবেন, সে ভরসা আমাদের আছে। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের রাজত্বকালে পার্টিফণ্ডের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির সংবাদ সহরে প্রবাদের মত চলিয়া গিয়াছিল তাহাও সহরের লোকে শুনিয়াছিল; এবং ইহাও শুনিয়াছিল যে, পার্টিফণ্ডে প্রণামী না দিলে বাহিরের লোকের করপোরেশনে 'প্রবেশ অধিকার জুটিত না'। কালীঘাটের কালীমাতার মন্দিরেও ঐ রকমের কি একটা ব্যবস্থা আছে শুনিয়াছি।

তখনকার দিনে সাড়ে সাত শত টাকা বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের ছিল। প্রখ্যাত গুজব মহারাজ বলেন, এই সকল নিয়োগ ব্যাপারে পার্টিফণ্ড সজীব ও সজাগ হইয়া বহুবিধ লীলা প্রদর্শন করিত। সত্য মিথ্যা বলা যায় না। তবে একদিন যে কারণেই হৌক, চীফ সুভাষও 'দূর ছাই' করিয়া পদত্যাগ পত্র পেশ করিয়া গৃহে ফিরিলেন, গুজব মহারাজ ব্যতিরেকেও এই সংবাদ কলিকাতা সহরে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। আজকাল বাঙ্গলাদেশে চাকরী গুণানুসারে অথবা যোগ্যতানুসারে না হইয়া সম্প্রদায়ের নামোল্লেখমাত্রেই হইয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়। করপোরেশনের চাকরী সম্পর্কে, জেল, খদ্দর, পার্টিফাণ্ড প্রভৃতির যোগাযোগের সংবাদ সহরে প্রকাশ্যভাবেই আলোচিত হইত। চীফ সুভাষচন্দ্রকে বোধ হয় উল্লিখিত গুণগুলিকে যোগ্যতার মাপকাঠির অন্তর্ভুক্ত করিতে সম্মত না হওয়াতেই পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই ব্যাপার বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই; বরং রাত্রির মধ্যেই আপোষ হইয়া গিয়াছিল। কর্পোরেশনের মত বিশাল ও বহুধা বিস্তৃত জনসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সুপরিচালিত করিতে হইলে, কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে কর্ম্মক্ষমতাই যে একমাত্র বিচার্য্য বিষয়, প্রবল প্রতিপক্ষতা সত্বেও চীফ এই সিদ্ধান্তই তখনকার

মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ইহার পরে যে কয়মাস তিনি চীফ ছিলেন, কর্ম্মচারী নিয়োগে "পার্টি" ফণ্ড প্রভাব বিস্তার অথবা হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই।

পরবর্ত্তীকালে, সুভাষচন্দ্র বসুর স্কন্ধে যখন করপোরেশনে কংগ্রেসী সদস্য পার্টির দলপতিত্ব অর্পিত হইয়াছিল তখন 'পার্টির' শৃঙ্খলা রক্ষা ও স্বার্থ-সঙ্ঘর্ষের সমাধান করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। সামঞ্জস্য-বিধান যখন অসম্ভব হইত তখন তিনিও পদত্যাগ দাখিল করা ছাড়া গত্যন্তর দেখিতে পাইতেন না। এই সর্ব্বজ্বরহর পদত্যাগ-পত্র অনেকবার অনেক অনর্থ নিবারণ করিয়াছে ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞান হইতেই বলিতে পারি।

ব্রজভূমিতে কানুর স্থান যেমন সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বোচ্চে, সংশোধিত কলিকাতা করপোরেশনে সুভাষের স্থানও তদ্রূপ। সুদীর্ঘকাল ইহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। এমন কি দেশত্যাগের সময়েও তিনি ইহার সদস্য ছিলেন এবং ভজন-পূজন ও যোগ-সাধনে মগ্ন হইবার পূর্ব্ব রাত্রিতেও তিনি কর্পোরেশনের সভায় মহাজাতি সদন সম্পর্কিত ব্যাপারে বাগ্মিতার ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার দ্বারা জয়লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। পরাজয় বরণ তাঁহার ধাতসহ ছিল না এবং রাষ্ট্রনীতির আদর্শ অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিতে ছল-বল-কৌশলের মধ্যে যেটির প্রয়োজন বিনা দ্বিধায় তাহাই প্রয়োগ করিতেন। একবারের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

সেবার (বোধ হয় ১৯৪০ সালে) বাঙ্গলার কংগ্রেসে বিভেদ বশতঃ করপোরেশনের নির্ব্বাচনে সুভাষচন্দ্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যতিরেকে 'প্রভুত্ব' রক্ষা অসম্ভব। ক্ষমতাহীন ও প্রভুত্ববর্জ্জিত হইয়া মলিন ও নিষ্প্রভ অবস্থায় কালাতিবাহন সুভাষের জীবন দর্শনের অযোগ্য। সুভাষ সর্ব্বজননিন্দিত মুস্লিম লীগের সহিত প্যাক্ট করিয়া প্রভুত্ব কায়েম করিলেন। সমস্ত কলিকাতায় ছিঃ ছিঃ ধ্বনি উঠিল; সংবাদপত্রে বিক্ষোভ, সভা-সমিতিতে ঝটিকা উত্থিত হইল; কিন্তু সুভাষের তাহাতে দৃক্‌পাতও নাই। মুস্লিম লীগ নায়ক কায়েদে আজম সেই সময়ে জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। পাকিস্তান ও টু-নেসন থিওরী উত্থাপিত করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ বিঘ্নাস্তৃত ও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর উত্তোলন করিয়া জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর চিত্ত বিষাক্ত করিয়া দিয়াছেন, এই সময়ে সেই লীগের সহিত মিতালীর ফলে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে জনমত এমন তীব্র

হইয়া উঠিয়াছিল, যে সুভাষচন্দ্রের পক্ষেও তাহা অভাবনীয় ছিল! সুভাষচন্দ্র যে দেশের জনমত এই ভাবে "পদদলিত" করিতে পারেন তাহা দেশের লোকও কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। করপোরেশনে আধিপত্য (অথবা প্রভুত্ব) বজায় রাখিতে হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল না হইলে তাহা সম্ভব হয় না। যেখানে আধিপত্য নাই, সেখানে তাঁহার মত লোকের থাকা না থাকা একই কথা।

আর একবার আর এক বিপদকালে সুভাষচন্দ্রকে একই কারণে নীতি-বিগর্হিত কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা করপোরেশনের চীফ, সুভাষদলের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই এবং কোন কালে যে করিবেন সে ভরসাও বড় নাই। কলিকাতা করপোরেশনে এই 'কেচ্ছা কেলেঙ্কারী' জমাট হইয়া রহিয়াছে যে, জে, সি, মুখার্জ্জির মত সৎ, সজ্জন, সহৃদয় ব্যক্তির সহিত কংগ্রেস দলের সম্পর্ক দা-কুমড়োর মতই রহিয়া গেল। অনেকবার লোক মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের মিলন ঘটাইয়াছে, খানাও খাওয়াইয়াছে কিন্তু অবশেষে দেখা গিয়াছে মিলনের কল্পিত সেতু কল্পলোকেই লীন হইয়াছে। ডালহাউসীতে যখন এক বাড়ীতে অবস্থিতি, এক টেবিলে ভোজন, এক সঙ্গে ভ্রমণ, তখন আমিও চেষ্টার ক্রটী করি নাই; কাঠবিড়ালী যদি সেতু বন্ধনে সহায়তা করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে দুইটি ভদ্র মনুষ্যের মধ্যে সেতু বন্ধন করিতে আমিই বা না পারিব কেন?

জে, সিকে আমি জানিতাম; ফেরঙ্গ পোষাকটা বাদ দিলে মানুষটার কাহারও সহিত বিরোধ হইবারই কথা নহে। একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল লোকটির সহিত অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা করিয়াছি, দেশপ্রেমে, দেশাত্মবোধে, মহানুভবতায় ও নিষ্কলঙ্ক শুচিতায় মানুষটি যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আজও অকুণ্ঠকণ্ঠে তাহা আমি বলিব। কিন্তু পোষাকটা যে কেন 'ফেরঙ্গ' হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত। আমাদের তখনকার ডেপুটী মেয়র সহিদ সুরাবর্দ্দীর কথা আমার বেশ মনে আছে। সহিদ সাহেব তখন স্বরাজ্য দল-নায়ক। তাঁহার

'গান্ধী বলিতে প্রাণ করে আনচান'

জে সি'র 'ফেরঙ্গ' পোষাকের একটা কৈফিয়ৎ বন্ধুবর সহিদ দিয়াছিলেন।

"জে-সি, তুমি খদ্দর পর না কেন?"

"এমনই।"

"কোন কারণ নাই?"

"না।"

সহিদ নিবিষ্টমনে তক্‌লি কাটিতে কাটিতে মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি বলবো কেন খদ্দর পর না? তুমি বিলেত থেকে এসে অবধি ট্রাউজার পরেছ, আজ হঠাৎ খদ্দর পরলে পাছে লোক বলে চাকরী রাখবার জন্যে পরছো, এই 'বদনামটুকুর' ভয়েই তুমি পর না, না? কিন্তু ঐটাই তোমার (দুর্ব্বলতা) উইকনেশ। লোকে যা খুসী বলুক-না, তাতে কি আসে যায়? এই দেখ না, আমাকেই দেখ না, খদ্দর ছাড়া আমি কিছুই পরি না, আমার নিদ্রাবসন পর্য্যন্ত—মোটা খদ্দরের।"

"তোমার কথা ছেড়ে দাও! তুমি হলে দেশের নেতা, আমি ত চাকর বই নই।"

ট্রেণে এই কথোপকথন হইতেছিল। ডাক গাড়ী, অনেক ষ্টেশন ছাড়িয়া ছাড়িয়া বড় ষ্টেশনে থামে। এই সময় ট্রেণ (ঠিক মনে নাই, বোধ হয়) পোড়াদহে থামিল। প্ল্যাটফর্ম্ম লোকে লোকারণ্য, সহিদ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন, মহাত্মা গান্ধীকি জয়! সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম্ম সমুদ্র গর্জ্জনবৎ হুঙ্কার ছাড়িল, মহাত্মা গান্ধীকি জয়। ফুলের মালা ও খদ্দরের সূতার মালায় সহিদ কণ্ঠ আচ্ছাদিত হইয়া গেল। সহিদ সাহেব সেই অসুবিধার মধ্যেও নিবিষ্টচিত্তে তক্‌লীতে সূতা কাটিতেছেন। ট্রেণ মহাত্মা গান্ধীর জয় ধ্বনির মধ্যে ছাড়িয়া দিলে সহিদ যখন স্বস্থানে আসিয়া বসিয়া মালার রাশি (ভার) নমিত করিতে লাগিলেন, জে-সি জিজ্ঞাসা করিলেন, সহিদ, কতদিন আর তক্‌লী কাটিবে?

উত্তরে হাসন সহিদ সুরাবর্দ্দী সাহেব ইংরাজীতে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভারতবর্ষের মুক্তি যে তকলীর উপরে নির্ভর করিতেছে তাহা বর্জ্জনের কোন কারণই তিনি কল্পনা করিতে পারেন না।

জে-সি নীরবে মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই এই হাসির অর্থ সুস্পষ্ট হইয়াছিল। আমার মূল বক্তব্য হইতে আমি অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি কিন্তু সেই সময়কার এমন একটি ঘটনার সংযোগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়িয়াছে, যাহা ছাপার হরপে লিপিবদ্ধ করার লোভ সামলাইতে পারিতেছি না। তক্‌লী কাটা সহিদ সাহেব কয়েকদিনের মধ্যে তক্‌লীর বহ্ন্যুৎসব কি ভাবে সম্পাদিত করিয়া পরবর্ত্তীকালের সহিদ সুরাবর্দ্দীর রূপ পরিগ্রহ করিতে করিতে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগাষ্টের নাদির শাহ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন সে কথাটা বাঙ্গলার লোকের জানা থাকা ভাল।

হগ মার্কেটের মধ্যে একদিন একজন মুসলমান 'পীর' মৃত্যুমুখে পতিত

হ'ন। মার্কেটের কতিপয় মুসলমান দোকানদার পীর সাহেবকে মার্কেটের মধ্যেই সমাধিস্থ করিতে উদ্যত হয়। সহিদ তখন কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র। তিনি এই অন্যায় আব্দারের পোষকতা করেন; চীফ সুভাষ সহিদের বিরুদ্ধতা করিতে সাহস করেন নাই, পীর মার্কেটের ভিতরেই কবরস্থ হন কিন্তু তাহার ফলে মার্কেটের হিন্দু দোকানদারগণ ও করপোরেশনের হিন্দু কাউন্সিলার মাত্রেই বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠেন। অবস্থা এমন হইয়া উঠে যে, সহরের শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা দেখিয়া মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। আমাদের মনে আছে, এই সময়ে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হইয়া কয়েকদিন আফিসে আসিতে পারেন নাই। জে-সি প্রথম ডেপুটী, চলতি কাজ তিনিই চালাইতেছেন। জে-সি একদিন রাত্রে সুভাষকে বলিলেন, আমি অনেকগুলি মৌলভী ও পীর যোগাড় করেছি, তারা রাতারাতি পীর সাহেবটিকে তুলে কবরখানায় কবর দিতে রাজী হয়েছেন; আপনি সম্মত আছেন জানতে পারলেই আমি নিঃশব্দে আজই কাজ শেষ করে ফেলি। সুভাষ বলিলেন, সহিদ বলেছে, ও রকম কিছু করলে কলকাতায় এমন আগুন জ্বলবে যে তা আর নেবানো যাবে না। তবুও জে-সি বলিলেন, পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে, তিনি দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। "কিন্তু সহিদ"? ফলে সেই পীর সাহেব আজও হগ মার্কেটের মধ্যস্থলে অনন্ত শয়নে শায়িত।

তারপর হইতে পর পর এমন সব ঘটনা ঘটিতে থাকে যাহার ফলে সহিদ সাহেবকে ডেপুটী মেয়র পদ হইতে বিদায় লইতে হয় এবং আমার যতদূর স্মরণ আছে তখন হইতে তক্‌লীও আর তাঁহার হাতে উঠে নাই; মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনিতে তাঁহার অন্তরও আর উল্লসিত হয় নাই। সহিদ সাহেবের শ্বশুর (স্যার আব্দার রহিম) ও কুটুম্ব (স্যার আব্দাল করিম গজনেভী) বোধ করি এই সময় বরাবর 'মিউজিক বিফোর মস্‌কের' ধূয়া তুলিয়া বাঙ্গলা, তথা ভারতবর্ষের আকাশ বাতাসে এমন এক পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিলেন যে, দিন কতক প্রায় সমস্ত দেশ জুড়িয়াই নরমুণ্ড কাটাকাটি চলিতে লাগিল। ইহারই ক্লাইম্যাক্সে ১৯৪৬ সালের আগাষ্ট কার্ণেজ এবং পরিশিষ্টে ভারত ব্যবচ্ছেদ। বাঙ্গলাও দুইখণ্ডে বিভক্ত—পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গ। জিন্নার টু-নেসন থিওরী বিদ্বেষ বিষ বৃক্ষ রোপন করিয়াছে সত্য, সহিদ সাহেবের হিন্দু-নিধন মূলক শাসন নীতিই যে বঙ্গবিভাগ অপরিহার্য্য ও তরান্বিত করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

হ্যাঁ, যে কথা বলিতেছিলাম। কংগ্রেসী দল (বসু ভ্রাতৃদ্বয় দলপতি) জে-সিকে ভাতে না মারিতে পারিয়া হাতে মারিতে উদ্যত হইলেন। করপোরেশনের

এই দুর্বিনীত চীফের হাতে মাত্র ধাঙ্গড়, মেথর, কুলি নিয়োগের ভার রাখিয়া অন্য সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দলের করায়ত্ত করা হইল। একদা, মেয়র চিত্তরঞ্জন দাশ কর্ম্মচারী নিয়োগ পার্টির স্বার্থের সহিত সংযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে তদানীন্তন চীফ সুভাষচন্দ্র চীফের গদিতে ইস্তফা দিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আবার একদিন সেই সুভাষচন্দ্রই দলের স্বার্থকে করপোরেশনের স্বার্থের উপরে স্থান দিলেন। ব্যাপার যত বিসদৃশ হোক না কেন, প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যাঁহার জন্মগত এবং স্রষ্টার দান বলিয়াই স্বীকৃত, প্রাধান্য বিলোপের সম্ভাবনাও যে তাঁহার পক্ষে অশ্বস্তিকর বিবেচিত হইবে ইহাকে স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি বলিয়াই মানিয়া লওয়া উচিত।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সংস্কার সাধন করিয়া বাঙ্গলা দেশের এই অদ্বিতীয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি জনগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যেমনটি চাহিয়াছিলেন, তেমনটি হয়-নাই বটে; তবে জনসাধারণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধে নাই। স্বরাজ্য দল তখন বাঙ্গলার রাজনীতি ক্ষেত্রে দামোদরের বন্যা আনয়ন করিয়াছে। বন্যায় একূল ওকূল দুকূল গোকুল ভাসিয়া গিয়াছে। স্বরাজ্য দল-নায়ক চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতা কর্পোরেশনটিকে স্বরাজ্য দলের কুক্ষিগত করিয়াছেন; নিজে মেয়র্যালটি গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ, সুদর্শন সুভাষচন্দ্রকে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা করিয়াছেন। নিয়োগ ও নির্ব্বাচন গভর্ণমেণ্টের মনঃপূত হয় নাই। আগেই বলিয়াছি, স্বরাজ্য দল তখন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকাইয়াছে, প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে গভর্ণমেণ্টেরও সাহস হইল না।

কিন্তু দুষ্টের ছলের অভাব হয় না, হইবার কথাও নহে। মাস পাঁচেকের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশন ও চিত্তরঞ্জন দাশকে পঙ্গু করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল। নূতন কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদিদের কুটুম্বিতা আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব হইল না এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নিরোধ ও শান্তি এবং শৃঙ্খলা সংরক্ষণ জন্য সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিতেও দ্বিধা করিবার কারণ রহিল না। সুভাষ বাবুকে প্রথমে আলিপুর, পরে বহরমপুর এবং তারও পরে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে অন্তরীণাবদ্ধ রাখা হয়। ব্যাধি সংক্রমণ ও বিস্তারের এমনই ভয়।

রাজা বিনা রাজ্য চলে কি না জানি না, কিন্তু চীফ বিহনে কর্পোরেশন অচল থাকিতে পারে না। মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি সুভাষের স্থানে অস্থায়ীভাবে চীফ

নিয়োজিত হন। তারিখটা ঠিক স্মরণ নাই; তবে ব্যাপারটা আমার নির্ভুল স্মরণ আছে। একাদিক্রমে তিন চার বৎসর জে-সি 'অস্থায়ী' হইলেও যোগ্যতার সহিত চীফের গুরু দায়িত্ব পালন করেন। তখন নিয়োগকর্ত্তারাই সঙ্কল্প করেন যে, এই লোকটিকে অনির্দ্দিষ্টকাল অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া রাখা সঙ্গত হইতেছে না। গভর্ণমেণ্ট যখন সুভাষ বাবুকে মুক্তি দিবার কোন বাসনাই প্রকাশ করিতেছে না তখন 'স্থায়ীর' আশা ত্যাগ করিয়া 'অস্থায়ীকে' 'স্থায়ী' করাই কর্ত্তব্য। বলা দরকার, ইত্যবসরে চিত্তরঞ্জনের বিয়োগ ঘটিয়াছে এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাঁহার স্থলাভিসিক্ত হইয়াছেন।

নিয়োগকর্ত্তা প্রস্তাব করিলেন, জে-সি মুখার্জ্জিকে স্থায়ী চীফ করা হোক। এই প্রস্তাব সম্পর্কে কর্পোরেশনে কলহের অবকাশ ছিল না; কারণ জে-সি সকল দল ও সকল সদস্যকেই সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কাজেই প্রস্তাবের বিরোধিতার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। কিন্তু এমন লোক পৃথিবীতে সকল সময়েই ছিলেন এবং আজও আছেন যাঁহারা চাকরীকেই মোক্ষ জ্ঞান করেন। সুভাষবাবুর বন্ধুবান্ধবগণের নিকট এই প্রস্তাব অতীব অসমীচীন বিবেচিত হইল। তাঁহাদের দুশ্চিন্তা—সুভাষ বাবু 'বেকার' হইয়া পড়িবেন!

যেদিনের সভাধিবেশনে চীফ নিয়োগ হইবে সেইদিন মধ্যাহ্নে অকস্মাৎ বায়ু উজান বহিল। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত 'রাজা'কে (জে-সি'র ডাক নাম) ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন, হ্যাঁহে, সুভাষকে কি তোমরা ভাসিয়ে দিতে চাও?

আজ মনে করিতেও লজ্জায় নতশির হইতে হয় যে, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কেও চাকরী-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী জাতির মনোভাবই অর্পিত ও আরোপিত হইয়াছিল। নেতাজী ও আই-এন-এর সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের জীবন গঠনে দুইটি ঘটনা যে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। একটি ঘটনা এই! আর একটি ১৯৩৯ সালে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র যে সেদিন কর্পোরেশনের হাড়গিল্লা মার্কা আসনে কায়েম হইয়া বসিতে পান্ নাই, বাঙ্গলার—তাই বা কেন, ভারতবর্ষেরই সৌভাগ্য। আর, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রাষ্ট্রপতিত্ব ত্যাগের মধ্যেও বিরাট বিপ্লবের বীজ বপিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা মনে করি।

বিজয়কুমার বসু (এখন স্বর্গে), চারুচন্দ্র বিশ্বাস (এখন হাইকোর্টের জজ), ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যস্থতায় সিদ্ধান্ত হইল, জে-সি স্থায়ীভাবে নিযুক্ত

হইলেও, সুভাষ কারামুক্ত হইয়া চীফের আসন দাবী করিলে জে-সি চীফের পদত্যাগ করিয়া পুনশ্চ ডেপুটিত্ব স্বীকার করিবেন।

জে-সি'র ইহাতে আপত্তির কারণ ছিল না; তিনি একটি 'যাঞা' করিলেন, ডেপুটিত্বে আর্থিক ক্ষতি না হইলেই হইল।

অতঃপর সেইদিনের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মিষ্টার জে-সি মুখার্জ্জি কলিকাতা কর্পোরেশনের স্থায়ী চীফ নিযুক্ত হইলেন।

কাকতালীয় ব্যাপার কি না কে জানে, ইহারই—কিছু পরে সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করিলেন। সে 'মুক্তি রহস্য' অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত বিশেষ। এখানে তাহা বলিবার সুযোগ হইবে না। শুধু এইটুকু বলিতে হইবে যে, তাঁহার অসুস্থতার জন্যই সরকার বাহাদুর মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র নিরাময় হইবামাত্র তাঁহার হিতকারী সুহৃদ্বর্গ তাঁহাকে কর্পোরেশনের 'জোয়ালে আবদ্ধ করিবার জন্য' অতিমাত্র উৎসুক হইয়া উঠিলেন। জে-সির সহিত যে জেণ্টেলম্যানস্ এগ্রিমেণ্ট হইয়াছিল তাহার কথাও উঠিয়া পড়িল।

মহাজনগণ বলিয়াছেন, সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতম!

সুভাষ বাবুর অতি হিতকামিগণ অত্যুৎসাহের বশে অতি বুদ্ধির বিকাশ করিয়া না ফেলিলে হয়ত অতিমাত্রায় হতাশ হইতেন না; কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্টের মত 'অতি বিশ্বাসে অতি দুঃখ' বরাত—লিখন। তবে তাহার কারণ ছিল বলিয়াই আমার মনে হয়।

তাঁহারা পার্টি মিটিঙে প্রস্তাব করিলেন যে, কর্পোরেশনটি জাহান্নামায় গমন করিয়াছে—'এখনও গাঁজা খেলে বাঁচে'—সুভাষ বাবুকে আসিয়া কর্পো-রেশনকে গো-ভাগাড় হইতে উদ্ধার করিতে অনুরোধ করা হৌক!

এই প্রস্তাবের মর্ম্মাবগত হইয়াই জে-সি বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, ভালরে ভাল! এতকাল ভূতের বোঝা বহিলাম সে কি এই সুনামের আশায়! ভদ্রলোকের চুক্তির সর্ত্ত ছিল যে, সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হইয়া চীফের আসন চাহিলে জে-সি আসনখানি ছাড়িয়া পরবর্ত্তী আসন গ্রহণ করিবেন। জে-সি করপোরেশনকে জাহান্নমে প্রেরণ করিয়াছে, অন্য কেহ আসিয়া উদ্ধার করিবে এমন সর্ত্ত ছিল না; এমন সর্ত্তে সম্মত হওয়া আত্মসম্ভ্রমসম্পন্ন ভদ্রসন্তানের পক্ষে সম্ভব হইতেও পারে না।

পাউণ্ডটাক্ ফ্লেশ লইতে চাহ, লহ; কিন্তু রক্ত না পড়ে! জে-সির

বন্ধুবান্ধব (আমাদের ভাগ্যক্রমে আমাদের নামও সেই দীর্ঘ তালিকার একাংশে এবং সর্ব্বশেষে স্থানলাভ করিয়াছিল এবং আজও শতাব্দীর একপাদ অতীতেও দেখিতেছি মহামান্য স্বাধীন ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি হইতে ক্ষুদ্র ও অখ্যাত, অধীন বিজয়রত্ন তালিকাচ্যুত হয় নাই !) বলিলেন, ফ্লেশ পর্য্যন্ত ; তদধিক নহে ।

পর্দ্দার অন্তরালে কি ঘটিয়াছিল আমি জানি না। তবে এমন কথা মনে না হইতে পারে এমন নহে যে, সুভাষ-হিতৈষিগণ সুভাষচন্দ্রকে চাকুরী গ্রহণে সম্মত করাইতে না পারিয়া সুভাষচন্দ্রের 'সেন্টিমেন্ট' ভাবাবেগের উপর মূলধন করিয়াই যাত্রারম্ভ করিতে চাহিয়াছিলেন। "কর্পোরেশন গোল্লায় গেল" শুনিলে সুভাষবাবু কি আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন ? আমাদের মনে হয় পার্টি মিটিঙে ঐ প্রস্তাব পাশের ইহাই কারণ। "ইসলাম-ইন-ডেঞ্জার" শুনিলে ভারতবর্ষে কি অঘটনই না ঘটে !

কয়েক দিন হাঁটাহাঁটি, ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি চলিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই যে কথায় বলে, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি, তাহাই হইল। জে-সি আসন ত্যাগে প্রস্তুত "কিন্তু কলঙ্ক পশরা বহনে অক্ষম। ক্রুটী মার্জ্জনীয়।" নিয়োগকর্ত্তা কর্পোরেশনও অদ্ভুত প্রস্তাবটির মর্য্যাদা রাখিতে চাহিল না। প্রস্তাবটির ভাগ্যে ছিল, মাঠে অপমৃত্যু। তাহাই ঘটিল।

ভালই হইল। সুভাষচন্দ্রকে আর চাকরী করিতে হইল না। একদিন যাঁহাকে পরপদাবনত ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া ভারতের ইতিহাসে অভিনব অধ্যায়ের অবদান সৃষ্টি করিতে হইবে—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐন্দ্রজালিক প্রেরণা দান করিয়া স্বাধীনতার সিংহদ্বার মোচন করিবার ভার ভারতের ভাগ্যবিধাতা যাঁহাকে অর্পণ করিবেন, তাঁহাকে মহেশের যাদু ঘোষের রথচক্রে আবদ্ধ করিবার কল্পনা—"আলিবাবা" নাটিকার ভাষায় "ফিরোজা লো, হেসে মরি !"

আজাদ হিন্দ সরকারের সহিত নিম্নবর্ণিত ঘটনাটির কোনরূপ সম্পর্ক না থাকিলেও উপাদেয় ঘটনাটি আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠাতার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বন্ধ বলিয়াই 'গল্প'টি এখানে লিখিত হইল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রেষ্টিজের অন্তঃসারশূন্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়াও কাহিনীটি সন্নিবেশিত করিলাম।

সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে আবদ্ধ থাকার সময়ে পুনঃপুনঃ জ্বরাক্রান্ত

হইতেছিলেন, নানাম্ সূত্রে এই সংবাদ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিতেছিল এবং জাতীয়তাবাদী ভারত সম্মিলিতকণ্ঠে তাঁহার মুক্তির দাবী করিতেছিল; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট চিরকাল যেমন কাণে তুলা গুঁজিয়া থাকেন এখনও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। আইন সভায় প্রশ্ন করা হয়, গভর্ণমেণ্ট 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের জবাব দেন; কোন প্রতিকার হয় না। এই ভাবেই কিছু কাল চলিয়া গেল। তারপর সংবাদ আসিল, সুভাষচন্দ্র আন্ত্রিক ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; নিত্য জ্বর হইতেছে; আহারে অত্যন্ত অরুচি এবং তাঁহার দেহের ওজন হ্রাস পাইতেছে।

বলা বাহুল্য বাঙ্গলাদেশে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সংবাদপত্রের প্রবন্ধে বক্তৃতামঞ্চে ও বক্তৃতায়, স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণের সভায় সুভাষের মুক্তি কামনা করিয়া প্রস্তাব পাশ হইতে লাগিল। মন্দিরে মন্দিরে পূজারতির ব্যবস্থা হইল; মসজেদে মসজেদে নমাজ পঠিত হইতে লাগিল। রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা বাহির হইতে লাগিল। বাঙ্গলার সুদূর পল্লীগ্রামেও উত্তেজনা বিসর্পিত হইল।

চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় বৎসর দুই পূর্ব্বে গতাসু হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনটি 'ব্যথা' বহন করিয়াই তাঁহাকে মর-জগত ত্যাগ করিতে হয়। তিনটির মধ্যে প্রথম ও প্রধান, সুভাষ সুদূর ব্রহ্মদেশে অন্তরীণ থাকিয়া গেল! দ্বিতীয়, কলিকাতার হগ মার্কেট হইতে পীরের সমাধি স্থানান্তরিত না হওয়ায় নিরপেক্ষ সহরবাসীর চক্ষুতে কলিকাতা করপোরেশন অনেকটা হীন হইয়া পড়িয়াছে। আর তৃতীয় দুঃখ, ফরিদপুর রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি যে আপোষমূলক কর্ম্মপদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার পরিণতি দেখিবার সুযোগ না হওয়ায় তাঁহার আক্ষেপের অবধি ছিল না। দাশ মহাশয়ের অকস্মাৎ মৃত্যুর ঠিক দুইদিন আগে (বোধ হয় আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে) দার্জ্জিলিঙে, প্রসিদ্ধ "স্টেপ্ এসাইডে" এক মধ্যাহ্নকালে আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া ঘণ্টাখানেক ছিলাম, তাহারই মধ্যে তিনি ঐ তিনটি দুঃখই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমি ২রা আষাঢ় কলিকাতায় ফিরি; ৩রা আষাঢ় সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, দেশবন্ধু নাই! এই "নাই" যে কি ভীষণ নাই, সে দিনের বঙ্গদেশ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জন না থাকিলেও বাঙ্গলাদেশে সুভাষমুক্তি আন্দোলন উত্তাল ও উদ্দাম হইয়া উঠিতে বাধে নাই। কিন্তু ১৯২৬ সালের আন্দোলনে বৃটিশ

গভর্ণমেণ্ট দমিবে কেন? নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি চিরদিন যাহা করিয়া থাকে, তাহাই করিল।

সেই সময়ে বাঙ্গালীর ভাগ্যবশে নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাঙ্গলার লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। কুখ্যাত ভবানন্দ মজুমদারের বংশাবতংশ হইলেও মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র বাঙ্গলার ভদ্র সমাজে বিশেষ খ্যাতি-সম্পন্ন ছিলেন। কঠোর শাসন পরিষদের সদস্য হইলেও মহারাজ অনমনীয় অথবা কঠোর ছিলেন না। সজ্জন, সদালাপী ও সদ্‌গুণগ্রাহী বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল (প্রসিদ্ধি অমূলক নহে! কারণ তাহা হইলে আমাদের মত নগণ্য অভাজন মহারাজের "প্রিয়বরেষু" মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত না!)। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত মহারাজের ঘনিষ্ঠতা সর্ব্বজনবিদিত। নলিনীবাবুই 'কৃষ্ণনগরের দরবারে' সুভাষ মুক্তির আবেদন দাখিল করেন। মহারাজ ক্ষৌণীশ-চন্দ্র 'ব্রীফ' লওয়ায় আমরা যে কয়জন লোক সেই সংবাদ শুনিলাম, আশা করিতে লাগিলাম যে, মুক্তি অবধারিত। আশা করিবার আরও কারণ ছিল। বাঙ্গলার লাট লর্ড লিটন সাহিত্যিক লর্ড লিটনের বংশসম্ভূত বলিয়াই হৌক অথবা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ভক্ত বলিয়াই হৌক, এ দেশের এরিষ্টোক্রেসীর উপর শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন এবং সেই কারণেই বাঙ্গলার এরিষ্টোক্রেসীর অন্যতম নদীয়া ভবনের প্রতি তাঁহার আনুরক্তি ছিল। লর্ড লিটন যে মহারাজ-নদীয়াকে অসম্ভব সম্ভ্রম দিতেন তাহা অল্প-বিস্তর সকলেই জানিত।

প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা করিবার স্থান নাই; সংক্ষেপে ঘটনার মোদ্দা কথাটিই শুধু বলিব। হঠাৎ একদিন জানা গেল, কলিকাতা হইতে চিকিৎসক মান্দালয়ে যইতেছে সুভাষচন্দ্রকে পরীক্ষা করিতে। বুঝিলাম প্রক্রিয়া সুরু হইয়াছে। আমাদের যতি দাদা (কীর্ত্তনীয়া, মহারাজা ও নলিনীরঞ্জনের বিশেষ বন্ধু, যতীন্দ্রনাথ বসু এক্ষণে স্বর্গত) কীর্ত্তন ধরিলেন,

"গোঠে মাঠে ধাই ধবলী চরাই
কানুর প্রেমের আমি কি বা জানি?"

অকস্মাৎ একদিন অতি প্রত্যুষে স্যার নীলরতন সরকার ও বিধানচন্দ্র রায়কে চোখে রুমাল বাঁধিয়া একখানা মোটরে তুলিয়া সারা কলিকাতা প্রদক্ষিণ করতঃ একখানা ষ্টীমারে তুলিয়া দেওয়া হইল। ষ্টীমারে উঠিবা মাত্র তাঁহাদের চক্ষুর আবরণ উন্মোচিত হইল। ষ্টীমার ততক্ষণে ধক্ ধক্ শব্দে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমার পাঠিকা ও পাঠকগণের পক্ষে উপরি উক্ত অংশটুকু হজম করা কঠিন হইতেছে, তাহা কি আমি বুঝিতেছি না? বেশ বুঝিতেছি। স্যার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মত দুই জন সমাজের শীর্ষস্থানীয় বাঙ্গালী প্রধানকে “আলিবাবা” নাটকের ‘বাবা মুস্তাফা’ করিয়া চক্ষু বাঁধিয়া কলকাতা সহর ঘুরাইতে পারে, এমন মর্জ্জিনা কি বাঙ্গলাদেশে জন্মিয়াছে? তাঁহারাও মর্জ্জিনার মধুকণ্ঠের “বাবা মুস্তাফা” সম্বোধনের উত্তরে “কি বিবি সাহেব” করিতে করিতে সহর প্রদক্ষিণ করিবেন, সুস্থ শরীরে, খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে এই ‘গল্পিকা’ বিশ্বাস করিবেই বা কে? কিন্তু আমি বলিতেছি ঘটনা এইরূপই ঘটিয়াছিল বটে! বিধানচন্দ্র রায় জানিতেন না তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার ‘স্যার’ উপবিষ্ট; আবার নীলরতনও জানিতেন না যে, তাঁহার শিষ্যোত্তম ‘ডক্টর রায়’ তাঁহার সহযাত্রী। ষ্টীমারে উঠিয়া উভয়ে উভয়কে দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সেই সময়ে তৃতীয় এক ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শুভ প্রভাত জ্ঞাপন করিলেন। ইনি গভর্ণমেণ্টের ইংরাজ সার্জ্জেন জেনেরাল। প্রভাতিক চায়ের আসর সজ্জিত ছিল, তিন জনেই চা যোগে মনোযোগ দিলেন। পূর্ব্বরাত্রে নলিনীরঞ্জন নীলরতন ও বিধানচন্দ্রকে মিনতি পূর্ব্বক ‘নিবেদিয়া’ গিয়াছিলেন, মোটর ড্রাইভারের নির্দ্দেশ যেন তাঁহারা মান্য করেন। অসঙ্গত বোধ হইলেও যেন “ত্রুটি অবশ্য মার্জ্জনীয়” হয়।

প্রায় হুগলী নদীর মোহনার কাছে আসিতে দেখা গেল, একখানি সমুদ্রগামী জাহাজ নদীর মধ্যস্থলে নঙ্গর করিয়া আছে। ডাক্তারদের ছোট ষ্টীমারখানি তাহার পিতামহীর অঙ্গবদ্ধ হইলে পিতামহীর ক্যাপ্টেন আসিয়া তিনজন মাননীয় অতিথিকে আমন্ত্রণ দিয়া উপরে লইয়া গিয়া একটি কেবিনের দ্বার খুলিয়া দিয়া এ্যনাউন্স করিলেন, মিষ্টার বোস—স্যার নীলরতন ও ডক্টর রায়। দেখা গেল, কেবিনে শয্যায় শায়িত, সুভাষচন্দ্র বসু।

সার্জ্জন জেনেরাল সাহেব বলিলেন, আপনারা একক বা একসঙ্গে মিষ্টার বোসকে পরীক্ষা করেন ইহাই লাট সাহেবের ইচ্ছা।

নীলরতন বলিলেন, ডক্টর রায় পরীক্ষা করিলেই হইবে। চলুন আমরা বাহিরে গিয়া বসি।

এইখানে একটু ডাক্তারী এটিকেট্ বর্ণনার প্রয়োজন আছে। স্যার নীলরতন ডাক্তার সমাজের দেবাদিদেব, আর বিধানচন্দ্র বয়সেও ছোট, অধিকন্তু স্যারেরই ছাত্র। সেই হিসাবে জুনিয়র সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করিবেন, ইহাই এটিকেট্

বা ভদ্র রীতি। কিন্তু একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, স্যার এটিকেট্ বা রীতি রক্ষার জন্যই বিধানকে আগে পরীক্ষা করিতে নির্দ্দেশ দেন নাই ; পরন্তু বিধানের পরীক্ষাই যে চরম ইহা প্রমাণিত করিবার জন্যই তিনি সার্জ্জেন জেনেরাল সাহেবকে লইয়া কেবিনের বাহিরে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন। স্যার নীলরতন প্রায়ই বলিতেন, ডক্টর রায় ক্ষণজন্মা চিকিৎসক! এমনটি আর দেখিলাম না। আবার রঙ্গচ্ছলে এ কথাও বলিতেন, ডক্টর রায় একটি জুয়াচোর, দেশের লোককে বিষম ফাঁকি দিয়াছেন। চিকিৎসা ও অস্ত্রবিদ্যায় অপরিসীম ও অনন্যসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও তিনি কেন যে ছুরি ধরিলেন না তাহা বুঝি না। অস্ত্র চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে আর্ত্ত সমাজ যে আরও উপকৃত হইত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা 'গুজব'-গল্পের অবসান ঘটাইবার সুযোগ আমি ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

বাঙ্গলার সম্ভ্রান্ত সমাজে একটা গল্প চলিত আছে যে, প্রথম যৌবনে বিধান রায় বিলাত হইতে ফিরিয়া স্যার নীলরতনের কন্যার রূপমুগ্ধ হইয়া বিবাহ বাসনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। স্যার নাকি এই 'আজ্ঞাতকুলশীল' অভাগ্যের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখান করায় আশাভঙ্গে ও মনোভঙ্গে বেদনাহত যুবক আকুমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে সুরু করিয়া বিজয় মজুমদার লিখিত গল্পে রামা-শ্যামা-শঙ্করা-নিধের মেয়ের প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে যতটুকু সত্য থাকে, এই শ্রুতিসুখকর কাহিনীর মধ্যে ঠিক ততটুকুই সত্য নিহিত আছে ; তদধিক এক বিন্দুও নহে। প্রথমতঃ, বিধান রায় অজ্ঞাত কুলশীল নহেন। তাঁহার পিতা প্রকাশচন্দ্র ও মাতা অঘোর কামিনী শুধু ব্রাহ্মসমাজেই নহে, কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে বিশেষরূপ সমাদৃত ছিলেন ; স্যার নীলরতনের তাহা না জানার সম্ভাবনা কোথায় ? তারপর, এখানকার মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া যে বিধান বিলাতে সকল পরীক্ষায় 'রেকর্ড সৃষ্টি' করিয়াছে, বিলাতের পরীক্ষায় তাঁহার 'গুরু' এখানকার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যালকেও চার ধাপ নীচে নামাইয়া দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া চিকিৎসা জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, স্যার নীলরতনের মত দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই বিধানকে ভাগ্যান্বেষী অভাগার পংক্তিভুক্ত করিবেন ইহা মনে করিলেও স্যার নীলরতনের বিদ্যাবত্তায় কলঙ্ক আরোপ করা হয় না কি ? গল্পটির উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল আমি জানি না, তবে সমাজের বহুস্তরে 'হতাশ প্রণয়ের'

উপাখ্যানরূপে এই কাহিনী খ্যাতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম বলিয়াই সেই অমূলতরুটির মূলোৎপাটন করিলাম। বিধানচন্দ্র বাঙ্গলার কনফার্মড ব্যাচিলারদের অন্যতম বটে; কিন্তু তাহার মূলে কোন হতাশার দীর্ঘশ্বাস অথবা মনোভঙ্গের নয়নাশ্রুর কোনই সংযোগ নাই; 'পাদরী' পিতা-মাতার জনসেবাদর্শে উৎসর্গীকৃত জীবনালেখ্য সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্য হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছিল। হ্যাঁ, কনফার্মড ব্যাচিলার্স কথাটা যখন বলিয়া ফেলিয়াছি, দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করা উচিত বলিয়া মনে করি। কয়েকটি কনফার্মড ব্যাচিলারের নাম উল্লেখ করিতেছি, মিলাইয়া লউন—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিধানচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, পশ্চিম বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বাঙ্গলা কংগ্রেসের অধিপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। এই পাঁচটি পুরুষের নামই স্মরে নিত্যং হইয়া যাক্, আমার লাভ-ক্ষতি কিছুই নাই।

বিধানচন্দ্র পরীক্ষা করিয়া কেবিনের বাহিরে আসিয়া স্যারকে বলিলেন, স্যার, আপনি দেখুন। স্যার বলিলেন, রিপোর্টটা লিখে ফেলুন না, ডক্টর রায়।

রিপোর্ট লিখিত হইবামাত্র স্যার আগু বাড়িয়া চাহিয়া লইয়া স্বাক্ষর করিলেন; এবং অধিকতর আশ্চর্য্য এই যে, লাটের সার্জ্জেনও তৎক্ষণাৎ ও নিঃশব্দে তাহারই পার্শ্বে 'ঢেরা সহি' করিয়া দিলেন। স্যার নীলরতন রোগী পরীক্ষা না করিতেও পারেন যেহেতু 'ডক্টর রায় দেখেছেন;' কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সার্জ্জেন জেনেরালের পক্ষে ত সে কথা খাটে না। তাই ডক্টর রায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন···আপনি নিজে একবার দেখবেন না? ভদ্রলোকটি রসিক, কহিলেন, হুকাম নেহি হ্যায়! আপনাদের মন্তব্যে ডিটো করিবার জন্যই আমাকে পাঠানো হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময়ে ইঁহারা কলিকাতায় ফিরিলেন এবং রাত্রি প্রভাতে সংবাদ বাহির হইল, শারীরিক অসুস্থতার কারণে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুকে মুক্তি দেওয়া হইল। ইহাও শুনা গেল যে, গভীর রাত্রে খোদ লাট সাহেবের ষ্টীম লঞ্চে করিয়া সুভাষকে কলিকাতায় আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র খোলা-ভোলা দিল্‌দরিয়া লোক। তিনিই ঘটনা বিশ্লেষন করিলেন; বলিলেন, আরে বাপু, স্টেটের একটা 'প্রেষ্টিজ' আছে ত! সেটা ত আর নষ্ট করা যায় না; তাই একটা মেডিক্যোল বোর্ড-টোর্ড করতে হয়েছিল। 'ও কিছু মনে করো না'।

সন, সাল, মাস, তারিখ, বার কিছুই বলিতে পারিব না; কোন দিনই পারি

নাই। সেই কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ 'মশাইয়ের' পাঠশালা হইতে সুরু করিয়া দুই-কুড়ি দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত এই একটি বিষয়েই ভদ্রলোকের এক কথা অটুট ও অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছি; কদাচ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি নাই। কিন্তু সাল, তারিখ, তিথি, নক্ষত্রে প্রয়োজনই বা কি!

বোম্বাই হইতে ফিরিতেছিলাম। বি-এন-আরের বোম্বে-কলিকাতা মেলের কামরায় পোঁটলাপুঁটলি রাখিয়া প্ল্যাটফর্মে পদচারণ করিতেছি, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে চমকিত হইয়া দেখি, প্ল্যাটফর্মের অপরাংশে বিশাল জনতা। "বন্দে মাতরম্" যখন, তখন কোনও বাঙ্গালী নেতাই হইবেন ভাবিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতেই দেখি, ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম আলো করিয়া প্রিয়-দর্শন সুভাষচন্দ্র! ফুলের মালা গলা ছাপাইয়া, হাত পর্য্যন্ত ভরাইয়া দিয়াছে। কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের কর্ডন ভেদ করিয়া কাছে যায় কাহার সাধ্য? যাইতেই বা তাহারা দিবে কেন? বীর-পূজার ঠেলায় নেতৃবর্গই "মব্বড" হইয়া পড়েন, ইহা ত জানা কথা। আমাকে তাহারা পাত্তা দিবে কেন? তবু একটু চেষ্টা করিতে বাসনা হইল। নিতান্ত ছেলে-ছোকরা ভলান্টিয়ারদের কাছে সুবিধা হইবে না ভাবিয়া আমি বুদ্ধি খরচ করিয়া যেখানে কয়েকজন বয়স্ক কংগ্রেসী দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। বাঙ্গলা দেশের ষ্টেশন হইলে আমার 'পাত্তা' পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু বোম্বাইয়ে নেতার স্বপ্রদেশীয় ব্যক্তিকে হাতের বাঁধন খসাইয়া পথ করিয়া দিয়া প্রবেশ করিতে দিতে তাহাদের আপত্তি হইল না।

সুভাষচন্দ্র বাঙ্গলাতেই সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার, এখানে যে? তারপর যাওয়া হবে কোথায়?

উদ্দেশ্য ও গন্তব্য স্থানের পরিচয় অবগত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "ভালই হোল; গল্প শুনতে শুনতে যাওয়া যাবে?" বলা উচিত ছিল, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে; কিন্তু কি জানি কেন, সুভাষচন্দ্র স্বতন্ত্র অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন! যাক্, সে তর্কের মীমাংসা পরে করিলেও চলিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোন্ কম্পার্টমেণ্টে আছেন? সেখানে বার্থ খালি আছে নাকি?

এই সময়ে ভিড় ঠেলিয়া এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে স্বপ্রকাশ হইয়া রাগত-স্বরে আমাকেই কহিলেন, আপনাকেই আমি গরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছি মশাই—

সুভাষচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, সেই জন্যেই পান নাই! মানুষ খোঁজা করলে দেখতেন উনি মানুষের সঙ্গেই আছেন।

ভদ্রলোকটিরও নামও—মজুমদার। বোম্বাইয়ে এমন ঘট নাই যেখানে না তিনি ফুল-তুলসী পত্র চড়ান; এমন হাঁড়ি নাই যে হাঁড়িতে না কাঠি দেন। একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার বটে, কিন্তু বোম্বাইয়ের একটি চাঁই বলিলেও অন্যায় হইবে না।

ভদ্রলোকটি বলিলেন, ষ্টেশনে এলেই আমি সর্ব্বাগ্রে গার্ডের কাছে রিজার্ভেসন লিষ্টটা দেখিয়া লই—কোন চেনা লোকটোক বাঙ্গালী টাঙ্গালী কেউ যাচ্ছে কি না। আজ লিষ্টে প্রথমেই দেখি মশাই চলেছেন হাওড়া। তা কোন্ খানে আছেন?

সুভাষ বাবু তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কামরায় কি খালি বার্থ আছে?

মজুমদার কহিলেন, নিশ্চয়ই আছে। আমি রেলকে বলে দিয়াছিলাম, আপনার গাড়ীতে যেন কাউকে না দেয়। দাদাকে সেই খানেই তুলে দিই, কেমন?

মজুমদার কয়েকজন কংগ্রেস ভলান্টিয়ার সঙ্গে লইয়া পাঁচমিনিটের মধ্যে আমার আসবাব-পত্র আনিয়া সুভাষচন্দ্রের কামরায় তুলিয়া দিলেন। সুভাষচন্দ্রের ভৃত্যকে ডাকিয়া নির্দ্দেশ দিলেন, সাহেবেরও বিছানা টিছানা গুলো করে দিও, বুঝলে।

এদিকে ঘণ্টা পড়িল। অভিবাদন, আলিঙ্গন, কর-মর্দ্দন, কর-পীড়ন, কোলাকুলি, নমস্তে, নমস্কার, "বড় আনন্দ হোল" ইত্যাদি ও ইত্যাদির পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বে আবার ঘণ্টা পড়িল। এবার গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা। আমি গাড়ীতে উঠিয়া দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়াছিলাম কিন্তু প্ল্যাটফর্মের বিদায়ের পালা আর শেষ হয় না। বোম্বে মেল্ও ঐ লোকগুলির আনুষ্ঠানিক কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মাইবার সাহস রাখে তাহাও মনে হইল না! কারণ দেখিলাম বহুবিধ দৃশ্য ও অদৃশ্য আভরণে সুসজ্জিত গার্ড সাহেব বংশী হস্তে নীরবে দণ্ডায়মান। তাঁহারও কর্ত্তব্য কর্ম্মে খেয়াল আছে তাঁহার নিরুদ্বিগ্ন ভাব দেখিয়া তাহাও মনে করা যায় না। প্রায় দশ মিনিট বিলম্বে সুভাষচন্দ্র 'রাজকীয় পদক্ষেপে' কামরায় আগমন করিলেন। প্ল্যাটফর্মের জনতাও অগ্রসর হইয়া কক্ষদ্বার সম্মুখে জমায়েত হইল। তাঁহাদের যেন কথা ফুরায় নাই; বুঝি বা 'নয়ন না তিরপিত ভেল।'

কিন্তু কথা ফুরাইয়া গিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র হাত ঘড়ির পানে চাহিয়া আমাকেই বলিলেন, সময় ত হয়ে গিয়েছে।

আমি বলিলাম, পনেরো মিনিট আগেই হয়েছে ; কিন্তু আপনার সময় হয় নি ভেবেই গার্ড বেচারা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুভাষ জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ ?

অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বংশীবদন বনমালী গার্ডকে দেখাইয়া দিলাম। গার্ড বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; তন্মুহূর্ত্তে কাছে আসিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছাড়িতে পারি কি মহাশয় ?

সুভাষবাবু যেন অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে কহিলেন, ও—ইয়েস্—ও ইয়েস্।

থ্যাঙ্কস্, বলিয়া এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ডটি সেইখানে দাঁড়াইয়া জোরসে বাঁশী বাজাইয়া দিলেন। ড্রাইভারটি, বোধ হয়, স্থানান্তরে বসিয়া অধৈর্য্য হইয়া বংশীধ্বনিরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিনের বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। অতি ভক্ত কয়েকটি বালক পা-দানীতে লাফাইয়া উঠিয়া নমস্তে জ্ঞাপন করিল এবং "বন্দে মাতরম্" করিতে করিতে একে একে ঝুপ ঝুপ করিয়া নামিতে লাগিল।

ভৃত্যবর কামরাতেই ছিলেন। ফুলের মালাগুলি প্রভুর কণ্ঠ হইতে খালাস করিয়া কামরার ঝোলায় জড় করিয়া রাখিলেন।

সুভাষচন্দ্র বলিলেন, বোম্বাইয়ে কবে এসেছিলেন ?

চারদিন।

আমি আছি জানতেন না ?

সূর্য্যোদয় কি কারও অজানা থাকে ?

তবে দেখা করেন নি কেন ?

বলা বাহুল্য, এগুলা নিছক শিষ্টাচার !

কতকগুলা আজে বাজে কথার পর কাজের কথা পাড়িলাম ; বলিলাম, কলকাতায় ফিরে দরবার করতে যাবার দরকার আছে ; একদিন ফোন ক'রে তখন আসবো।

সুভাষ কহিলেন, জরুরী দরকার ?

আমি বলিলাম, দরকার নয় ; দরবার।

সুভাষ হাসিয়া বলিলেন, আপনার ভাষায় দরবার, কেমন কথাটা কি ?

কলকাতায় গিয়ে বলবো।

এখন বলা যায় না ?

না। আরজি কি দরবার ছাড়া পেশ করা যায় ?

তবে আর হোল না।—বলিয়া তিনি তাঁহার এ্যাটাচি কেস্ খুলিয়া কাগজ-পত্রে মনোনিবেশ করিবার উদ্যোগ করিতে করিতে কহিলেন, দেখুন দাদা, এখনও বলেন যদি, হয়ত কাজ হ'তেও পারে।

আমি 'এক কথার লোক'; বলিলাম, চলুন-না, দু'তিন দিন বাদেই ফোন্ ক'রে এসে হাজির হবো।

ভাল! তাই হবেন!—এমন একটা অদ্ভুত হাসি হাসিলেন যাহার কোন অর্থই করা যায় না। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে খাবার ব্যবস্থা করেছেন নাকি?

মাইকেলের কবিতার একটি পংক্তির রদবদল করিয়া কহিলাম, দীন যখন রাজেন্দ্র সঙ্গেই চলিতেছে তখন আগে হইতে ভাবনা করিবার তাহার দরকার কি?

আমি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দিলাম। সুভাষ বলিলেন, কথাটা কি বলবেন বলেছিলেন, ব'লে ফেলুন, নইলে আর হয়ত সময় পাবেন না।

বলিতে বলিতেই একটা স্টেশন আসিয়া পড়িল এবং সেখানেও শতাধিক নরনারী পূজোপকরণ লইয়া উপস্থিত ছিল। মাল্য-দান, কুশল-প্রশ্ন আদান-প্রদান এবং ইত্যাদি ও প্রভৃতির পর স্থানীয় কংগ্রেসের কথা উঠিয়া পড়িল। এ সকল কথা শেষ হইতে চাহে না; পনেরো মিনিটের জায়গায় পঁচিশ মিনিট হইয়া গেল, তবুও কংগ্রেসের কার্য্য বিবরণী শেষ হইল না। দুইজন ভদ্রলোক বলিলেন, তাঁহারা মনমদ পর্য্যন্ত বুঝাইতে বুঝাইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন। যে ভাষায় কথা হইতেছিল, তাহা রুশ, কি জার্ম্মেন, কিম্বা লেটিনও হইতে পারে, আমার পক্ষে তিনই সমান, একটি শব্দেরও অর্থগ্রহ অসম্ভব। কিন্তু মোদ্দা বিষয়টি আমার মত কংগ্রেস সম্পর্কে 'নিরেটেরও' অজ্ঞাত ছিল না। বিপক্ষের গুণপণা ব্যাখ্যা কি সহজে শেষ হয়? জানিতাম, বাঙ্গালীর হয় না। আজ বুঝিলাম, বাঙ্গালীর দোসর আরও অনেক আছে। সুভাষচন্দ্রের বোধ হয় অসীম ধৈর্য্যের প্রস্তর নির্ম্মিত কঠিন বাঁধও ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, কারণ আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম, বক্তার কথায় তাঁহার যতখানি মনোযোগ, তদপেক্ষা অনেক অধিক মনোযোগ এ্যাটাচি-কেসের কাগজপত্রগুলার উপর!

কংগ্রেসী ভদ্রলোকটি ইংরাজীতে পরের স্টেশন পর্য্যন্ত গমনের অভিলাষ ব্যক্ত করিমাত্র সুভাষচন্দ্র জজের রায় দেওয়ার মত ইংরাজীতেই কহিলেন, ডু ওয়ান থিং—এক কাজ করুন। সমস্ত ঘটনাটা লিখিয়া কংগ্রেস (এ, আই, সি, সি'র) আফিসে পাঠাইয়া দিবেন।

আপনি দেখিবেন? অথবা আপনার হাতে পৌঁছিবে ত?—তাঁহারা আমার অবোধ্য ঐ ধরণেরই কোন প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন, সুভাষচন্দ্রের প্রদত্ত উত্তর হইতে তাহাই বুঝা যায়।

সুভাষ বলিলেন, পাঠাইয়া দিবেন।

অতঃপর বক্তৃতার উৎস শুষ্ক হইবারই কথা; কিন্তু হইল না। প্রতিপক্ষকে সমূলে নির্ম্মূল করিতেই তাঁহারা চাহিতেছিলেন, নিবৃত্ত হইতে পারেন না। সুভাষচন্দ্র তৃতীয়বার কহিলেন, সব কথাই লিখিয়া দিবেন এবং চিঠির নকলও দিবেন।

তা ত দিবই—বলিয়া তাঁহারা পুনরায় অনর্গল বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেন। যেখানে ও যখন রাজায় রাজায় কথোপকথন হয় সেখানে ও তখন আমাদের মত লোকের কথা বলা ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্ব পরিচিত বংশীবদন গার্ডের বিশুষ্ক মুখাবলোকন করিয়া আমার দুঃখ হইতেছিল। গাড়ীর সময়-পঞ্জী ও হাত ঘড়ি মিলাইয়া দিলাম, এখানেও কুড়ী মিনিট লেট্। ত্রিশ মাইলেই প্রায় পঞ্চাশ মিনিট পিছু হটিয়াছি। বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লেখ্য ভাষায় বলিলাম, বেচারী গার্ড বাঁশী মুখে দিয়া আপনার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তাই নাকি?—বলিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া গার্ডকে ইসারা করিয়া দিলেন। গার্ড ফর-র-র-র শব্দে হুইসিল দিল। এবার আর ড্রাইভারের তৎপরতা দেখা গেল না। সে লোকটি বোধ করি হাল ছাড়িয়াই দিয়াছিল। দু'তিন মিনিট পরে বেগারঠেলা গোছের বাঁশী বাজাইয়াও নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কাজেই কামরার মধ্যে যে ঝটিকা বহিতেছিল, তাহা অব্যাহত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পরের স্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র গার্ড আসিয়া সবিনয় নিবেদন করিল, মহাশয় আমরা ইহার মধ্যেই এক ঘণ্টা পিছাইয়া পড়িয়াছি। সুভাষ বলিলেন, আমি সে জন্য দুঃখিত। কিন্তু আপনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবেন না, আপনার সময়ের অনুসরণ করিতে থাকুন।

ও মহাশয়, আপনাকে শত শত ধন্যবাদ। অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম মহাশয় —বলিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কৃতজ্ঞতাটা আন্তরিক ইহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারা গেল। আর ইহাও লক্ষ্য করিলাম এখন হইতে গার্ড আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া আমাদের গাড়ীর সামনে আসিয়া তীর্থের কাকের মত দাঁড়াইলেন না; যথাস্থান হইতেই বংশীধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল

এবং যে সকল কংগ্রেসী নর-নারী কামরায় আসিয়া জম্ পেশ হইয়া বসিতেছিলেন, তাঁহাদের মুখে চোখে বহুকাল পূর্ব্বে থিয়েটারে শোনা একটি গানের চরণই পরিস্ফুট হইতে দেখিলাম। গানটি এই :

"তোমার বাঁশীরে দিব হে গালি
ওহে বংশীবদন বনমালী।"

ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখা কোন নাটকেরই গান হইবে। কংগ্রেসিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে নামিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

রাত্রি বোধ হয় সাড়ে ন'টা হইবে, আহার্য্য সজ্জিত, খাইতে বসিব, ট্রেণ কোন্ একটা বড় স্টেশনে থামিল। জিন্দাবাদে আহার্য্য বা বরবাদ যায়! কিন্তু না, সুভাষচন্দ্রের অনুচরটি বুদ্ধিমান লোক, দরজা আটকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কাহাকেও ঢুকিতে দিল না। সুভাষবাবু মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন তাহা আমি বেশ বুঝিতেছিলাম ; কিন্তু ভৃত্যকে ডাকিয়া 'ওপন্ সিসেম্' করিতে বলিতেও পারিলেন না, তাহাও দেখিলাম।

ভক্তবৃন্দ সম্ভবতঃ আরও চতুর। তাহারা গার্ডের সঙ্গে গোপন বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন ; আহারাদি শেষ হইয়া গেলেও ট্রেণ ছাড়িল না। সুতরাং দর্শন দিতে হইল।

একবার মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত ট্রেণ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। মৌলানা সাহেবের শরীর তখন খুবই অসুস্থ ; বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীন আছেন। ডাক্তার সাহেব পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়াছেন, বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ আমরা বিদেশ যাইতেছি। খবর বাহির হইবার কথা নহে এবং লোকেরও অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি কিছু মমতা থাকা উচিত ; কিন্তু মমতা ত দূরের কথা, সারারাত্রি সে কি ভীষণ জনতা। তবু বোম্বাই মেল্ পঞ্চাশ ষাট মাইল ব্যবধানে বড় বড় স্টেশনে থামে, নহিলে কি কাণ্ড যে হইত কে জানে! রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত আমার 'মাতব্বরী' করিবার ইচ্ছা হয় নাই। তারপর আমি কামরার কাঠগুলা উঠাইয়া (অথবা নামাইয়া) দিয়া বলিলাম, আবার সকালে দর্শন দিবেন, রাত্রে আর নয়। মৌলানা সাহেব হাসিলেন। রাত্রি তখন বোধ করি চারটা হইবে, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে দেখি, কামরার মধ্যে এ, আই, সি, সি'র সভা বসিয়া গিয়াছে ; সেইখানেই দেশোদ্ধারের ব্লু প্রিণ্ট ছকা সুরু হইতেছে। সার্সি কে খুলিল, কে জানান্ দিল, প্রশ্ন না করিয়াও বুঝিতে

বিলম্ব হইল না। আমার শয্যাপার্শ্বের জানালা খুলিয়া দিয়া সিগারেট ধরাইলাম। স্টেশনটি গয়া। গাড়ী ছাড়িলে, নির্জ্জন হইলে বলিলাম, কাল জ্বর না বাড়ে ত কি বলিয়াছি! সৌম্য সুন্দর শান্তশ্রীমণ্ডিত মুখখানি মধুর হাস্যে ভরিয়া উঠিল, মৌলানা কহিলেন, ভাই, সারারাত এই ঠাণ্ডার মধ্যেও যাহারা স্টেশনে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে তাহাদিগকে মনঃ কষ্ট দিতে তোমার কি মনঃকষ্ট হইত না? আমি নেতা নহি (হইবারও আশা নাই!) ক্ষুদ্র মানব মাত্র; বলিলাম—কিন্তু অসুখ যে! আবার সেই সুমধুর হাস্যবিভায় সুগৌর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিলেন, অসুখ প্রেমের কাছে ঘেঁসিতে পারিবে কেন ভাই? ভয় পাইও না, কাল অসুখ হইবে না। বিন্ধ্যাচলের জলের ও হাওয়ার গুণে অথবা জগজ্জননী বিন্ধ্যবাসিনীর দয়ায় জানি না, সত্য সত্যই দেখিলাম, পরদিন হইতে আর জ্বর বৃদ্ধি হয় নাই।

গার্ড-সাহেব এক সময়ে আমার কাণে কাণে বলিয়া গেলেন, আমরা এতক্ষণ যে প্রোগ্রেস্‌টুকু করিয়াছিলাম, এখানে তাহা নষ্ট হইয়া গেল। আবার চল্লিশ মিনিট পিছাইয়া পড়িলাম।

ট্রেণ ছাড়িলে আমি সে কথা সুভাষচন্দ্রকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, কি করি বলুন ত! কত দূর দূর থেকে সব আশা করে এসেছে, না কথা কয়েই বা বিদেয় দিই কি করে বলুন দেখি! মনঃকষ্ট দিতে আমার কষ্ট হয়।

কংগ্রেসী নেতাদের দেখিতেছি, একই ছাঁচ। পরের কষ্টের চিন্তায় সমূহ শিরঃপীড়া! লোকে যে কেন ইহাদের পূজা করে, ভালবাসে, দেখিবার জন্য কেন পাগল হয় বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মৌলানা আজাদ ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই ধীর ও স্থির প্রকৃতির লোক, অন্তরে বিরক্ত হ'ন কি-না জানি-না, বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে না, নার্ভের উপর তাঁদের অসাধারণ কন্‌ট্রোল—অনেক কিছুই বেমালুম বরদাস্ত ও পরিপাক করিবার ক্ষমতা উভয়েরই অসাধারণ; কিন্তু কংগ্রেসী উচ্চ-মণ্ডলে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী যে ব্যক্তিটির সর্ট নার্ভের 'খ্যাতি' আসমুদ্র হিমাচলে পরিব্যাপ্ত, তাঁহাকেও যখন নীরবে এই প্রেমের পীড়ন সহ্য করিতে দেখি, তখন বিস্ময়ে নির্ব্বাক না হইয়া পারি না।

সে রাত্রিটা ছিল জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ ভুবনে জ্যোৎস্নার ঘুমন্ত শোভা দেখিয়া বিশ্বজগৎ যেন ঘুমঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহারই মাঝে এই শিল্প দানব ভীম গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে। রেল-লাইনের সন্নিকটস্থ প্রান্তর, বৃক্ষরাজি, ছোট ছোট খাদ, ছোট ছোট ষ্টেশনগুলা ক্ষণেকের তরে কাঁপিয়া উঠিয়াই আবার

ঘুমঘোরে এলাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু, দূরের—সুদূরের পর্ব্বত শ্রেণী, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, গ্রাম, নগরনগরী তাহাদের যেন দৃক্‌পাতও নাই। জ্যোৎস্নাহসিত স্বপ্ন রাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভঙ্গের সাধ্য এই যন্ত্র দৈত্যেরও ছিল না। তাহারা যেন ধ্যানস্তিমিত নেত্রে অন্তরের দৃষ্টি দিয়া অন্তরলোকে শান্তিময়ী বিশ্বপ্রকৃতিরই মাধুর্য্য ধ্যান করিতেছিল—ট্রেণের দুরন্তপণা দেখিবার বাসনা তাহাদের ছিল না।

সুভাষচন্দ্র থাক্‌-থাক্‌ করিয়া কাগজ পত্র সাজাইতেছিলেন; আমি খোলা জানালায় চাহিয়া জ্যোৎস্নানিশীথিনীর সহিত সংযোগ স্থাপনের বৃথা চেষ্টা করিয়া ভাবিতেছিলাম! কি ভাবিতেছিলাম কে জানে? ঘর-বাড়ীর কথা? গৃহিনীর কথা? বাবু, সুধা, গদার কথা? বৃদ্ধা ও রুগ্না জননীর কথা? নিজের মন্দ-ভাগ্যের কথা? অথবা যে সুন্দরী বান্ধবীটি বোম্বাই স্টেশনে 'সি অফ্‌' করিতে আসিয়া ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, যাঁহারে একটা ধন্যবাদ দিবারও সুযোগ হইল না, তাঁহার কথা ভাবিতেছিলাম—কি জানি! সত্যই জানি-না, কি ভাবিতেছিলাম! এমনও হইতে পারে যে কিছুই ভাবিতেছিলাম না। আবার ইহাও সম্ভব যে ভাবিতে গিয়াও খেই হারাইয়া ফেলিতেছিলাম। চন্দ্রমাশালিনী যে মধুযামিনী যাদুমন্ত্রে বিশ্ব-প্রকৃতিকে নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাঁহার পানে চক্ষু পড়িলে সব ভাবনারই শেষ হইয়া একমাত্র তাঁহার চিন্তাই সকল চিন্তার স্থান অধিকার করিয়া বসে! যিনি এই দ্বন্দ্ব-বিবাদ, কলহকোলাহল, দ্বেষ-বিদ্বেষ জর্জ্জরিত কুৎসিত ধরণীকেও ব্রীড়ানম্র হাস্যময়ী বিবাহের বধূটির সাজে সাজাইয়া কাছে দূরে-সুদূরে-অতিদূরে ঐ দিকচক্রবাল পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব শ্রী, অভিনব শোভায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন! শিল্পী বটে! ধন্য তাঁহার তুলিকা; ধন্য তাঁহার লেখনী।

এক সময়ে সুভাষ বলিয়া উঠিলেন, দাদা বোধ হয় ঘুমোলেন!

আমি বলিলাম, না।

তবে কি করছেন?

ভাবছিলুম, শরৎ দা কি বাঁশী বাজাতে জানেন?

হঠাৎ?

"চরিত্রহীন" পড়েছেন?

সুভাষ বলিয়া উঠিলেন, ঠিক, ঠিক, সতীশ ট্রেণে উঠে বাঁশী বাজাচ্ছিল বটে। আপনি জানেন নাকি?

বলিলাম, আত্ম-প্রশংসা করতে নেই; কিন্তু না করেও পারছি নে। কোন গুণ নাই তার, কপালে আগুন।" আপনি ত মশাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লিকুইডেশনের দলিল ঘেঁটেই সারা রাত কাটালেন, বাইরের দিকে দেখবার ফুর্সৎ নেই, থাকলে দেখতেন, সতীশ যা করেছিল তার চেয়ে সঙ্গত, শোভন ও মানানসই কোন কাজই এ সময়ে হতে পারতো না।

সুভাষ বাবু একবার মাত্র বাহিরটা দেখিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, তা যা বলেছেন।

মনে মনে বলিলাম, অশ্বডিম্ব বলেছি। সুভাষচন্দ্র শরৎদা'র মস্ত ভক্ত; শরৎ দা'ও সুভাষ বলিতে অজ্ঞান, তাহা ভাল জানিয়াও আবার মনে মনে বলিলাম, শরৎদা সুভাষের মত পাঠকের জন্য তাঁহার মণি-মুক্তাগুলির সৃষ্টি করেন নাই। সে রাত্রিটা পূর্ণিমা-রাত্রি ছিল কি-না জানি না, তবে বর্হিপ্রকৃতি দেখিয়া—

যা মধু যামিনী পূর্ণিমা নিশিথিনী

গাইতেই বাসনা হইতেছিল বটে; কিন্তু রাজনীতির কি প্রচণ্ড মোহ, অনন্তশোভাময়ী, মহিমাময়ী, রাজরাজ্যেশ্বরী প্রতিমাও অবজ্ঞাত। মনে হইল, পণ্ডিত জওহরলাল হইলে এ নিশিথিনী কখনই বিফলে যাইত না। অনেক সময় আমি ভাবিয়াছি, পণ্ডিতজীর মত দুর্লভ কবি-হৃদয় ব্যক্তি রাজনীতির পঙ্কিল ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে কেমন করিয়া পড়িলেন, কে জানে; কেই বা বলিতে পারিবে! বোধ করি সে এক দৈব দুর্ঘটনাই হইবে। কবির কোমল হৃদয়ে ব্যথা বড় বেশী করিয়াই বাজিয়াছিল।

বলিলাম, ম'শায় গো, কাল সারাদিন পড়ে আছে, কাগজ-পত্তর গোছালে হোত না কি?

উঁহুঁ, কাল সময় পাব না।

বুঝিলাম, দিনের বেলায় ভক্ত সমাগমে মহাসমারোহ হইবারই সম্ভাবনা; বুঝিয়াই হাতের কাজ শেষ করা দরকার হইয়া পড়িতেছে; তখন জানিতাম না যে, রাজনীতিতে আরও কত হার্ডলই ত থাকিতে পারে।

সুভাষ বাবু একটু পরে বলিলেন, আপনার কথাটা যদি দরকারী হয়, তা'হলে আজই বলে ফেলুন; কালকের জন্য না রাখাই ভাল।

বলিলাম, আমি কালকের জন্যে রাখি নি, কলকাতার জন্যে রেখেছি।

তবে আপনি যখন আজই শুনতে রাজী, তখন ব'লে ফেলতে পারি। কর্পোরেশনের ব্যাপারে একটি দরবার করবার আছে।

বলুন।

কিন্তু আগেই বলে রাখা ভাল বোধ হয় যে, আমার নিজের জন্যে কোনও দরবার আপনার কাছে আমি করছি নে।

মুখুজ্জে থাকতে আপনার ভাবনা কি?

ঠিক কথা। বহু ভাগ্যে জে-সি'র মত বন্ধুলাভ হয়। শত্রুতাই করলেন চিরকাল; বন্ধুত্ব করলে জানতেন, কর্পোরেশনের শ্রী ফিরে যেতো। ফেরবার পথ বা সময় আছে কি-না সে আপনারাই ভাল জানেন, কিন্তু আমি বলবো কর্পোরেশনের অজিয়ান স্টেবল সাফ করতে হলে জে-সি আপনাদের যত সাহায্য করতে পারবেন, এমন আর কেউ পারবে না। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমাকে ভালবাসেন ব'লেই এই কথা বলছি, তা নয়; কর্পোরেশনের 'ক' জ্ঞান যার আছে, তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন, সেই বলবে।

সুভাষবাবুর সুন্দর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল। তিনি কাগজ-পত্রে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আপনি বলবেন, বিজয় বোস্ বলবে, ভবতোষ ঘটক বলবে, নলিনী সরকার বলবে আর—একমুহূর্ত্ত থামিয়া, একখানা চিঠি ছিঁড়িতে ছিঁড়তে বলিলেন, কর্পোরেশনের চাকরীতে যার 'মনোপলি' সেই ইন্দু বিদও বলবে।

এ কথার উত্তরে আমি অনেক কথাই বলিতে পারিতাম; কলহ করিতেও পারিতাম; কিন্তু প্রয়োজনের অভাব। হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতই বলিলাম, মহাজনগণের সঙ্গে অভাজনকে ব্র্যাকেটভুক্ত না করলেই ভাল হোত। হাতীর সঙ্গে মূষিকবরের তুলনা কেউ করে না।

সুভাষ কহিলেন, লোক ত আপনার নামও করে। বলে, আপনি ত মুখুজ্জের দক্ষিণ হস্ত।

আহা, লোকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। কিন্তু আপনার সেই লোকদের জিজ্ঞাসা করবেন ত, এই দক্ষিণ হস্তটি কর্পোরেশনে ক'টা চাকরী নিয়েছে—ক'টি কণ্ট্রাক্টরী করেছে—

সুভাষ আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "মারমেড" ভ্রমণের কথাটা লোকে জানে কিন্তু! একবার আপনি, একবার সেনগুপ্ত, একবার সেই গোকুল বড়াল—কর্পোরেশনের ষ্টীমার চড়ে আপনারা সুন্দরবনে বেড়াতে যাবেন, রেট পেয়ার রাগ করবে না?

হ্যাঁ তাতে দোষটা কি হয়েছে বলতে পারেন? সেনগুপ্ত যখন সুন্দরবনে গেছলেন, তখন তিনি মেয়র; গোকুল বড়াল, কাউন্সিলার; তাদের যাওয়াটায় দোষ হতে পারে না। নিয়ে থুয়ে আমার যাওয়াটা? আপনার মেজ দাদা ই, জি, পি, কমিটিতে চায়ের পেয়ালায় তুফান না তুলে যদি রেকর্ড দেখতেন তাহলে জানতে পারতেন, মোটর লঞ্চখানা আমি না গেলেও পিয়ালি যেতো, আমি চড়ে ব'সে কিছু অন্যায় করি নি।

সপরিবারে?

হ্যাঁ। একজনও যা, পাঁচজন-ও তাই; "মারমেড" যখন যাচ্ছিলই।

আপনার যুক্তিটা হোল যেন এই রকম: বোম্বে মেল ত নাগপুর যাচ্ছেই, ফার্ষ্ট ক্লাসে জায়গাও খালি রয়েছে, কেন-না আমরা উঠে বসবো; তাই না?

না। রেলের পাস ছিল আমার সঙ্গে।

পাস দেবার ক্ষমতা মুখুজ্জেকে কেউ দেয় নি।

মানুষে না দিয়ে থাকতে পারে, ষ্ট্যাটুট্ চীফকে সব ক্ষমতাই দিয়েছিল। পরশ্রীকাতর—

সুভাষবাবু কহিলেন, মামলা খারাপ, বাদীর উকীলকে গালাগালি দিতেই হবে। যাক্ গে, কথাটা কি, তাই বলুন!

কতকটা অনিচ্ছার সহিতই বলিলাম, আমাদের চামিদি'কে কর্পোরেশন ইলেকসানে কংগ্রেসের নামিনেসন দিতে হবে।

সুভাষ কহিলেন, আমি ত জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীকে বলে দিয়াছি যে, হবে না। ওদের দিয়ে কাজ হয় না। থাকতো বীণার মত মেয়ে—চেনেন—বীণাকে?

তখন মিস্ বীণা দাশকে চিনিতাম না, নামটি মাত্র শুনিয়াছিলাম—সকলেই শুনিয়াছিল—সারা ভারতবর্ষ, চাই কি সারা বিশ্ব শুনিয়াছিল; বলিলাম, না।

বেণীমাধব দাশের মেয়ে—বেণীবাবু আমার মাস্টার মশাই। বীণা বোধ হয় এখন জেলে। ক' বছর হয়েছিল তার?

ছয় কি আট, ঠিক মনে নেই।

সুভাষচন্দ্র পরম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সহানুভূতির সহিত বলিলেন, বেণীবাবু দেবতুল্য মানুষ; তাঁর ছেলেমেয়েরাও বাপের মত সকলেই সাধু ও সৎচরিত্র। অত্যাচারে অত্যাচারে বীণার মত মেয়েও কি হতে পারে, দেখুন। আপনাদের জে-সি এই বৃটিশেরও খোসামোদ ক'রে জীবন ধন্য জ্ঞান করে।

পুনরায় সেই তিক্ত প্রসঙ্গ! জে-সি মুখার্জ্জি ইউরোপীয় পরিচ্ছদটি পরিত্যাগ করেন নাই ইহাই যদ্যপি তাঁহার অপরাধ হয়, তিনি ঘোরতর পাপী তাহাতে আমারও সন্দেহ নাই; কিন্তু একাদিক্রমে এক যুগেরও অধিক কাল যাহার সহিত একত্র বাস, একত্র ভোজন, এক কক্ষতলে শয়ন করিয়া যাহার অন্তর বাহির সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে যাহাকে এতটুকু বিলাতী দ্রব্য কিনিতেও দেখি নাই; দেশের সমস্ত কার্য্যে যাহাকে অকুণ্ঠ-চিত্তে সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতে দেখিয়াছি, বৃটিশের তোষামোদ করিয়া জীবন ধন্য করিবে সেই লোক। কিন্তু সুভাষবাবুকে এ সকল কথা বলিয়া লাভ নাই। যে যাহারে দেখিতে নারে সে তাহার চলনের দোষ ধরিবেই।

সুভাষ বাবু বলিলেন, বীণার ঘটনাটা জানেন ত?

আমি হাসিয়া কহিলাম, জানি; বোধ হয় আপনাদের চেয়ে ভালই জানি; কেননা, আমার একেবারে ফার্ষ্ট হ্যাণ্ড ইনফরমেসন। স্যার ষ্ট্যানলীকে যে ব্যক্তি রক্ষা করেছিল, ঘটনার এক ঘণ্টা পরে সেই লোকের মুখেই ঘটনা শুনেছিলাম।

জে-সি মুখুজ্জে?

হাঁ! কিন্তু বৃটিশ-প্রভু ব'লে যে বীণার গুলি থেকে স্যার ষ্ট্যানলীকে সে বাঁচিয়েছিল, তা আমি মনে করি নে। আপনারা ত তাকে দুটি চক্ষু পেতে দেখতে পারতেন না, আপনার ঐ দশা হলে আপনাকেও তিনি বাঁচাতেন।

সুভাষ বাবু হাসিলেন।

আমি বলিলাম, সেই রাত্রেই ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে জে-সি যখন গল্পটি বললেন, আমি কি জিজ্ঞাসা করেছিলাম জানেন? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মেয়েটি দেখতে কেমন?

সুভাষবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, অত্যন্ত শান্ত, ধীর স্বভাব—সাধারণ মেয়ে যেমন হয়।

আমি বলিলাম, জে-সি বলেছিলেন, তাকে দেখলে ভাবতেও পারা যায় না যে, সে মেয়ে রিভলভার ধরে লাট সাহেবকে গুলি করতে পারে। জে-সির মুখে শুনেছিলুম, জে-সি যখন বীণার হাত ধরে ফেলে রিভলভার-ধরা হাতটাকে মাটির দিকে নামিয়ে ধ'রে ছিলেন তখন বীণা একটিবার মাত্র জে-সির মুখের পানে পাগলের দৃষ্টিতে চেয়ে তখনই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল, আর চোখও তোলে নি; জোরও করেনি।

সুভাষ হাসিয়া কহিলেন, তবু আপনার বন্ধু টাইটেল্ পেলে না; পেলে হাসান সুরাবর্দ্দী।

আমি বলিলাম, না-পাবার জন্যে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল সেটা বোধ হয় আপনারা জানেন না। লাট সাহেবকে গিয়ে বলতে হয়েছিল যে, দোহাই লাট সাহেব, প্রাণ রক্ষার পুরস্কার দেবার চেষ্টা করবেন না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুভাষ বলিলেন, বীণা জেল থেকে বেরিয়ে এসে যাতে পুরোপুরি কংগ্রেসে যোগ দেয়, তাই আমাদের করতে হবে। বীণার মত ফায়ার্ দেশের ভ্যালুয়েব্ল এসেট্।

আমি বলিলাম, অভয় দেন যদি, তবে আর একজন মহিলার কথা জিজ্ঞাসা করি?

সুভাষচন্দ্র নিঃশব্দে চাহিলেন; আমি বলিলাম, লীলাও কি এসেট্, না, লায়েব্লিটি?

সুভাষবাবু হাসিলেন কিন্তু কথা বলিলেন না।

আমি সসঙ্কোচে কহিলাম, অন্য অনেক কথাও শোনা যায়।

আপনাদের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তি কি সামান্য? আপনারা না পারেন কি?

তাহ'লে গুজব?

হেমন্তকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেই বলবে।

দেশবন্ধুর কোন একটি কন্যার সম্বন্ধেও ত—

সুভাষ বলিলেন, সেও বাঙ্গালী জাতির উর্ব্বর মস্তিষ্কেরই কাজ। হেমন্ত সরকারের সম্বন্ধে কোন গুজব শোনেন নি?

দাঁড়ান মশাই, আলোটা আগে নিবিয়ে দিই। ষ্টেশন এসে পড়েছে, এখনি আবার মালিনী-মেসো-মাসীরা মিনিস্যুতোয় গাঁথা মালা নিয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে চললো রঙ্গিনী করতে করতে ঢুকে পড়বেন। এত রাত্রে সেটা কোনমতেই বরদাস্ত হবে না!

পরে দেখা গেল, সেটা ষ্টেশন নহে। একটা ব্রীজের মেরামত কার্য্য চলিতেছে বলিয়া গাড়ী কিছুক্ষণ থামিয়া পরে ধীর মন্থর গমনে ব্রীজ পার হইয়া পুনরায় গতি বেগ বৃদ্ধি করিল। আলো নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়ার ফলে, লাভ এই হইল যে বাকী রাতটুকু নিরুপদ্রবেই কাটিয়া গিয়াছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখি, চা প্রস্তুত। সুভাষচন্দ্র ক্ষৌরকার্য্য সমাপনান্তে 'প্রসাধন' রত। কেশ-

বিরল মস্তকে সশব্দে ব্রাস ঘসিতেছেন। শুনি, ঘর্ষণে কেশোদ্গম হয়। শোনা কথায় অবিশ্বাস না থাকিলে, 'ইন্দ্রলুপ্ত' পাঠক মহাশয় চেষ্টান্বিত হইতে পারেন।

সকালে চা খাইতে খাইতে বলিলাম, চামিদির আবেদন না-মঞ্জুর ?

সুভাষচন্দ্র কহিলেন, একরকম তাই বৈ কি। কেউ ওঁকে চায় না। মিস্ গাঙ্গুলী তদ্বিরের কসুর করেন নি, সকলেই 'না' ক'রে দিয়েছে। সুতরাং আমি কি করতে পারি, বলুন।

আমি বলিলাম, আপনি সব পারেন। কে মেয়র হবে, আপনি বলে দেন; কে কোন্ কমিটিতে যাবে, আপনি লিখে খামে ভরে মিটিঙের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে মেয়রের কাছে পৌঁছে দেন। কে কোন্ চাকরী পাবে আর কে বা পাবে না, ম্যাণ্ডেট্ আপনিই পাঠান। আপনি মিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীকে নমিনেসন দিলে কেউ আপত্তি করবে না; অন্ততঃ আপত্তি করলেও, বৃথাই হবে।

সুভাষচন্দ্র নীরব।

আমি ভাবিলাম, কাজ আরম্ভ হইয়াছে, সাফল্যের প্রক্রিয়া সুরু হইয়াছে; বর্দ্ধিতোৎসাহে কহিলাম, ডিমোক্রেসী শুনতে বেশ, বলতে বেশ, আবার তার গলাটিপে বধ করতেও মন্দ লাগে না। কংগ্রেস, ডিমোক্রেটিক্ বডি সবাই জানে; কিন্তু গান্ধীজীর ইচ্ছা ইণ্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল কোডের চেয়েও কঠোর; তাঁর ইচ্ছাই আইন। আমাদের কলকাতা কর্পোরেশনেও—চোখেই দেখেছি আপনার—

সুভাষ বাবু কহিলেন, আমায় মাপ করবেন, আমি পারবো না।

অগত্যা আমাকে মোড় ফিরাইয়া বলিতে হইল, আপনি না পারলে অবশ্য কোনই কথা নেই। কিন্তু, অন্যের দোহাইটা না পাড়াই ভাল।

সুভাষের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে; বুঝিলাম, অতি কষ্টেই তিনি আত্ম সম্বরণ করিতেছেন। ওকালতীর সওয়াল করিতে আসিয়া সীমা লঙ্ঘনেরও প্রয়োজন অশাস্ত্রীয়, সুতরাং আমার আর কথা না বলাই ভাল। চুপ করিয়া গেলাম। সুভাষবাবু দ্রুততর বেগে ও ক্ষিপ্রতার সহিত পত্র রচনা করিয়া খামে ভরিতেছিলেন; কাল রাত্রি হইতে সুরু; এবং দশ পনেরোখানি খাম ভরা হইয়া গিয়াছে, তথাপি পত্র রচনার বিরাম নাই। আমি ম্যাক্সুইনীর জীবনী (বহিখানি তাঁহারই) পাঠ করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে একটা ছোট ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিতেই গাড়ী আবার চলিতে সুরু করিল।

বি-এন-আরের বোম্বে মেল্ ট্রেণখানি যেন ঐ লোকটির জন্যই বিশেষ ভাবে থামিয়াছিল। মার্টিনের ট্রেণ যাত্রীর প্রাকৃতিক পীড়ারও মর্য্যাদা রাখে জানিতাম, বি-এন-আর যে মার্টিনেরই জ্ঞাতিকুটুম্ব তাহাও এক্ষণে প্রমাণিত হইল। তবে হ্যাঁ, একথাটাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না যে, বি-এন্-আরের গার্ড ও ষ্টেশন মাষ্টাররা যাত্রীদের সুবিধার পানে সত্যইএকটু কৃপা দৃষ্টি রাখেন। আমার মনে আছে, আমি ও আমার মধ্যম পুত্র সুশান্ত একবার ওয়ালটেয়ারের খানা ঘরে খানা খাইতেছিলাম। গাড়ী ছাড়িবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ঘড়ির দোষে আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। গার্ড আসিয়া বলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, এতটা বিলম্ব করা আমাদের উচিত হয় নাই। অন্য কোন রেলকে এতখানি যত্ন পাইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না।

ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি নীরবে দাঁড়াইয়া। দিনের বেলা গাড়ীর আসন "রিজার্ভ" থাকে না, ভদ্রলোক অনায়াসে বসিতে পারেন। কিন্তু এমনও সম্ভব যে ভদ্রলোকটি বিলাতী কায়দায় আশা করেন যে, পূর্ব্বাধিকারী আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিবে। এইরূপ অনুমান করিয়াই আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি বসিতে পারেন। আমার কথার শব্দেই বোধ করি সুভাষচন্দ্রের পত্র-ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্র ইউরোপীয় ভদ্রলোক মাথাব টুপি ঈষৎ উচ্চ করিয়া শুভ প্রভাত করিলেন।

সুভাষ মৃদু হাস্যে কহিলেন, গুড মর্ণিং! ই-উ হ্যাভ কাম্ দেন্! (অতঃপর তোমার শুভাগমন হইল?) বসো।

লোকটি আসিয়া আমার পার্শ্বে গা ঘেঁষিয়া বসিলে, সুভাষ আবার হাসিয়া বলিলেন, বাট্ হি ডাজ ন'ট বিলং টু মাই পার্টি (ঐ লোকটি কিন্তু আমার দলভুক্ত নহে!)!

সাহেব হাসিয়া বলিল, আমি তাহা জানি।

সুভাষ বাঙ্গলায় আমাকে বলিলেন, চললুম।

কোথায়? এই প্রশ্ন ঠোঁটে আসিয়া আটকাইয়া গেল।

মনই আগু বাড়িয়া জবাব দিল, কোথায় আবার! ১৯২১ সাল হইতে ভারতের উজ্জ্বলতম রত্নগুলির গন্তব্যস্থান ত একটিই আছে। দ্বিতীয় স্থান ত দেখি না। কিন্তু একটা কথা আমার নিকট রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল। সুভাষবাবু কি প্রোগ্রামের এই অংশটুকু পূর্ব্বাবধি অবগত ছিলেন? গত রাত্রে

উপর্যু্যপরি কয়েকবার আমাকেই বলিয়াছিলেন, কাল সময় না-ও পাইতে পারি! এ কথার অর্থ কি ইহাই নহে যে তারে হোক, বেতারে হোক, মনোবিজ্ঞানে হোক অথবা মন্ত্রবলেই হোক, সংবাদ অজানা ছিল না।

অতঃপর তিনি সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এই চিঠিগুলা শেষ করিতে পারি কি?

ও ইয়েস্, ইয়েস্, বলিয়া লোকটি ঢলিয়া পড়িল। ম্যাকস্যুইনী আমার মাথায় উঠিয়া গিয়াছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বৃটিশের কারাগারকে এই মানুষগুলা কেমন একেবারে ঘর বাড়ীর সামিল করিয়া লইয়াছে। আমরা হইলে, ওঃ সে কি কাণ্ডটা করিতাম! ঐ যে লোকটি চিঠিগুলা লিখিতেছে, কৈ, হাত ত একবারও কাঁপিতেছে না; একটা ভুল কথা লিখিয়া ফেলিয়া কাটাকুটিও ত করিতেছে না। আমরা কি ওদের মত অবিচলিত ও নির্ব্বিকার থাকিতে পারিতাম! একবার সরোজিনী নায়ডুই নাকি ঠিক এই রকম অবস্থায় বোম্বাইয়ের সহর কোতোয়ালকে বলিয়াছিলেন, দাঁড়াও বাপু, আমি আমার টুথ ব্রাশ ও টুথপেস্টটা লইয়া আসি। সেদিন ঐ কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা গল্প কথা। আজ অনুরূপ ঘটনা চাক্ষুষ করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে, টুথ ব্রাশ লওয়াই বটে।

পরের ষ্টেশন ডঙ্গারপুর (বোধ হয়। ভুল না হইতে পারে এমন নহে!), ট্রেণ থামিতে সাহেবটি সবিনয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষার স্বরে কহিল, সে প্রাতঃরাশ করিতে যাইতেছে, মিষ্টার বোস যেন কিছু মনে না করেন।

সুভাষচন্দ্র উদার—অত্যুদার ব্যক্তি; কহিলেন, না, না, নিশ্চয়ই না; তুমি খাইয়া আসিতে পার।

সাহেব চলিয়া গেলে আমাকে ইংরাজীতে বলিলেন, আমাদেরও ত কিছু খাইয়া লইতে হয়।

আমি বলিলাম, হিজ ম্যাজেষ্টিস্ গেষ্টকে কোথায় নামাবে, কোথায়?

সুভাষ নিশ্চিত ঔদাসীন্যভরে কহিলেন, গণ্ডিয়ায় নামাতে পারে। কি জানি।

আমি বলিলাম, আপনি জানতেন যে—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কহিলেন, ও সব জানা খবর; নূতন ক'রে জানতে হয় না।

তাঁহার ভৃত্য দুইজনের মত আহার্য্য হাজির করিল। খাইতে বসিয়া সুভাষ বলিলেন, মিস গাঙ্গুলীকে নমিনেশন দিতে পারলুম না ব'লে কিছু মনে

করবেন না। ওঁর দ্বারা কাজ হবে জানলে, নিশ্চয়ই দিতুম, কারও আপত্তি শুনতুম না ; কিন্তু কাজ হবে না, জানি।

একটু পরে আবার বলিলেন, কর্পোরেশনে সবাই আমাকে ডিক্টেটার বলে, তা আমি জানি ; আপনি নূতন খবর দিতে পারেন নি। আমি মনে করি কাজ করাতে হ'লে কর্পোরেশনে কেন, গভর্ণমেণ্টেও ডিক্টেটরীর দরকার। তবে বৃটিশের ডিক্টেটরী নয়—দেশের লেকের ডিক্টেটরী।

ভারতবর্ষ হইতে চিরবিদায় লইবার কালে কাবুলেও সুভাষের মুখ দিয়া ঠিক এই ধরণের কথাই বাহির হইয়াছিল, সাধু উত্তমচাঁদ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের কথাই ঠিক। গণ্ডিয়ায় তাঁহাকে নামিয়া যাইতে হইল। বাকী পুরা একদিনের পথ আমি একলাই ফার্ষ্টক্লাস কামরা আলো করিয়া রহিলাম :

অবশেষ

সুভাষচন্দ্র জীবিত অথবা, ভারতের ভাগ্যদোষে মৃত, তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। বহু সন্ধান ও অনুসন্ধান, অনেক গবেষণা ও জল্পনা হইয়াছে; অনেক তর্ক বিতর্কও শুনা গিয়াছে কিন্তু আসল প্রশ্ন যে তিমিরে সেই তিমিরে। পরদেশী সূত্রে এইটুকু সংবাদ শেষ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, জাপানের বশ্যতা স্বীকারের অব্যবহিত পরে জাপান-সম্রাটের ইচ্ছায় সুভাষচন্দ্রকে রাশিয়ায় আত্মগোপনের উদ্দেশে বিমানে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। জাপ-সম্রাট রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ভারতীয় বিপ্লবী বীরের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট হিরোহিতো স্বয়ং সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন এবং স্বয়ং সুভাষের রাশিয়া যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দেন। কথিত হইয়াছে যে, যে বিমান খানি সুভাষকে বহন করিয়া যাইতেছিল, দৈব দুর্বিপাক বশতঃ সেই বিমান খানি দগ্ধ হইয়া যায়, সুভাষচন্দ্রও অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় হাসপাতালে নীত হয়েন; তিন দিন পরে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

দৈবের উপর কথা নাই, সত্য; দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের উপর মানুষের কর্তৃত্ব নাই, ইহাও সত্য; কিন্তু কাহিনীটির সহিত সুভাষ-শৌর্য্য, সুভাষ-দম্ভ, সুভাষ-প্রাধান্যের অসঙ্গতি খুব বেশী বলিয়া সুভাষ স্পিরিটের সহিত পরিচিত ব্যক্তিগণ গল্পটি বিশ্বাস করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতেছেন বলিয়াই বোধ করি সুভাষের মৃত্যু সংবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। তাই লক্ষ লক্ষ নর নারীর আশা-প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং আমার মনে হয়, অনন্তকাল ধরিয়া জ্বলিবে। সুভাষচন্দ্র রাশিয়ায় যাইবেন, কোন্ ভরসায়? রাশিয়ার অনুগ্রহভাজন হইবেন কেন? পরাশ্রয়ে, পরের দয়ায় নির্ভরশীল শশক জীবন যাপন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে কি? যদি শুনিতাম, ইচ্ছামৃত্যু, ভীষ্মের মত অনল শয্যায় শয়ন করিয়াছেন; যদি শুনিতাম, প্রভাস-তীর্থে যদুকুলপতির আত্মবিলোপের মত আত্ম নাশ করিয়াছেন, যদি শুনিতাম, নীলাচলে নবদ্বীপচন্দ্রের মত সলিল সমাধি লভিয়াছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম, সুভাষ-আত্মা স্বাভাবিক গতি প্রাপ্ত হইয়াছে; সুভাষচন্দ্র নাই! কিন্তু, যে রাশিয়া তাঁহাকে কাবুলে বর্জ্জন করিতেই তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিল, আত্মগোপনের জন্য সেই রাশিয়ার দ্বারে জীবনের ভিক্ষাপাত্র হস্তে যাত্রা করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে যদি এমন হয়, হিরোহিতোর ইচ্ছার সহযোগিতা করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না বলিয়াই তিনি বিমানে উঠিয়াছিলেন, তাহা হইলে বিমান খানি যে ইচ্ছামৃত্যু সুভাষের ইচ্ছাতেই বিনাশ পাইয়াছে, ইহা ভাবিয়াই সুভাষ-ভক্তজন সামান্য সান্ত্বনা পাইতে পারেন বটে; তথাপি সমস্যার সমাধান হয় না। আশা দীর্ঘজীবিনী!

শেষ